ইনতেসাব

বিস্ময়কর তাওবার রাজনীতির প্রবর্তক
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ.
আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমীন

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের ....

.... কে

ইরশাদাতে আকাবির বইখানা উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

নাম :

ঠিকানা :

স্বাক্ষর

অনুবাদকের আরয

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আলহামদুলিল্লাহ, শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর বিভিন্ন মজলিসে প্রদত্ত ইসলাহী ভাষণসমূহে আকাবিরে দেওবন্দ এর যে সব ইরশাদাত বা মূল্যবান বাণী ও কথাসমূহ এসেছে। সেটার সমষ্টিই হল "**ارشادات اکابر**" ইরশাদাতে আকাবির। যার প্রতিটি বাক্য মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্বে সুসমৃদ্ধ। আত্মিক আতরের সুবাসে সুবাসিত। ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধির জন্য যা এক অব্যর্থ মহৌষধতুল্য।

মূলত: এ কারণেই আমার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র, মেধাবী তরুণ আলেমে দ্বীন, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্বাস হানীফ (আল্লাহপাক তাঁর ইলম ও আমলে বরকত নসীব করুন) যখন ১৪৩৪ হিজরীর শাউয়াল মাসে মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত থেকে অন্য ছাত্র মারফত আমার জন্য এ কিতাবটি হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে, তখন এক বৈঠকেই কিতাবটির উল্লেখযোগ্য চুম্বক অংশগুলো মুতালা'আ করে ফেলি। এবং বলতে দ্বিধা নেই ঠিক তখনই মনে মনে কিতাবটির অনুবাদের সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলি। কিন্তু অনুবাদের সিরিয়ালে তখন পরপর কয়েকটি কিতাব থাকায় এর অনুবাদ শুরু করতে প্রায় চার বছর বিলম্ব হল।

আল্লাহ পাক জাযায়ে খাইর দিন মাওলানা আবু হুযাইফা মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেব (মু: আ:) নাযেম ইদারায়ে তালীফাতে আশরাফিয়া মুলতান পাকিস্তান কে, যিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে এটাকে গ্রন্থরূপ দিয়েছেন।

এ কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানীর আব্বাজান মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. তৃতীয় অধ্যায়ে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানীর আধ্যাত্মিক রাহবার হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা আরেফ বিল্লাহ ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ. এর ইরশাদাত বা কথামালা সংকলিত হয়েছে।

আর চতুর্থ বা শেষ অধ্যায়ে দেওবন্দের প্রসিদ্ধ কয়েকজন আকাবির তথা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী রহ. শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ. হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. প্রমুখ আকাবির তথা বরেণ্য মনীষীদের মূল্যবান ইরশাদাত সংকলিত হয়েছে।

আমি আমার সামর্থ অনুসারে সহজ সরল প্রাঞ্জল অনুবাদের চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে সফল হলে সেটা মহান আল্লাহরই বিশেষ অনুগ্রহ। আর ব্যর্থ হলে সেটার জন্য আমিই আসামী।

এ বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে যারা যে কোনভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষত দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নরত আমার একান্ত স্নেহাস্পদ শিষ্য মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমীকে। সেও আমার জন্য মূল কিতাবটি হাদিয়া পাঠিয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁকেও উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

এ গ্রন্থটিকে আমার চোখের শীতলতা ও নাজাতের উপলক্ষ বানিয়ে দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন

তারিখ
০৩ শাবান ১৪৩৯ হিজরী
১৯ এপ্রিল ২০১৮ ইং

বিনীত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সংকলকের বক্তব্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী মুদ্দাযিল্লুহুল আলীর ব্যক্তিত্ব কোন পরিচয় এর মুখাপেক্ষী নয়। সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি আকাবির হযরতদের অত্যন্ত আস্থাভাজন, বিশ্ব পরিভ্রমণকারী মানুষ, উলামায়ে দেওবন্দের আদর্শ ও হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর বিশেষ অভিরুচির অধিকারী তিনি।

মাওলানা তাকী উসমানী ছাহেব (দাঃ বাঃ) এর 'ইসলাহী খুতুবাত' [সংশোধনমূলক বয়ানসমগ্র] যেগুলো আকাবির হযরতদের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও নসীহতে পরিপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। একেকটি বাক্য অন্তরে দারুণভাবে রেখাপাত করে।

আমি যখন 'ইসলাহী খুতুবাত' অধ্যয়ন করলাম, তখন এত বেশি প্রভাবিত হলাম যে, এগুলোর মধ্যে আকাবির হযরতদের বিশেষ বিশেষ ইরশাদাত বা বাণীসমূহ পৃথকভাবে সংকলনের আকাংখা ও অভিলাষ দিলের মধ্যে সৃষ্টি হল। মাওলানা তাকী উসমানী ছাহেব (দাঃ বাঃ) এর নিকট এ প্রস্তাব পেশ করলে তিনি স্নেহপরায়ন হয়ে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন।

এ কিতাবটির ব্যাপারে হযরত (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান অভিমতও কিতাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মাওলানার জীবনে খাইর ও বরকত দান করুন এবং তাঁর স্নেহের ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

অধম
মুহাম্মাদ ইসহাক উফিয়া আনহু
১লা জুমাদাল উলা ১৪১৯ হিজরী

'ইরশাদাতে আকাবির' গ্রন্থের পরিচিতি শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী ছাহেব (দাঃ বাঃ) এর পবিত্র কলমে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দা থেকে খেদমতে দ্বীন বা সমাজ সংশোধন এর কোন কাজ নেন, তখন তার অন্তরে এমন সব প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা ঢেলে দেন যা মানুষের অন্তরে রেখাপাত করার বিশেষ যোগ্যতা রাখে।

এইসব প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত বাক্য, সহজ দিক নির্দেশনা এবং সরল রসিকতার ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মাঝে মধ্যে এগুলো শ্রবণকারী বা পাঠকারীর অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করে। তার চিন্তাধারার গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়। তার জীবন যাপন পদ্ধতির কায়া পাল্টে যায়।

বহু সময় এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তির অন্তরে দীর্ঘ দিন যাবত যে প্রশ্নটি কাটার মত বিদ্ধ হচ্ছে কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের একটি মাত্র কথার দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে সব সংশয় সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইতমিনান ও প্রশান্তির দৌলত নসীব হয়।

এ জন্যই এসব বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যকে শত বৎসর রিয়াবিহীন ইবাদত থেকেও উত্তম আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যদি সরাসরি তাঁদের সান্নিধ্য নসীব না হয়, তাহলে তাঁদের এ জাতীয় কথাবার্তাও অনেক সময় সান্নিধ্যের ফায়েদা দেয়।

এ কারণেই যুগে যুগে নেককার পূর্বসূরীদের কথাবার্তা, মালফূযাত বা বাণী সংকলনসমূহকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে তাঁদরে ভক্তবৃন্দকে যত্নবান থাকতে দেখা যায়। যাতে এর মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মও আলো গ্রহণ করতে পারে।

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পার বরকতে এ অধমের স্বীয় যুগের একাধিক বুযুর্গানে দ্বীনের নৈকট্য অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছে। আমার অযোগ্যতার দরুন আমি তাঁদের ফাযায়েল ও গুণাবলীর কোন অংশ তো অর্জন করতে পারিনি ঠিক, কিন্তু তাঁদের অনেক কথাবার্তা যেহেন ও কলবের মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। আর এখন এই কথাগুলোই যথাস্থানে মনে করে বড় বড় বিপদ ও সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করি।

বিশেষ করে আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর জীবদ্দশায় আমার মন চাইত যে, তিনি সময় সময়ে নিজ বড়দের যেসব কথাবার্তা নকল করেন আর স্বয়ং তাঁর মুখ থেকেও প্রজ্ঞাপূর্ণ যেসব কথাবার্তা শুনতে পাই, সেগুলোকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে সংরক্ষিত করে দেই। কিন্তু হযরত আব্বাজানের জীবদ্দশায় এ সুযোগ আর হয়ে উঠেনি।

একবার আমার এক স্নেহভাজনকে এ কাজে লাগিয়ে ছিলাম কিন্তু তখনও তিনি কাজের প্রাথমিক মানযিলেই ছিলেন যে হযরত আব্বাজানের রহ. ইন্তিকাল হয়ে গেছে। فصل گل سیر نہ دیدم و بہار آخر شد অর্থাৎ "ফুলের মৌসুম ভাল করে দেখেও সারতে পারিনি ইত্যবসরে বসন্ত শেষ হয়ে গেছে"। আমি নিজের পক্ষ থেকে ঐ আকাংখা পূর্ণ করতে পারিনি বটে, কিন্তু আমার বিভিন্ন লেখা ও বয়ানে সময় সুযোগ মত এ সব বুযুর্গদের কথাবার্তা এখনো বলতে থাকি।

সম্মানিত ভাই জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেব মুদ্দাযিল্লুহুম নাযেম এদারায়ে তালীফাতে আশরাফিয়া মুলতান তাঁর অন্তরে আল্লাহ তাআলা এমন এক উৎসাহ সৃষ্টিকারী উপলক্ষ ঢেলে দিলেন যে, তিনি আমার বয়ান ও লিখনীতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা আকাবির হাযারাতদের ইরশাদাত বা মহামূল্যবান কথাবার্তাসমূহকে একটি গ্রন্থের আকৃতিতে সংকলন করবেন।

ফলশ্রুতিতে তিনি অধমের 'ইসলাহী খুতুবাত' এবং অন্যান্য কিতাবসমূহ হতে মেহনত করে প্রজ্ঞাপূর্ণ রত্নগুলোকে একত্রিত করে দিয়েছেন। আর এভাবে তিনি আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের ইরশাদাত তথা বাণীসমূহের একটি নতুন সমষ্টি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। যা নফসের সংশোধনের ক্ষেত্রে অব্যর্থ মহৌষধতুল্য।

আল্লাহ তাআলা মাওলানা ইসহাক ছাহেবকে এ খেদমতের উপর আজরে আযীম (বিরাট পুরস্কার) দান করুন। এবং এ গ্রন্থটিকে পাঠকবৃন্দের জন্য উপকারী বানিয়ে লেখক সংকলক এবং প্রকাশক সকলের জন্য আখেরাতের পাথেয় বানিয়ে দিন। আমীন।

পি আই এ বিমানযোগে করাচী থেকে মুলতান যাওয়ার পথে।

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
১৮ যিলহজ্ব ১৪১৭ হিজরী

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. বড়দের ছেলেবেলা
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. ইসলাহী মাজালিস (২য় খণ্ড)
৮. মাজালিসে আবরার
৯. রাসায়েলে আবরার
১০. বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা
১১. বিষয় ভিত্তিক প্রবন্ধ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. আহকামে সফর
১৪. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
১৫. বিনয় : সম্মান ও মর্যাদার সোপান
১৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৭. তোমার লীলাই দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৮. বিষয় ভিত্তিক বয়ান
১৯. বিষয় ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়িল
২০. ছোটদের ইসলামী কাহিনী
২১. মালফূযাতে ফুলপুরী
২২. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত
২৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) কি নূরের তৈরী?
২৪. মালফূযাতে রায়পুরী
২৫. আত তাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২৬. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী
২৭. মাজালিসে সিদ্দীক
২৮. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
২৯. ধূম্রজালে জিহাদ
৩০. মালফূযাতে ফকীহুল উম্মাত

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	
হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.	**২১–৭৭**
২য় অধ্যায়	
মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.	**৭৮–১২৫**
৩য় অধ্যায়	
আরেফ বিল্লাহ ডাক্তার মুহাম্মাদ আব্দুল হাই ছাহেব আরেফী রহ.	**১২৬–১৭২**
৪র্থ অধ্যায়	
(কয়েকজন প্রসিদ্ধ আকাবির)	**১৭৩–১৯১**

- মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ.
- সায়্যিদুত তায়েফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ.
- হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস ছাহেব কান্ধলভী রহ.
- হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ.
- হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব নানূতভী রহ.
- হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ.
- হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতভী রহ.
- হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ.
- হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.
- হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ.
- হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস ছাহেব রহ.

সূচি নির্দেশনা

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর ইরশাদাত

১. জনৈক বুযুর্গের সুপারিশের ঘটনা	২১
২. সুপারিশ প্রসঙ্গে হযরত হাকীমুল উম্মতের বক্তব্য	২২
৩. মজমার মধ্যে চাঁদা তোলা জায়েয নেই	২২
৪. একজন বুযুর্গের শিক্ষণীয় ঘটনা	২৩
৫. আমাদের সমাজের মেয়েরা পৃথিবীর হুর	২৩
৬. একজন অবলা নারী থেকে শিক্ষা নাও	২৪
৭. রেহায়েশও জায়েয। আসায়েশও জায়েয	২৪
৮. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক	২৫
৯. এমন প্রভাব কাম্য নয়	২৫
১০. স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর পয়সার দরদ থাকতে হবে	২৬
১১. কিয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে কথা বলবে?	২৬
১২. হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর বিনয়	২৭
১৩. হযরত থানভী রহ. এর চিকিৎসা পদ্ধতি	২৭
১৪. স্বীয় খাদেমদের সাথে হযরত থানভী রহ.-এর ব্যবহার	২৮
১৫. আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হতে পারে না	২৯
১৬. তাসাওউফের সারনির্যাস	২৯
১৭. নফসকে মজা থেকে দূরে রাখতে হবে	৩০
১৮. এই পাত্র আমানত	৩০
১৯. হযরত থানভী রহ. এর সতর্কতা	৩১
২০. বাচ্চাদেরকে মারার পদ্ধতি	৩১
২১. ফাসেক ও ফাজেরের গীবত ও জায়েয নেই	৩২
২২. গীবত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল	৩২
২৩. হকসমূহ মাফ করানোর পদ্ধতি	৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪. গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ	৩৪
২৫. হযরত থানভী রহ. এবং সময়ের মূল্য	৩৫
২৬. হযরত থানভী রহ. এবং সময়সূচী	৩৫
২৭. এটা বিনয় নয়	৩৬
২৮. একটি উদাহরণ	৩৭
২৯. খানা খাওয়ার সময় কথা বলা	৩৭
৩০. উন্নত পর্যায়ের দাওয়াত	৩৮
৩১. অন্যের অন্তর খুশী করা	৩৯
৩২. হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা	৩৯
৩৩. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৪০
৩৪. বুযুর্গানে দ্বীনের বিনয়	৪২
৩৫. হযরত থানভী রহ. এর ঘোষণা	৪৩
৩৬. হযরত থানভী রহ. এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা	৪৩
৩৭. তাসাওউফের সার নির্যাস হল দুটি কথা	৪৩
৩৮. জীবনের এ মুহূর্তগুলো কোন্ কাজের জন্য?	৪৪
৩৯. ঐ কথা তোমার হয়ে গেছে, সময় মত মনে এসে যাবে	৪৫
৪০. রাস্তায় চলার সময় নজর নিচু রাখুন	৪৫
৪১. শয়তান বড় আরেফ ছিল	৪৬
৪২. চাকরকে কেমন খানা দেয়া উচিত?	৪৬
৪৩. হযরত থানভী রহ.-এর বাকপটুতা	৪৭
৪৪. বিতর্কের দ্বারা সাধারণত উপকার হয় না	৪৭
৪৫. এটা তো দুশমনী (শত্রুতা)	৪৮
৪৬. আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অদ্ভুত ঘটনা	৪৮
৪৭. সীমাতিরিক্ত ভক্তির ঘটনা	৪৯
৪৮. ঝগড়া কিভাবে খতম হবে?	৫০
৪৯. আশা রাখবেন না	৫১
৫০. প্রতিশোধ গ্রহণের নিয়্যত করবে না	৫১
৫১. হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর সীমাহীন বিনয়	৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫২. নেকীর খেয়াল আল্লাহর মেহমান	৫২
৫৩. আত্মশুদ্ধির সারকথা	৫৩
৫৪. হযরত থানভী রহ. এর একটি সুন্নাতের উপর আমল	৫৩
৫৫. একটি উদাহরণ	৫৪
৫৬. শাস্তি উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে	৫৫
৫৭. কারণের ব্যাপারে প্রশ্নের চমৎকার উত্তর	৫৫
৫৮. হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর একটি ঘটনা	৫৬
৫৯. মৃত্যু এবং আখেরাতের ধ্যান করার পদ্ধতি	৫৭
৬০. একজন নবাবের ঘটনা	৫৮
৬১. একটি আশ্চর্য ঘটনা	৫৮
৬২. দৃষ্টিতে কেউ খারাপ থাকেনি	৬০
৬৩. হযরত থানভী রহ. এর অন্যান্যদেরকে উত্তম মনে করা	৬১
৬৪. একজনের দোষ অন্যকে বলবেন না	৬২
৬৫. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৬৩
৬৬. দুঃখ-কষ্টের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ	৬৫
৬৭. হযরত বাহলূল রহ. এর উপদেশমূলক ঘটনা	৬৫
৬৮. পাশ্চাত্য সভ্যতার সবকিছু উল্টো	৬৭
৬৯. জনৈক ইয়াহুদীর দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা	৬৮
৭০. প্রথমে মানুষ হও	৬৮
৭১. সগীরা এবং কবীরা গুনাহের উদাহরণ	৬৯
৭২. মাখলূক থেকে উন্নত আশা খতম করে দাও	৬৯
৭৩. আত্মশুদ্ধির জন্য প্রথম পদক্ষেপ	৬৯
৭৪. একজনের দোষ অন্যকে বলা অনুচিৎ	৬৯
৭৫. হযরত থানভী রহ. এর ঘটনা	৭০
৭৬. জনৈক শিশুর বাদশাহকে গালী দেয়া	৭১
৭৭. হযরত থানভী রহ. এর একটি ঘটনা	৭২
৭৮. কাউকে মানসিক কষ্ট দেয়া হারাম	৭৩
৭৯. কর্মচারীর উপর মানসিক পীড়ন	৭৪

বিষয় পৃষ্ঠা

৮০. "আদাবুল মুআশারাত" পাঠ করুন ৭৪
৮১. মানুষের কাছ থেকে ভাল কিছু পাওয়ার আশা বাদ দিয়ে দিন ৭৫
৮২. এক বুযুর্গের ঘটনা ৭৬
৮৩. এই গুনাহটি সাগীরাহ না কাবীরাহ? ৭৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর ইরশাদাত বা বাণীসমূহ

১. কাজ করার চমৎকার গুঢ়তত্ত্ব ৭৮
২. মাল-দৌলতের মাধ্যমে শান্তি ক্রয় করা যায় না ৭৮
৩. ঐ সম্পদ কোন্ কাজের যা সন্তানকে পিতার আকৃতি দেখাতে পারে না!! ৭৯
৪. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর পবিত্র অভ্যাস ৮০
৫. মৌলভীর শয়তানও মৌলভী ৮০
৬. মাদরাসার মুহতামিম ছাহেবের নিজে চাঁদা সংগ্রহ করা ৮০
৭. নিজের পরিবেশ নিজেই তৈরী করুন ৮১
৮. সোহাগিনী তো সেই প্রিয় মানুষ যাকে চায় ৮১
৯. কুদরতের কারখানায় কেউ খারাপ নয় ৮২
১০. আমীর হও তো এমন ৮২
১১. সুন্নাত ও বিদআতের চিত্তাকর্ষক উদাহরণ ৮৩
১২. হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি. এর তাহাজ্জুদ নামায পড়া ৮৪
১৩. বেনিয়া থেকে সেয়ানা সুতরাং পাগল ৮৫
১৪. দিল তো আছে ভাঙ্গার জন্য ৮৬
১৫. ওজনও কম আল্লাহও সন্তুষ্ট ৮৭
১৬. মেহমানদের সাথে কথা-বার্তা বলা সুন্নাত ৮৮
১৭. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৮৮
১৮. অন্যের জুতা সোজা করা ৮৯
১৯. আমার আব্বাজান ও দুনিয়ার মহব্বত ৯০
২০. দুনিয়া অপদস্থ হয়ে আসে ৯১

বিষয় পৃষ্ঠা

২১. হযরত আব্বাজানের মজলিসে আমার উপস্থিতি ৯১
২২. হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর মজলিসে আব্বাজানের উপস্থিতি ৯২
২৩. এই গুনাহ বাস্তবিকপক্ষে আগুন ৯২
২৪. এই দুনিয়া গুনাহের আগুনে ভর্তি ৯৩
২৫. দিলের সূচ হবে আল্লাহর দিকে ৯৩
২৬. রাত মহান আল্লাহ মহান নেয়ামত ৯৪
২৭. হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. ৯৫
২৮. যবানের উপর তালা লাগিয়ে দাও ৯৫
২৯. যৌথ কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বড়র দিকে করা চাই ৯৬
৩০. হযরত উমর (রাযি:) ও আদব ৯৭
৩১. মালাকুল মউতের সাথে কথোপকথন ৯৮
৩২. হযরত মুফতী শফী ছাহেব রহ. এবং সময়ের মূল্য ৯৯
৩৩. কবর থেকে আওয়ায আসছে ১০০
৩৪. যাপিত জীবনের উপর শোকগাঁথা ১০০
৩৫. জনৈক ব্যবসায়ীর অদ্ভূত ক্ষতি ১০১
৩৬. দস্তরখান ঝাড়ার সঠিক পদ্ধতি ১০১
৩৭. হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এবং রাওযায়ে আকদাসের যিয়ারত ১০৩
৩৮. ট্রেনে নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত অংশ দখল করা জায়েয নেই ১০৩
৩৯. যমযম এবং উযুর বেঁচে যাওয়া পানি বসে পান করাই উত্তম ১০৪
৪০. ডাল এবং শুকনো চাউলের নূরানিয়ত ১০৪
৪১. মেযবানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ ১০৫
৪২. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এবং বিনয় ১০৫
৪৩. হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এবং সুসংবাদ প্রদানকারী স্বপ্নসমূহ ১০৫
৪৪. জোর করে কানের মধ্যে কথা ঢেলে দিয়েছেন ১০৬
৪৫. হযরত মুফতী শফী ছাহেব রহ. এবং মালিকানার বিশ্লেষণ ১০৭
৪৬. যৌথ সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতি ১০৮
৪৭. অমুসলিমগণ ইসলামী নীতিমালা অবলম্বন করেছে ১০৮
৪৮. হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এর অভিরুচি ১০৯

বিষয় পৃষ্ঠা

৪৯. হযরত মুফতী ছাহেব রহ.-এর অসামান্য ত্যাগ ১০৯
৫০. আমার এর মধ্যে বরকত চোখে পড়ে না ১১০
৫১. জনৈক বুযুর্গের শিক্ষণীয় ঘটনা ১১১
৫২. নরমভাবে বুঝানো উচিত ১১২
৫৩. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এবং কুরআনে কারীমের তাফসীর ১১৩
৫৪. আয় এখতিয়ারভুক্ত নয়। ব্যয় এখতিয়ারভুক্ত ১১৩
৫৫. টেলিফোনে লম্বা কথা বলা ১১৪
৫৬. এটা কবীরা গুনাহ ১১৪
৫৭. আমার অন্তরে আমার আব্বার বড়ত্ব ১১৪
৫৮. এ কাজ কার জন্য ছিল? ১১৫
৫৯. একটি উপদেশমূলক ঘটনা ১১৫
৬০. হোটেলে জমিনের উপর খানা খাওয়া ১১৬
৬১. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর একটি ঘটনা ১১৭
৬২. যবানের দংশনের একটি কিচ্ছা ১১৮
৬৩. "হাদিয়া" হালাল পবিত্র সম্পদ ১১৯
৬৪. বকাঝকার সময় লক্ষ্য রাখবে ১১৯
৬৫. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১২০
৬৬. ফাতাওয়া লেখার পূর্বে ১২১
৬৭. ফাতাওয়ার যোগ্যতা ১২১
৬৮. পরামর্শের মূলনীতিসমূহ ১২২
৬৯. সুন্নাতের অনুসরণই আসল জিনিস ১২৩
৭০. হাদীস বুঝার একটি মূলনীতি ১২৪

তৃতীয় অধ্যায়
আরেফবিল্লাহ হযরত ডাক্তার মুহাম্মাদ আব্দুল হাই আরেফী রহ. এর ইরশাদাত

১. শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ ১২৬
২. নফসকে ধোঁকা দিয়ে তার দ্বারা কাজ নাও ১২৮

বিষয় পৃষ্ঠা

৩. রামাযানের দিন ফিরে আসবে ১২৯
৪. সময়ের চাহিদা দেখুন ১৩০
৫. "ইহসান" সব সময় কাম্য ১৩১
৬. হযরত ডাক্তার ছাহেব রহ. এর কারামত ১৩২
৭. মানবসেবা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না ১৩২
৮. একটি অদ্ভূত ঘটনা ১৩৩
৯. এমন ব্যক্তি খানার প্রশংসা করবে না ১৩৪
১০. আল্লাহ তাআলার রহমত বাহানা তালাশ করে ১৩৪
১১. আল্লাহর মাহবূব বনে যাও ১৩৫
১২. যদি এ মুহূর্তে বাদশাহর পয়গাম এসে পড়ে ১৩৬
১৩. নিজের শখ পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয় ১৩৬
১৪. শরীয়ত, সুন্নাত, তরীকত ১৩৭
১৫. সোজা জান্নাতে যাবে ১৩৮
১৬. প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে ১৩৯
১৭. যা করার এখনই করে নাও ১৩৯
১৮. এরপরও কি নফস অলসতা করবে? ১৪০
১৯. গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় ১৪০
২০. যদি তোমার যিন্দেগীর ফিল্ম চালিয়ে দেয়া হয় তাহলে? ১৪১
২১. ইখলাস কাম্য ১৪২
২২. একটি চমৎকার উদাহরণ ১৪২
২৩. সমস্ত কথার সারনির্যাস ১৪৩
২৪. বেশি বেশি শোকর আদায় করুন ১৪৩
২৫. এ তিক্ত ঢোক পান করতে হবে ১৪৪
২৬. দুআর পরে যদি গুনাহ হয়ে যায়? ১৪৪
২৭. অতঃপর আমি তোমাদেরকে উচ্চ মাকামে পৌঁছাব ১৪৫
২৮. খানা... একটি নেয়ামত ১৪৫
২৯. মুসলমান এবং কাফেরের খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য ১৪৬
৩০. একটি আমলের মধ্যে কয়েকটি সুন্নাতের সাওয়াব ১৪৬

বিষয় পৃষ্ঠা

৩১. মহিলারা এ অঙ্গগুলো ঢেকে রাখবে ১৪৬
৩২. নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করুন ১৪৭
৩৩. এখনো এ চাউল কাঁচা ১৪৭
৩৪. হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. এবং বিনয় ১৪৮
৩৫. যদি রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে ডাক আসে ১৪৯
৩৬. এ রোযা কার জন্য রাখছিলে? ১৪৯
৩৭. হযরত ইউনুস (আ.) এর পন্থা অবলম্বন করুন ১৫০
৩৮. নফল কাজের ক্ষতিপূরণ ১৫১
৩৯. রান্নাকারীর প্রশংসা করা উচিত ১৫৩
৪০. নিজ ভুলের উপর অনড় থাকা জায়েয নেই ১৫৪
৪১. দুঃখ-কষ্টের সময় দুরূদ শরীফ পড়ুন ১৫৫
৪২. দ্বীন কোন্ জিনিসের নাম? ১৫৫
৪৩. সুন্নাত অনুসরণের পুরস্কার ও সাওয়াব ১৫৬
৪৪. পৃথিবীর খলীফাকে প্রতিষেধক দিয়ে পাঠিয়েছেন ১৫৬
৪৫. অতীত গুনাহ ভুলিয়ে দিন ১৫৭
৪৬. গুনাহের কথা স্মরণ হলে ইস্তিগফার করবে ১৫৮
৪৭. বর্তমান অবস্থা সংশোধন করে নিন ১৫৯
৪৮. মুসাফাহার দ্বারা গুনাহ ঝরে পড়ে ১৫৯
৪৯. একজন বুযুর্গের মাগফিরাতের ঘটনা ১৬০
৫০. এখন তো এ দিলকে বানাতে হবে আপনার যোগ্য আমায় ১৬২
৫১. ইবাদতের স্বাদের সাথে পরিচিত করে দাও ১৬২
৫২. অঙ্গীকারের পর দু'আ ১৬৩
৫৩. এই কষ্টসমূহ হচ্ছে বাধ্যগত মুজাহাদা ১৬৩
৫৪. আল্লাহ তাআলার সামনে কী উত্তর দিবে? ১৬৪
৫৫. গুনাহের চাহিদার সময় করণীয় ১৬৫
৫৬. হযরত ডা: ছাহেব রহ. এর একটি ঘটনা ১৬৫
৫৭. একটি মাছির উপর স্নেহের আশ্চর্য ঘটনা ১৬৬
হযরত ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ. এর বিবিধ মালফূযাত ১৬৮

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়
দেওবন্দের কয়েকজন প্রখ্যাত আকাবিরের ইরশাদাত

১. মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ ১৭৩
২. স্বীয় আবেগ পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয় ১৭৪
৩. নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ রাখার বিধান ১৭৫
৪. জনৈক বুযুর্গের চোখ বন্ধ করে নামায পড়া ১৭৫
৫. দুনিয়াওয়ালাদের কত দিন পর্যন্ত খেয়াল করবে? ১৭৬
৬. "বান্দা" নিজ মর্জিমত চলে না ১৭৭
৭. ইংরেজের কথায় হাঁটুও খুলে দিয়েছে ১৭৭
৮. দাওয়াতের দুর্লভ ঘটনা ১৭৭
৯. খানার প্রতিক্রিয়ার ঘটনা ১৭৮
১০. হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ. এর বিনয় ১৭৯
১১. বেশি খাওয়া কোন কৃতিত্ব নয় ১৮০
১২. মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব নানূতভী রহ. এর বিনয় ১৮১
১৩. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর বিনয় ১৮২
১৪. দুই হরফ ইলম ১৮৩
১৫. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর আরেকটি ঘটনা ১৮৩
১৬. হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ.-এর বিনয় ১৮৪
১৭. হযরত মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. এর বিনয় ১৮৫
১৮. এক ডাকাত পীর বনে গেছে ১৮৬
১৯. মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর একটি ঘটনা ১৮৭
২০. বিদ্রুপের একটি আশ্চর্য ঘটনা ১৮৮
২১. রিযক বণ্টনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা ১৯০

প্রথম অধ্যায়

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর ইরশাদাত

১. জনৈক বুযুর্গের সুপারিশের ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ. নিজ মাওয়ায়েযে জনৈক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন যে, সম্ভবতঃ হযরত শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব রহ. এর ঘটনা। নাম পুরোপুরি মনে নেই। এক ব্যক্তি ঐ বুযুর্গের খেদমতে আসলেন এবং বললেন যে, “হযরত! আমার একটি কাজ আটকে আছে। আর এই কাজটি অমুক ব্যক্তির এখতিয়ারভুক্ত। যদি আপনি তার নিকট একটু সুপারিশ করে দেন, তাহলে আমার কাজ হয়ে যাবে।”

তখন ঐ বুযুর্গ বললেন : তুমি যে ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করার কথা বলছ, সে আমার ঘোর বিরোধী। আর আমার আশঙ্কা হচ্ছে এই যে, যদি আমার সুপারিশ তার পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে সে ইচ্ছে করেই তোমার কাজ করবে না। আমি তোমার সুপারিশ করে দিচ্ছি। কিন্তু আমার সুপারিশ দ্বারা উপকারের পরিবর্তে অপকারের আশঙ্কাই বেশি। কিন্তু ঐ ব্যক্তি নাছোড় বান্দার মত ঐ বুযুর্গের পিছনেই পড়ে থাকল। সে বলতে লাগল : “যাইহোক, আপনি লিখে দিন। কেননা যদিও সে আপনার বিরোধী, কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্ব এমন যে, আশা করি সে এটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।”

ফলশ্রুতিতে ঐ বুযুর্গ অপারগ হয়ে তার নামে একটি পারচা লিখে দিলেন।

যখন ঐ ব্যক্তি পারচা নিয়ে সেখানে পৌঁছল, তখন ঐ বুযুর্গের যেটা ধারণা ছিল, সেটাই সঠিক প্রমাণিত হল। অর্থাৎ সে এ পারচার মূল্যায়ন করা বা এ পারচা অনুযায়ী আমল করা তো অনেক পরের ব্যাপার, আল্লাহর ঐ বান্দা ঐ বুযুর্গকে গালী দিয়ে বসল।

এখন এই ব্যক্তি ঐ বুযুর্গের কাছে ফিরে আসল এবং এসে বলল যে, হযরত! আপনার কথা সত্য ছিল। বাস্তবেই সে এটার মূল্যায়নও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তো দূরের ব্যাপার সে তো উল্টো গালী দিল। তখন ঐ বুযুর্গ বললেন : এখন আমি আল্লাহ পাকের নিকট তোমার জন্য দু‘আ করব যেন আল্লাহ তাআলা তোমার কাজ সমাধা করে দেন।

২. সুপারিশ প্রসঙ্গে হযরত হাকীমুল উম্মতের বক্তব্য

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন : এমনভাবে সুপারিশ করোনা যার দ্বারা অন্য মানুষ প্রভাবিত হয়। যার দ্বারা চাপ পড়ে এ জাতীয় সুপারিশ জায়েয নেই। কেননা ‘সুপারিশ’ এর মর্ম হল ‘মনোযোগ আকৃষ্ট করা।’ অর্থাৎ আমার বিবেচনায় এ ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত এবং আমি আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করছি যে ইনি খরচের যথোপযুক্ত খাত। এ ব্যক্তির পিছনে কিছু খরচ করলে আপনি ইনশাআল্লাহ অনেক সাওয়াব পাবেন।

সুপারিশের অর্থ এই নয় যে এ কাজটা আপনি অবশ্যই করে দিন। আপনি করে না দিলে আমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাব। মনক্ষুন্ন হব। এটা সুপারিশ নয় বরং চাপ প্রয়োগ।

৩. মজমার মধ্যে চাঁদা তোলা জায়েয নেই

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন : যদি কেউ মজমার মধ্যে চাঁদার ঘোষণা দেয় যে, অমুক কাজের জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছে চাঁদা দিন। এখন যে ব্যক্তির চাঁদা দেয়ার কোন মানসিকতা ছিল না, সে এখন অন্যের দেখাদেখি লজ্জায় পড়ে চাঁদা দিয়ে দিল আর চিন্তা করল যে, চাঁদা না দিলে নাক কাটা যাবে।

তো যেহেতু এই চাঁদা তিনি স্বত:স্ফূর্ত চিত্তে দেননি তাই এটা নেয়া হালাল হবে না। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

অর্থাৎ “কোন মুসলমানের সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা জায়েয নেই।” (মাজমাউয যাওয়ায়িদ পৃ: ১৭২ খণ্ড ৪ মুসনাদে আবূ ইয়ালার উদ্ধৃতিতে) এজন্য এভাবে চাঁদা তোলা জায়েয হবে না।

৪. একজন বুযুর্গের শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ. একজন বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন যে, এক বুযুর্গের স্ত্রী ছিল খুব ঝগড়াটে মহিলা। সব সময় ঝগড়া-বিবাদ করতেই থাকত। ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই অভিসম্পাত তিরষ্কার লড়াই-ঝগড়া আরম্ভ হয়ে যেত। এক ব্যক্তি ঐ বুযুর্গকে বলল যে, দিন-রাত এই ঝগড়া প্রতিপালনের কী প্রয়োজন? এই কাহিনী শেষ করে দিন এবং তালাক দিয়ে দিন। তখন ঐ বুযুর্গ উত্তর দিলেন : ভাই তালাক দেয়া তো সহজ। যখন চাইব দিয়ে দিব। আসল ব্যাপার হল, এই মহিলার মধ্যে যদিও অনেক খারাবী দেখা যায়, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটি গুণ আছে, যে কারণে আমি তাকে কখনো ছাড়ব না এবং কখনো তালাক দিব না। সেটা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে বিশ্বস্ততার এমন গুণ রেখেছেন যে, যদি কথার কথায় আমি বন্দী হই এবং পঞ্চাশ বছর জেলে থাকি, তাহলেও আমার বিশ্বাস এটাই যে, আমি তাকে যে কোণায় বসিয়ে যাব; ঐ কোণাতেই বসে থাকবে। অন্য কারো দিকে চোখ উঠিয়ে দেখবে না। আর এই বিশ্বস্ততা এমনই মহামূল্যবান একটি গুণ যার কোন মূল্য হয় না।

৫. আমাদের সমাজের মেয়েরা পৃথিবীর হুর

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেনঃ আমাদের ভারতবর্ষের মেয়েরা পৃথিবীর হুর। এর কারণ হল তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততার গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যখন থেকে পশ্চিমা সভ্যতার তুফান শুরু হল, তখন থেকে ধীরে ধীরে এ ভাল স্বভাবটিও বিলুপ্ত হতে চলেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততার এমন গুণ রেখেছেন যে, যত কিছুই হোক কিন্তু সে স্বীয় স্বামীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তার নজর স্বামী ছাড়া আর কারো দিকে যায় না।

যাই হোক। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : যদি মহিলার কোন স্বভাব তোমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়, তাহলে অন্য স্বভাব তোমার কাছে অবশ্যই ভাল লাগবে। তুমি সেদিকেই লক্ষ রাখবে। ফলশ্রুতিতে তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। সমস্ত খারাবীর মূল হলঃ মহিলাদের মন্দ স্বভাবের দিকে লক্ষ করা হয়। ভাল স্বভাবসমূহের দিকে লক্ষ রাখা হয় না।

৬. একজন অবলা নারী থেকে শিক্ষা নাও

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন : তোমরা একজন মূর্খ ও অশিক্ষিত মেয়ে থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। শুধু দুইটা কথার মাধ্যমে যখন একজন স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হল, একজন বললঃ আমি বিবাহ করলাম। আর আরেকজন বললঃ আমি কবূল করলাম। ঐ মেয়েটা এই দুই কথা তথা ঈজাব-কবূলের এমন সম্মান রেখেছে যে, মা-বাবা, ভাই-বোন নিজের পরিবার তথা সকলকে সে ছেড়ে চলে এসেছে আর স্বামীর হয়ে গেছে এবং স্বামীর কাছে এসে সে বন্দী হয়ে গেছে।

দেখুন! এই অবলা নারী ঐ দুটি কথার কী পরিমাণ লাজ রেখেছে। এবং এত বিশ্বস্ত থেকেছে। তো একজন সাধারণ নারী যদি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একজনের হয়ে যেতে পারে, তাহলে তোমরা কেন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এই দুটি বাক্য পড়ে মহান আল্লাহর জন্য হতে পারছনা যার জন্য তোমরা এই কালিমা পড়েছ। তোমাদের থেকে কি এতটুকু লাজ রক্ষা করাও সম্ভব হবে না যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর হয়ে যাবে?

৭. রেহায়েশও জায়েয। আসায়েশও জায়েয

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেনঃ বসবাসের জন্য একটি ঘর সেটাতো জায়েয। উদাহরণ স্বরূপঃ কেউ থাকার জন্য ঝুপড়ী তৈয়ার করল যেখানে মানুষ 'রেহায়েশ' (বসবাস) অবলম্বন করে। এটা হল প্রাথমিক পর্যায়। আর দ্বিতীয় পর্যায় হল 'রেহায়েশ' যা বসবাসের পাশাপাশি 'আসায়েশ' বা আরাম হওয়া। উদাহরণ স্বরূপঃ পাকা বাড়ী। যেখানে মানুষ আরামের সাথে থাকতে পারে। ঘরের আরামের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিষেধ নয়। এবং এটা অপচয়ের অন্তর্ভুক্তও নয়।

মনে করুন এক ব্যক্তি সে ঝুপড়ী ঘরে থাকতে পারে। আর আরেক ব্যক্তি সে ঝুপড়ীতে থাকতে পারে না। এর তো বসবাসের জন্য পাকা ঘর লাগবে। আবার ঐ ঘরেও পাংখা এবং বিদ্যুৎ লাগবে। এখন যদি কেউ নিজ ঘরে পাংখা এবং বিদ্যুতের সংযোগ এজন্য দেয় যে, এতে তার আরাম হবে, তাহলে এটা অপচয় হিসেবে গণ্য হবে না।

৮. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেনঃ পুরুষদের এ আয়াত তো মনে থাকে اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ অর্থাৎ “পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্ববান।” (সূরা নিসা : ৩৪)

ব্যস এখন বসে বসে নারীর উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। আর মনের মধ্যে এ কথা বদ্ধমূল যে, নারীর সব সময় পুরুষের অনুগত থাকা উচিত। তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হল মালিক ও দাসের মত। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা আরেকটি আয়াতও নাযিল করেছেন সেই আয়াত পুরুষদের মনে থাকে না। সেই আয়াতটি হল :

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً

অর্থাৎ “আর আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে আরাম পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রীতি দান করেছেন।” (সূরা রূম, আয়াত : ২১)

নিঃসন্দেহে পুরুষ বা স্বামী মহিলা বা স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ববান কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও আছে। ব্যবস্থাপনাগত দিক দিয়ে তো অবশ্যই কর্তৃত্ববান কিন্তু পরস্পরে সম্পর্ক থাকবে বন্ধুর মত। এমন সম্পর্ক নয় যেটা মালিক আর দাসের মধ্যে থাকে।

ব্যাপারটির উদাহরণ তো এমনই যেমন দুই বন্ধু কোথাও সফরে বের হল। আর এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে আমীর বানিয়ে নিল। সুতরাং এ হিসেবে স্বামীও আমীর। অর্থাৎ দাম্পত্য যিন্দেগীর এই যে সফর এর আমীর হলেন স্বামী। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে স্ত্রীর সাথে চাকর বা দাসের ন্যায় আচরণ করবে। বরং এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কেরও কিছু আদব বা নীতিমালা আছে। আছে কিছু তাকাযা বা আবেদন। ঐ সব আদব ও তাকাযা পুরা করতে হয়। তাহলেই দাম্পত্য জীবন হয় সুখময়।

৯. এমন প্রভাব কাম্য নয়

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেনঃ কোন কোন পুরুষ মনে করে যে, আমরা তো কর্তৃত্ববান। কাজেই আমাদের এমন প্রভাব

থাকতে হবে যাতে আমাদের নাম শুনে স্ত্রী কাঁপতে থাকে। এবং সাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে না পারে!

আমার একজন সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার খুব গর্বের সাথে আমাকে বললেন : যখন আমি কয়েক মাস পর নিজ বাড়ীতে যাই, তখন আমার স্ত্রী-সন্তানদের সাহস হয় না যে আমার নিকট আসবে। আর আমার সাথে কথা বলবে। তিনি খুব গর্বের সাথে কথাটা বলছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি যখন বাড়ীতে যান তখন কি আপনি কোন হিংস্র প্রাণী বা বাঘ কিংবা চিতা হয়ে যান? যে কারণে আপনার বিবি বা বাচ্চারা আপনার কাছে আসে না? তিনি বললেন : ব্যাপারটা এমন নয় বরং আমি যেহেতু কর্তৃত্ববান এজন্য আমার প্রভাব থাকা দরকার।

খুব ভালভাবে বুঝে নিন। কর্তৃত্ববান হওয়ার মর্ম কক্ষনো এটা নয় যে, স্ত্রী-সন্তানগণ কাছে আসতে বা কথা বলতেও ভয় পাবে। বরং তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কও আছে।

১০. স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর পয়সার দরদ থাকতে হবে

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত রহ. বলেনঃ স্বামীর পয়সার প্রতি দরদ থাকা মহিলার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। স্বামীর পয়সা বিনা কারণে ভুল স্থানে ব্যয় করবে না। অপচয় করবে না। এমন যেন না হয় যে, দিল খুলে স্বামীর পয়সা খরচ করা হল বা ঘরের চাকরানীদের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হল। তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খরচ করে। যদি কোন মহিলা এমন করে তাহলে বুঝতে হবে সে তার দায়িত্বের বিপরীত কাজ করছে।

১১. কিয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে কথা বলবে?

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. একবার কোন স্থানে সফরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় নব্য শিক্ষার অনুরাগী জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হল। তিনি কুরআনে কারীমের কোন একটি আয়াত বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন একটি হাদীসের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে বললেন যে হযরত! কুরআন শরীফে আছে যে কিয়ামতের দিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে। হাত সাক্ষ্য দিবে পা সাক্ষ্য দিবে।

ঐ ব্যক্তি বললেনঃ এটা দারূণ আশ্চর্যজনক ব্যাপার! হাত আবার কিভাবে কথা বলবে? পা কিভাবে কথা বলবে?

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. প্রতিউত্তরে বললেন: এটা আল্লাহ তাআলার কুদরত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বলার শক্তি দিয়ে দিবেন। ঐ ব্যক্তি বললেন: এমনটি কখনো হয়েছে কি? হযরতওয়ালা বললেন: তুমি দলীল জিজ্ঞাসা করছ নাকি দৃষ্টান্ত? এটা যুক্তি বিদ্যার একটা পরিভাষা। দলীল হিসেবে তো এটাই যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বাকশক্তি দান করেন, আর প্রত্যেক জিনিসের দৃষ্টান্ত থাকা জরুরী নয়। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন: মনের প্রশান্তির জন্য কোন দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিন। হযরতওয়ালা রহ. বললেন: আচ্ছা বল এই 'যবান' কিভাবে হয়? যেহেতু তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে যবান ছাড়া হাত কিভাবে কথা বলবে? হযরতওয়ালা বললেন: যবান ব্যতীত যবান কিভাবে বলতে পারে? এটাও তো গোশতের একটা টুকরাই। এটার মধ্যে বলার শক্তি কোথা থেকে এসে গেল? ব্যস, আল্লাহ তাআলা দান করেছেন।

তো যেই আল্লাহ গোশতের এই পিণ্ডকে যবান দান করতে পারেন তিনি হাতকেও দান করতে পারেন। এজন্য এতে বিস্ময়ের কী আছে?

যাই হোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে পরস্পরে কথোপকথনের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন এর বিলকুল ঠিক ঠিক প্রকৃত অর্থও হতে পারে যে জান্নাত ও জাহান্নামকে আল্লাহ তাআলা বলার শক্তি দান করবেন। যদ্দরুণ তাদের মধ্যে পরস্পরে কথাবার্তা হবে এটা আশ্চর্যজনক কোন ব্যাপার নয়। আবার এটাও হতে পারে যে, এটা একটি দৃষ্টান্ত।

১২. হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর বিনয়

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: "আমি নিজেকে সমস্ত মুসলমান থেকে বর্তমান হালতে এবং কাফেরদের থেকে ভবিষ্যত বিচারে হীন মনে করি।" অর্থাৎ নিজেকে সকল মুসলমানদের থেকে নিকৃষ্ট মনে করতেন ফিলহাল বা বর্তমান অবস্থায়। আর কাফেরদের থেকে ফিলমাআল বা ভবিষ্যতকালের হিসেবে। কেননা হতে পারে এ কাফের ব্যক্তি যে কোন সময় মুসলমান হয়ে যাবে এবং আমার থেকে আগে বেড়ে যাবে।

১৩. হযরত থানভী রহ. এর চিকিৎসা পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর এখানে সব থেকে বেশি গুরুত্ব এ ব্যাপারে ছিল যে, বিভিন্ন আত্মিক ব্যাধির শিকার লোকজন আসতেন এবং

হযরত তাদের চিকিৎসা করতেন। তাদের চিকিৎসাও কোন ঔষধ পান করিয়ে হত না। ওয়াযিফা পড়িয়ে হত না। বরং আমলের মাধ্যমে হত। অনেক মানুষের চিকিৎসা এভাবে করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ : অহংকারে আক্রান্ত এক ব্যক্তি। তার চিকিৎসা এভাবে করা হয়েছে যে, যারা মসজিদে নামায পড়ার জন্য আসবে তুমি তাদের জুতো সোজা করবে। ব্যস এই কাজে লগিয়ে দিয়েছেন। না কোন ওয়াযিফা। না কোন তাসবীহ। হযরত তাকে দেখে বুঝে ফেলেছেন যে, তার মধ্যে অহংকারের ব্যাধি আছে এবং সেটার এই চিকিৎসা তার জন্য সমীচীন হবে।

১৪. স্বীয় খাদেমদের সাথে হযরত থানভী রহ. এর ব্যবহার

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ. এর একজন খাদেম ছিলেন ভাই নিয়ায। খানকায় আসা যাওয়াকারী সমস্ত মানুষ তাঁকে "ভাই নিয়ায" বলে ডাকতেন।

হযরত থানভী রহ.-এর একান্ত খাদেম ছিলেন। আর যেহেতু হযরতের খেদমত করতেন এবং হযরতওয়ালার মহব্বতও হাসিল ছিল, তো এ জাতীয় মানুষের মধ্যে অনেক সময় একটু নায (গর্ব) সৃষ্টি হয়ে যায়। ছিলেন "নিয়ায" কিন্তু নাযও সৃষ্টি হল। এ জন্য খানকায় আসা যাওয়াকারীদের সাথে অনেক সময় অভিমানী হয়ে পড়তেন।

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরতওয়ালা থানভী রহ.-এর নিকট ভাই নিয়াযের ব্যাপারে অভিযোগ করে বললেন যে, হযরত! ইনি মানুষের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করেন। আর আমাকে গালমন্দ করেছেন।

যেহেতু হযরতওয়ালার নিকট পূর্বেও তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ পৌঁছেছিল এজন্য হযরতওয়ালা তাঁকে ডাকালেন এবং ধমক দিয়ে বললেন যে, "মিয়া নিয়ায! এটা তুমি কী করছ? সকলের সাথে লড়াই ঝগড়া করছ।"!!

তিনি এটা শুনেই উত্তরে বললেন যে, হযরত! মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন!

এখন এই কথা একজন ভৃত্য তার মনিবকে বলছে। মনিবও কে? হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ.

বাস্তবিকপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, হযরত! আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না। বরং আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যারা আপনার নিকট আমার ব্যাপারে মিথ্যা অভিযোগ পৌঁছিয়েছে, তারা মিথ্যা অভিযোগ

পৌঁছিয়েছে। তাদের উচিত মিথ্যা না বলা। আল্লাহকে ভয় করা। কিন্তু জোশের কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে যবান থেকে এই শব্দ বের হয়ে গেছে যে, হযরত! মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন।

এখন দেখুন যদি একজন মনিব তার ভৃত্যকে বকাঝকা দেয় আর ঐ মুহূর্তে ভৃত্য বলে যে, মিথ্যা বলবেন না। তাহলে মনিব তখন আরো বেশি রাগান্বিত হবে। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু তিনি ছিলেন হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.। এদিকে ভাই নিয়ায বলল : মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন। ওদিকে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. সঙ্গে সঙ্গে গর্দান নত করে ফেললেন এবং বললেন : আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ।

১৫. আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হতে পারে না

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ওয়াদা করেছেন وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ "যারা আমাকে পাওয়ার জন্য মুজাহাদা বা মেহনত করবে لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর তরজমা করেছেন: "আমি তার হাত ধরে নিয়ে যাব।"

এমন নয় যে দূর থেকে দেখানো হবে "ঐটা রাস্তা" বরং বলেছেন: আমি তার হাত ধরে নিয়ে চলব। কিন্তু কেউ কদম তো আগে বাড়াক, কেউ ইচ্ছা তো করুক। কেউ একটু নফসের বিরোধিতাই করুক। এরপরই মহান আল্লাহর সাহায্য আসবে। এটা আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। এটার নামই 'মুজাহাদা'।

মানুষ যদি একবার হিম্মত করে যে, এ কাজ আর করব না। চাই আমার বুকে করাত চলুক। মনের ইচ্ছাগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাক। মন ও মস্তিষ্কে কিয়ামত অতিবাহিত হয়ে যাক। কিন্তু এই গুনাহের কাজ আমি করব না। বান্দা যেদিনই নফসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আল্লাহ তাআলা বলেন: ঐদিন থেকে সে আমার মাহবূব হয়ে গেল। এখন আমি নিজে তার হাত ধরে আমার পথে নিয়ে আসব।

১৬. তাসাওউফের সারনির্যাস

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: ঐ সামান্য কথাটি যা তাসাওউফের সারনির্যাস সেটা হল এই: যখন কোন ভাল কাজ করতে অলসতা লাগে। উদাহরণ স্বরূপ: নামায এর সময় হয়ে গেছে। কিন্তু নামাযে যেতে অলসতা লাগছে। তখন ঐ অলসতার মোকাবেলা করে ঐ গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে হবে। এর দ্বারাই মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে উন্নতি হয়।

এ গুণ যার হাসিল হয়ে গেছে তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। কাজেই মনের মন্দ প্রবৃত্তিগুলোর ওপর করাত চালিয়ে চালিয়ে এবং হাতুড়ি মেরে মেরে যখন সেটাকে পিষে ফেলবে, তখন ঐ নফস পিষে যাওয়ার বরকতে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর তাজাল্লীগাহ বনে যাবে।

১৭. নফসকে মজা থেকে দূরে রাখতে হবে

হযরত থানভী রহ. তো আমাদের জন্য এই আমল কত সহজ করে দিয়েছেন। নতুবা পূর্বের যুগে তো সূফীয়ায়ে কেরাম আল্লাহ জানেন কী কী মুজাহাদা করাতেন। সূফীয়ায়ে কেরাম এর ওখানে লঙ্গর হত। ঐ লঙ্গরে ঝোল তৈরী হত। খানকায় যে সব মুরীদ অবস্থান করতেন তাদের জন্য নির্দেশ ছিল এই যে, যার কাছে ঝোলের এক পেয়ালা আসবে সে যেন ঐ ঝোলে এক পেয়ালা পানি মিলিয়ে নেয়। এরপর খায়। যাতে করে নফসকে মজা থেকে দূরে রাখা যায়।

এতদ্ব্যতীত তাদেরকে অনাহারেও রাখা হত। কিন্তু ঐ যুগ আর এই যুগের মধ্যে অনেক পার্থক্য। যেমনিভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগের পরিবর্তনের কারণে চিকিৎসার পদ্ধতি পাল্টে যায়। এমনিভাবে হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. আমাদের যমানা হিসেবে আমাদের মন মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থাপত্র ঠিক করেছেন। খানা কম খাওয়ার ব্যবস্থাপত্র আমাদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। যাতে খানা কম খাওয়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

১৮. এই পাত্র আমানত

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. তাঁর অসংখ্য ওয়াযে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যে, অনেক মানুষ প্রায় সময় এমনটি করে যে, যখন তার ঘরে কেউ খানা পাঠায়। ঐ বেচারা খানা প্রেরণকারীর ভুল এটাই হয়েছে যে তিনি আপনার ঘরে খানা পাঠিয়েছেন। এখন সহীহ পদ্ধতি তো ছিল এই যে, সেই খানা তুমি অন্য পাত্রে ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে হাদিয়া প্রদানকারীর পাত্র ফেরত পাঠাবে। কিন্তু সাধারণত: যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এই যে, ঐ বেচারা খানা প্রেরণকারী পাত্র থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।

দেখা যায় ঐ পাত্র ঘরে পড়ে আছে। ফেরত পাঠানোর কোন ফিকির নেই। বরং অনেক সময় তো এমনও হয় যে, ঐ পাত্রগুলো নিজেই ব্যবহার করা আরম্ভ করে দেয়। এটা আমানতের খেয়ানত। কেননা ঐ পাত্র আপনার নিকট আরিয়ত বা স্বল্প সময়ের জন্য এসেছিল। আপনাকে এর মালিক বানানো হয়নি।

অতএব ঐসব পাত্র ব্যবহার করা এবং সেগুলো ফেরত পাঠানোর চিন্তা না করা আমানতের মধ্যে খেয়ানত।

১৯. হযরত থানভী রহ. এর সতর্কতা

বর্তমানে বাজারে ফলের যে বেচাকেনা হয়, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, বর্তমানে গাছে ফুল আসার পূর্বেই পুরো গাছ বিক্রি করে দেয়া হয়। অথচ এভাবে ফল আসার পূর্বে সেটা বিক্রি করা জায়েয নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফল প্রকাশ না পাবে অতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করা জায়েয নেই। এই শরয়ী হুকুমের কারণে কোন কোন আলেম এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, বাজারে যে সব ফল বিক্রি হয়, সেগুলোর ক্রয়-বিক্রয় যেহেতু এ পদ্ধতিতেই হয়। এ জন্য ঐ সব ফল ক্রয় করে খাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলেছেন : এ সব ফল খাওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু তিনি নিজে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং সারা জীবন বাজার থেকে ফল কিনে খাননি। অবশ্য অন্যদেরকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইনারাই হলেন আল্লাহ পাকের এমন বান্দা যারা অন্যকে যে ব্যাপারে উৎসাহ দেন তার থেকে বেশি নিজেরাই সেটার উপর আমল করেন। এ জন্যই তাঁদের কথায় আছর বা প্রতিক্রিয়া হয়।

২০. বাচ্চাদেরকে মারার পদ্ধতি

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এ ব্যাপারে অদ্ভূত একটি কথা বলতেন। হযরত বলতেন: যদি কখনো সন্তানকে প্রহার করার প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা তার উপর গোস্বা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহলে যে সময় গোস্বা থাকে ঐসময় মেরো না। বরং পরবর্তীতে যখন গোস্বা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন কৃত্রিম গোস্বা সৃষ্টি করে প্রহার কর। কেননা প্রকৃত গোস্বার সময় মারলে বা গোস্বা করলে সীমার উপর অটল থাকতে পারবে না। বরং সীমালংঘন করে ফেলবে। আর যেহেতু প্রয়োজনের খাতিরে মারতে হচ্ছে।

এজন্য কৃত্রিম গোস্বা সৃষ্টি করে তারপর মার যাতে আসল মাকসাদও হাসিল হয়ে যায় এবং সীমার বাইরেও যাওয়া না লাগে।

আমি (হাকীমুল উম্মাত থানভী) সারা জীবন এর উপর আমল করেছি। প্রকৃতিগত গোস্বার সময় কাউকে মারিনি। কাউকে বকাও দেইনি। এরপর যখন গোস্বা ঠাণ্ডা হয়ে যেত তখন তাকে ডেকে কৃত্রিম প্রকৃতির গোস্বা সৃষ্টি করে ঐ উদ্দেশ্য হাসিল করে নিতাম। যাতে সীমালংঘন না হয়। কেননা গোস্বা এমন একটা জিনিস যেখানে অধিকাংশ সময় মানুষ সীমারেখার উপর অটল থাকতে পারে না।

২১. ফাসেক ও ফাজেরের গীবতও জায়েয নেই

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: এক মজলিসে হযরত উমর রাযি.-এর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. উপস্থিত ছিলেন। ঐ মজলিসেই জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিন্দাবাদ আরম্ভ করে দিল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. তাকে থামালেন এবং বললেন "এই যে তুমি তার সমালোচনা করছ এটা গীবত। আর তুমি এটা মনে করনা যে, যেহেতু হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হাজার হাজার মানুষ হত্যাকারী এজন্য তার গীবত হালাল হয়ে গেছে"।

অথচ তার গীবত হালাল হয়নি। বরং মহান আল্লাহ যেখানে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ থেকে হাজারো মানুষের রক্তের হিসাব নিবেন, সেখানে যারা তার গীবত করেছে তাদের হিসাবও নিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাযতে রাখুন। আমীন।

সুতরাং এটা মনে করবে না যে, অমুক ব্যক্তি ফাসেক, ফাজের ও বিদআতী, তার যত ইচ্ছা গীবত করব। বরং এ জাতীয় মানুষের গীবত থেকে বেঁচে থাকাও ওয়াজিব।

২২. গীবত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: অনেকে আমার কাছে আসে এবং বলে যে, আমি আপনার গীবত করেছিলাম আমাকে মাফ করে দিন। আমি তাদেরকে বলি, আমি তোমাকে মাফ করে দিব। কিন্তু একটি শর্ত আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, প্রথমে আমাকে বলতে হবে কী গীবত করেছিলে? যাতে আমি জানতে পারি আমার অন্তরালে কী বলা হয়।

کہتے ہیں تجھے خلق خدا غائبانہ کیا ؟ আল্লাহর মাখলূকবৃন্দ আড়ালে আড়ালে তোমার ব্যাপারে বলেটা কী? যদি আমাকে বল তাহলে আমি মাফ করে দিব।

কেননা হতে পারে আমার ব্যাপারে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটা সঠিক। আর বাস্তবেই আমার মধ্যে ঐ ভুলটি আছে। জিজ্ঞেস করার দ্বারা ঐ ভুলটি সামনে এসে যাবে। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে এর থেকে বাঁচার তাওফীক দান করবেন। এজন্য আমি জিজ্ঞেস করে নেই।

তাই কখনো কারো গীবত হয়ে গেলে সেটার চিকিৎসা বা প্রতিকার হল ঐ ব্যক্তিকে বলবে, আমি আপনার গীবত করেছি। নিজের মুখে এ কথা বলা দারুণ কষ্টকর কাজ। অন্তরে তখন মারাত্মক করাত চলবে। কিন্তু চিকিৎসা এটাই। দুই চারবার এ চিকিৎসা গ্রহণ করলে ইনশাআল্লাহ আগামীতে আর কারো গীবত হবে না।

বুযুর্গানে দ্বীন গীবত থেকে বাঁচার জন্য অন্য চিকিৎসার কথাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ: হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন: যখন অন্য মানুষের আলোচনা মুখে চলে আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজ দোষসমূহের কথা মনের মধ্যে উপস্থিত কর। কোন মানুষ এমন নেই যে দোষমুক্ত। আর এই খেয়াল কর যে, স্বয়ং আমার মধ্যে তো অমুক বদস্বভাব আছে। আমি অন্যের কী দোষ বর্ণনা করব? আর ঐ আযাবের কথাও চিন্তা কর, যেটার কথা একটু পূর্বে বলা হয়েছে। যদি আমি কারো গীবত করি তাহলে এর পরিণতি কত মারাত্মক হবে!

এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করবে হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে নাজাত দান করুন। মজলিসে কারো গীবত আরম্ভ হলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দিকে রুজু করবে ইয়া আল্লাহ! মজলিসে এ আলোচনা হচ্ছে আমাকে আপনি রক্ষা করুন। আমি যাতে এর মধ্যে লিপ্ত হয়ে না পড়ি।

২৩. হকসমূহ মাফ করানোর পদ্ধতি

হযরত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ. এবং আমার মুহতারাম আব্বা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. তো এ কাজ করেছিলেন যে, একটি চিঠি লিখে সকলের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন : জীবনে জানা নেই আপনার কত হক নষ্ট হয়েছে। কত ভুল হয়েছে। আমি এজমালীভাবে আপনার নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন। এই চিঠি নিজ সম্পর্কধারী সকলের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে ঐ সব হক মাফ করে দিবেন। কিন্তু যদি এমন মানুষের হক নষ্ট করে, যার সাথে যোগাযোগ করা এখন আর সম্ভব নয়। হয়ত তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে অথবা এমন কোন স্থানে চলে গেছে যে, তার ঠিকানা জানাও সম্ভব হচ্ছে না। তো এমন ক্ষেত্রের জন্য হযরত হাসান বসরী রহ. বলতেন : যার গীবত করা হয়েছে অথবা যার হক নষ্ট করা হয়েছে, তার জন্য খুব দুআ কর যে, ইয়া আল্লাহ! আমি তার যে গীবত করেছি সেটাকে তার জন্য উন্নতির উপলক্ষ বানিয়ে দিন এবং তাকে দ্বীন-দুনিয়ার তারাক্কী দান করুন এবং তার জন্য বেশি বেশি ইসতিগফার কর। তো এটাও ক্ষতিপূরণের একটি পদ্ধতি।

যদি আমরাও আমাদের সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের নিকট এ জাতীয় চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেই, তাহলে আমাদের কোন অসম্মান আছে কি?

এমনও তো হতে পারে যে, এই উসীলায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দিবেন।

২৪. গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ এটাই যে, অন্য মানুষের আলোচনাই করবে না। ভাল কথাও না। মন্দ কথাও না। কেননা এ শয়তান বড় খবীস। কেননা যখন তুমি কারো গুণাবলীর আলোচনা করবে যে অমুক মানুষ খুব ভাল মানুষ। তার মধ্যে এই এই গুণ আছে। তখন মনের মধ্যে এই খেয়াল থাকবে যে আমি তো তার প্রশংসাই করছি। গীবত তো আর করছি না। কিন্তু পরবর্তীতে এমন হবে যে তার গুণাবলী বলতে বলতে শয়তান মাঝখানে এমন কোনো বাক্য ঢেলে দিবে যদ্দরুন ঐ ভাল কথা মন্দ কথায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ: সে বলবে: অমুক ব্যক্তি তো খুব ভাল মানুষ। কিন্তু তার মধ্যে এই খারাবী আছে। "কিন্তু" কথাটা এসে সমস্ত কর্ম বরবাদ করে দিবে।

এর ফলাফল হবে এই যে, কথাবার্তার ধারা গীবতের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এজন্য অন্য মানুষের আলোচনা করারই প্রয়োজন নেই। না ভাল আলোচনা, না মন্দ আলোচনা। আর যদি কারো গুণাবলীর আলোচনা করতেই হয় তখন কোমর কষে সাবধানে থাকবে যাতে শয়তান ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে।

২৫. হযরত থানভী রহ. এবং সময়ের মূল্য

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলেন : আমি নিজে হযরত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.কে দেখেছি যে, মৃত্যু রোগে যখন অসুস্থ ও শয্যাশায়ী ছিলেন আর চিকিৎসকগণ দেখা-সাক্ষাৎ নিষেধ করে দিয়েছেন। এবং এটাও বলে দিয়েছেন যে, হযরত! আপনি বেশি কথা বলবেন না।

একদিন হযরত চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ছিলেন, হঠাৎ হযরতের চোখ খুলে গেল এবং বললেন : ভাই মৌলভী মুহাম্মাদ শফী ছাহেবকে ডাকো, যখন ডাকা হল এবং তিনি আগমন করলেন তখন হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. বললেন : "আপনি এখন আহকামুল কুরআন লিখছেন। আমার মনের মধ্যে এখনি আসল যে, কুরআনে কারীমের অমুক আয়াত দ্বারা অমুক মাসআলা বের হয়। আর এই মাসআলা আমি ইতোপূর্বে কোথাও দেখিনি। আমি আপনাকে এ জন্য বললাম যাতে করে আপনি যখন এ আয়াতে পৌঁছবেন, তখন এ মাসআলাটিও লিখে দিতে পারেন।"

ব্যস এ কথাগুলো বলে পুনরায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুললেন এবং বললেন যে, অমুক কে ডাকো। তিনি আসার পর তার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কাজের কথা বললেন।

যখন বারবার এমন করছিলেন, তখন হযরত থানভী রহ.-এর ভ্রাতুস্পুত্র মাওলানা শাব্বীর আলী ছাহেব রহ. যিনি হযরতের খানকার নাযেম ছিলেন এবং হযরত থানভীর সাথে তাঁর অকৃত্রিম সম্পর্কও ছিল। তিনি হযরতকে বললেন যে, হযরত! ডাক্তার ও হেকীমগণ তো আপনাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন অথচ আপনি লোকদেরকে বারবার ডেকে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাদের জানসমূহের উপর একটু দয়া তো করুন।

প্রতিউত্তরে হযরত কী অদ্ভূত কথা বললেন : হযরত বললেন : কথা তো তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে, জীবনের ঐ মুহূর্তগুলো কোন্ কাজের যা কারো খেদমতে ব্যয়িত হল না। যদি কারো খেদমতে জীবন পার হয়ে যায়, তাহলে এটা হল আল্লাহ তাআলার নেয়ামত।

২৬. হযরত থানভী রহ. এবং সময়সূচী

হযরত থানভী রহ.-এর এখানে সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ সময়সূচী নির্ধারিত ছিল। এমনকি হযরতের অভ্যাস ছিল এই যে, আসরের

নামাযের পর নিজ স্ত্রীদ্বয়ের নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন, উভয় স্ত্রীর নিকট আসরের নামাযের পর ইনসাফ ও সমতার সাথে তাঁদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এবং তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য যেতেন। আর এটাও বাস্তবিকপক্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত ছিল।

হাদীসে পাকে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ার পর একে একে সমস্ত সম্মানিতা স্ত্রীদের নিকট তাঁদের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন। আর এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনিকের অভ্যাস ছিল।

এখন দেখুন দুনিয়ার সমস্ত কাজও হচ্ছে। জিহাদও হচ্ছে। তালীমও হচ্ছে। তাদরীসও হচ্ছে। দ্বীনের সমস্ত কাজও হচ্ছে। আর সাথে সাথে স্ত্রীদের নিকট গিয়ে তাঁদের মনও খুশী করা হচ্ছে।

আমাদের হযরত থানভী রহ. নিজ জীবনকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ছাঁচে গড়ে নিয়েছিলেন। সুন্নাতের অনুকরণেই তিনিও আসরের নামাযের পর নিজ উভয় স্ত্রীর নিকট গমন করতেন। কিন্তু সময় নির্ধারিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ : এক স্ত্রীর নিকট পনের মিনিট বসবেন। তাই তো হযরতের পবিত্র অভ্যাস ছিল ঘড়ি দেখে প্রবেশ করতেন এবং ঘড়ি দেখে বের হয়ে আসতেন। পনের মিনিটের স্থানে ষোল মিনিট হবে অথবা চৌদ্দ মিনিট হবে এমনটি অসম্ভব ছিল। বরং ইনসাফের চাহিদা অনুযায়ী পুরো পনের মিনিট উভয়ের নিকট অবস্থান করতেন। এক এক মিনিট মেপে মেপে খরচ করতেন।

দেখুন আল্লাহ তাআলা সময়ের যে নেয়ামত দান করেছেন সেটাকে এভাবে নষ্ট করবেন না। এটা আল্লাহ তাআলা বড় যবরদস্ত দৌলত দান করেছেন। এক একটা মুহূর্ত অত্যন্ত দামী।

জনৈক কবি বড় সুন্দর বলেছেন :

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم + چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بہ دم

জীবন আমার বরফের ন্যায় যাচ্ছে কমে
চুপে চুপে, ধীরে ধীরে, ক্ষণে ক্ষণে।

২৭. এটা বিনয় নয়

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: একবার আমি রেলে সফর করছিলাম। আমার কাছাকাছি কিছু মানুষ বসা ছিলেন। পরস্পরে

কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। আমি ঘুমাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আল্লাহর ঐ বান্দারা পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। যদ্দরূন ঘুম আসছিল না। ফলশ্রুতিতে আমি আমার বার্থ থেকে নেমে নিচে চলে আসি। যখন খানার সময় হল, তখন তারা খানা বের করল আর আমাকে বলতে লাগল: হযরত! তাশরীফ রাখুন। কিছু গু-মুত আপনিও খেয়ে নিন!

এই খানাকে তারা গু-মুত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। আমি বললাম: ভাই এটা তো খানা। এটাকে আপনারা গু-মুত কেন বলছেন? তারা বলল: "বিনয়বশত বলছি। আমাদের খানাকে আমরা বড় মর্যাদা দিলে এটা অহংকার হয়ে যাবে।" আমি বললাম: খানা হল মহান আল্লাহর নেয়ামত। তাঁর রিযক। এটাকে এমন দুর্গন্ধযুক্ত শব্দে ব্যক্ত করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? আল্লাহ তাআলা যাকে যে সৌন্দর্য বা গুণ দান করেছেন সেটা হল মহান আল্লাহর দান। মানুষের উচিত সেই দানের উপর শোকর করা। না কদরী না করা।

২৮. একটি উদাহরণ

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: পূর্বের যুগে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। তারা মালিকের ক্রীতদাস হত। মালিক তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাজারে বিক্রি করতে পারত। মালিক তার সব জিনিসের মালিক হত। নিয়ম ছিল এই যে, মালিক যা নির্দেশ দিত দাসকে তাই করতে হত। যদি মালিক বলত যে আমি সফরে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি দেশ পরিচালনা করবে। তাহলে ঐ দাস দেশ পরিচালনা করত। গভর্ণর হত। কিন্তু দাস তো দাসই। এজন্য এ দাসের মনে এ কথা আসতেই পারে না যে, এই যে ক্ষমতা আমার হাতে এসেছে এটা আমার বাহুবল বা আমার যোগ্যতার পরিণাম। কিছুই না।

তার মনে এই খেয়াল ভালভাবেই থাকে যে, মালিক আসলেই বলবে: হটো, এখন ঐ 'বাইতুল খালা' বা শৌচাগার পরিষ্কার কর। তখন সমস্ত ক্ষমতা শেষ। বুঝা গেল যে, ঐ দাস দেশ পরিচালনা করলেও স্বীয় হাকীকত এর অনুভূতি তার আছে। অর্থাৎ এই অনুভূতি যে, এই রাজত্ব আমার মালিকের দান। বাস্তবে তো আমি দাসই।

২৯. খানা খাওয়ার সময় কথা বলা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: খানা খাওয়ার সময় হাল্কা পাতলা কথা বলা যেতে পারে। বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা খাওয়ার সময়

বলা অনুচিৎ। কেননা খানারও হক আছে। সেই হক হল খানার প্রতি মনোযোগী হয়ে খানা খাবে। এজন্য খাওয়ার সময় এমন কথা বলা যাতে মানুষকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়। যদ্দরুন খানার প্রতি আর মনোযোগ থাকবে না, উচিৎ নয়।

হাস্যরসপূর্ণ হাল্কা পাতলা কথাবার্তা বলতে পারবে। কিন্তু এই যে একটি কথা প্রসিদ্ধ যে, মানুষ খানা খাওয়ার সময় একদম চুপ থাকবে, কোন কথা বলবে না, এটা সঠিক নয়।

৩০. উন্নত পর্যায়ের দাওয়াত

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলতেন: দাওয়াত তিন প্রকারের হয়ে থাকে। একটা হল: সবচেয়ে উন্নত। দ্বিতীয় হল: মধ্যম পর্যায়ের। আর তৃতীয় হল: নিম্ন পর্যায়ের। বর্তমান পরিবেশে সবচেয়ে উন্নত দাওয়াত হল যাকে দাওয়াত করার ইচ্ছা তাকে নগদ হাদিয়া দেয়া। ফলে তাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। অতঃপর নগদ হাদিয়ার ব্যাপারে এখতিয়ার থাকবে চাই খানার কাজে ব্যয় করুক। এতে ঐ ব্যক্তির বেশি শান্তি ও উপকার হবে আর সামান্য কষ্টও হবে না। এজন্য এ দাওয়াত হল সর্বোত্তম দাওয়াত।

দ্বিতীয় নম্বরের দাওয়াত হল: যে ব্যক্তিকে দাওয়াত করতে চাও, খানা পাকিয়ে তার ঘরে পাঠিয়ে দাও। এটা দুই নম্বরে থাকার কারণ হল এখানে খানা খাওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। অবশ্য এই খানার জন্য তাকে কোন কষ্ট করতে হয়নি। আপনি ঘরে ডেকে খানা খাওয়ার কষ্ট দেননি। বরং ঘরেই খানা পৌঁছে দিয়েছেন।

তৃতীয় নম্বরের দাওয়াত হল ঐ ব্যক্তিকে নিজ বাসায় ডেকে খানা খাওয়াবে। বর্তমানে শহুরে পরিবেশে যেখানে সবাই ব্যস্ত। দূরত্বও অনেক বেশি। এখন যদি আপনি কাউকে দাওয়াত দেন যিনি ত্রিশ মাইল দূরে থাকেন তো আপনার দাওয়াত কবুল করার অর্থ হল: তাকে দুই ঘন্টা পূর্বে বাসা থেকে বের হতে হবে। ভাড়া বাবদ পঞ্চাশ টাকা খরচ করে এখানে এসে খানা খেতে হবে।

এর মাধ্যমে আপনি কি তাকে আরাম পৌঁছালেন নাকি আরো কষ্টে ফেললেন? এর পরিবর্তে যদি খানা রান্না করে তার ঘরে পাঠিয়ে দিতেন অথবা তাকে নগদ অর্থ হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দিতেন। তাহলে এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির সাথে অধিক কল্যাণকামিতা হত।

৩১. অন্যের অন্তর খুশী করা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-কে লক্ষ করে এ ঘটনাটি শোনান যে, যখন আমি এই আচকান পরিধান করে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলাম। ঐ সময়ের অবস্থা আর জিজ্ঞেস করনা, আমার অন্তরে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কেননা সারাজীবন এ জাতীয় সৌখিন পোষাক কখনো পরিধান করিনি। কিন্তু অন্তরে ঐ সময় এই নিয়্যত ছিল যে, মহান আল্লাহর যে বান্দী কষ্ট করে এটা সেলাই করেছে তার অন্তর খুশী হয়ে যাক। তো তার দিলকে খুশী করার জন্য নিজের উপর এ বোঝা বরদাশত করে নিয়েছি। আর সেটা পরিধান করার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গঞ্জনাও সহ্য করেছি। কেননা মানুষেরা এর উপর এই বলে মন্তব্য করেছে যে, কেমন লেবাস পরিধান করে এসেছে। কিন্তু আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আমি এ কাজ করেছি। বুঝা গেল যে, নিজের দিলকে খুশী করার জন্য, ঘরের মানুষকে খুশী করার জন্য অথবা হাদিয়া তোহফা প্রদানকারীর মন খুশী করার জন্য কাপড় পরিধান করলে কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু এই নিয়্যতে উত্তম পোষাক পরিধান করা যে লোকজন আমাকে বড় মনে করবে। আমি দুনিয়াদারদের সামনে বড় হয়ে যাব। তাহলে এটা হারাম হবে। এর থেকে বাঁচা জরুরী।

৩২. হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

একটি দারুণ অদ্ভূত ঘটনা মনে পড়ল। ঘটনাটি আমি আমার সম্মানিত পিতার নিকট থেকে শুনেছি। দারুণ শিক্ষণীয় ঘটনা। সেটা হচ্ছে এই যে, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ. এর দুজন স্ত্রী ছিলেন। একজন বড় এবং একজন ছোট। উভয়ের হযরতওয়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বড় পীরানী ছাহেবা পুরানো যুগের মানুষ ছিলেন এবং হযরতওয়ালাকে বেশি বেশি আরাম পৌঁছানোর ফিকির করতেন। ঈদ অত্যাসন্ন ছিল। হযরত পীরানী ছাহেবার দিলে খেয়াল আসল যে, হযরতওয়ালার জন্য উন্নত কাপড়ের আচকান বানানো দরকার। ঐ যমানায় একটা কাপড় চালু ছিল যার নাম ছিল "আঁখ কা নাকশা"। এটা ছিল খুব সৌখীন কাপড়। এখন হযরতওয়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করা ব্যতীতই কাপড় ক্রয় করে সেটার আচকান সেলানো শুরু করে দিয়েছেন। হযরতওয়ালাকে

এটা চিন্তা করে জানাননি যে, আচকান সেলাই করার পর যখন আচমকা হযরতের খেদমতে পেশ করব, তখন হযরত বেশি খুশী হবেন। পুরো রামাযান সেটা সেলাই করায় ব্যস্ত থাকলেন। কেননা ঐ যুগে মেশিনের প্রচলন তো ছিল না। হাতে সেলাই হত। ফলশ্রুতিতে যখন সেটা সেলাই হয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল, তখন ঈদের রাতে ঐ আচকান হযরতওয়ালার খেদমতে পেশ করে বললেন : আমি আপনার জন্য এই আচকান তৈরি করেছি। আমার অন্তরের অভিলাষ হল আপনি এটা পরিধান করে ঈদগাহ যাবেন এবং ঈদের নামায পড়াবেন।

এখন কোথায় হযরতওয়ালার মেযাজ আর কোথায় সৌখীন আচকান। সেটা তো হযরতওয়ালার মেযাজের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিন্তু হযরত বলছেন যে, যদি আমি পরিধান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি তাহলে তার অন্তর ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু তিনি পুরো রামাযান মাস সেটা সেলাই করার পিছনে পরিশ্রম করেছেন এবং মহব্বতের সাথে মেহনত করেছেন। এ জন্য তাঁর মনোতুষ্টির জন্য হযরত বললেন : তুমি তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আচকান বানিয়েছ। অতঃপর হযরত ঐ আচকান পরিধান করলেন এবং ঈদগাহ পৌঁছলেন। নামায পড়ালেন। নামায শেষে এক ব্যক্তি হযরতের কাছে আসলেন এবং বললেন যে, হযরত আপনি যে আচকান পরিধান করেছেন সেটা আপনাকে মানাচ্ছে না। কেননা এটা অত্যন্ত সৌখীন আচকান।

উত্তরে হযরতওয়ালা বললেন : হ্যাঁ ভাই তুমি ঠিক কথাই বলেছ : এ কথা বলে হযরত ঐ আচকান খুলে সেই ব্যক্তিকে হাদিয়া দিয়ে দিলেন।

৩৩. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. নিজ ওয়াযের মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, জনৈক ব্যক্তি খুব ধনী ছিলেন। একবার তিনি স্বীয় স্ত্রীর সাথে বসে খানা খাচ্ছিলেন। খানাও ভাল ছিল। এজন্য খুব আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে খানা খাওয়ার জন্য বসলেন। ইত্যবসরে একজন ভিক্ষুক দরজায় এসে দাঁড়ায়। খাওয়ার সময় ভিক্ষুকের আগমনে গৃহকর্তা বিরক্ত হন। ফলে তিনি ঐ ভিক্ষুককে বকাঝকা দিয়ে অপমান করে বের করে দেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করেন। অনেক সময় মানুষের একটি আমল আল্লাহর গযব ডেকে নিয়ে আসে। ফলশ্রুতিতে কিছু দিন পর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ আরম্ভ হয়। মন কষাকষি হতে থাকে। এমনকি ঘটনা তালাক পর্যন্ত গড়ায়। স্বামী-স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। স্ত্রী নিজ ঘরে এসে ইদ্দত পালন করে। ইদ্দত পালন শেষে অন্য এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়ে যায়। ঐ লোকও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। একদিন এই মহিলা নিজ দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বসে খানা খাচ্ছিল। ইত্যবসরে একজন ভিক্ষুক দরজায় এসে দাঁড়ায়। তখন স্ত্রী-স্বামীকে লক্ষ্য করে বলল: আমার সাথে ইতোপূর্বে একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। আমার আশংকা হয় যে, আল্লাহ পাকের গযব নাযিল হয় কিনা। এজন্য আমি শুরুতেই এই ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে দিচ্ছি। স্বামী বললেন: দিয়ে আস।

যখন ঐ মহিলা ভিক্ষা দিতে গেল তখন দেখল যে, যে ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে হল তার প্রথম স্বামী। ফলে সে হতবাক হয়ে গেল। এবং ফিরে এসে নিজ স্বামীকে বলল যে, আজ আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি। ঐ ভিক্ষুক হল আমার প্রথম স্বামী। যে খুব ধনী মানুষ ছিল। আমি একদিন তার সাথে বসে এভাবেই খানা খাচ্ছিলাম। ইত্যবসরে একজন ভিক্ষুক দরজায় এসে দাঁড়ায়। তখন সে ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। যদ্দরুন আজ তার এ দূরাবস্থা।

দ্বিতীয় স্বামী বললেন: আমি তোমাকে এর চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক কথা বলছি। আর সেটা হল ঐ ভিক্ষুক যে তোমার প্রথম স্বামীর নিকট এসেছিল বাস্তবিক পক্ষে আমিই ছিলাম।

আল্লাহ তাআলা প্রথম স্বামীর ধন-সম্পদ দ্বিতীয় স্বামীকে আর দ্বিতীয় স্বামীর দারিদ্র প্রথম স্বামীকে দিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা এমন দুর্যোগ থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে আশ্রয় কামনা করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সুখময় অবস্থার পর যন্ত্রণাময় অবস্থা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

যে কোন প্রার্থনাকারীকে বকাঝকা দেয়া থেকে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্য কোন কোন সময় এমন পরিস্থিতি সামনে চলে আসে যে, ধমক দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তো ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ এটার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু যথাসাধ্য এটার চেষ্টা করতে হবে যেন বকাঝকার প্রয়োজন না হয়। বরং কিছু দিয়ে বিদায় করে দাও।

৩৪. বুযুর্গানে দ্বীনের বিনয়

যে সব বুযুর্গানে দ্বীনের কথা শুনে এবং পড়ে আমরা দ্বীন শিখি, তাঁদের জীবনী পাঠ করলে বুঝে আসবে যে, তাঁরা নিজেদেরকে এত তুচ্ছ মনে করতেন যার কোন সীমা পরিসীমা নেই।

তাই তো হযরত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর রহ. এই কথাটি আমি আমার অসংখ্য মুরব্বী থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন : "আমার অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে ফিলহাল এবং প্রত্যেক কাফেরকে ফিলমাআল বা ভবিষ্যত বিচারে আমার থেকে শ্রেয় মনে করি। কাফেরকে এ কারণে যে, হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাকেও ঈমানের তাউফীক দান করবেন। আর সে আমার থেকে অগ্রসর হয়ে যাবে।"

একবার হযরত থানভী রহ. এর খাস খলীফা হযরত মাওলানা খাইর মুহাম্মাদ ছাহেব রহ. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ.কে বললেন যে, যখন আমি হযরত থানভী রহ. এর মজলিসে বসি তখন আমার কাছে এমন লাগে যে, যত মানুষ মজলিসে বসা আছে, সবাই আমার থেকে উত্তম। এবং আমিই সবচেয়ে বেশি খারাপ।

একথা শুনে হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. বললেন : আমারও একই অবস্থা হয়। অতঃপর উভয়ে পরামর্শ করলেন যে, আমরা আমাদের শাইখ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর নিকট নিজেদের এই অবস্থার কথা উল্লেখ করব। জানি না এ অবস্থাটি ভাল না মন্দ?

ফলে তারা উভয়ে হযরত থানভী রহ. এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং নিজেদের হালত বয়ান করলেন যে, হযরত! আপনার মজলিসে আমাদের উভয়ের এই অবস্থা হয়।

হযরত থানভী রহ. উত্তরে বললেন যে, চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ তোমরা দুজন তোমাদের যে হালতের কথা জানালে, আমি সত্য বলছি : "যখন আমিও মজলিসে বসি, তখন আমারও একই অবস্থা হয় যে, ঐ মজলিসে সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট আমাকেই মনে হয়। আর অবশিষ্ট সমস্ত শ্রোতা আমার থেকে ভাল মনে হয়।"

এই হল বিনয়ের মর্মমূল। আরে যখন বিনয়ের এই মর্মমূল প্রবল হয়ে যায়, তখন মানুষ নিজেকে জীব-জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করতে থাকে।

৩৫. হযরত থানভী রহ. এর ঘোষণা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: "কেউ আমার পেছনে পেছনে চলবে না। আমার সাথে চলবে না। আমি কোথাও একাকী যেতে চাইলে আমাকে একাকী যেতে দিবে। এভাবে নেতা নেতা ভাব নিয়ে চলা যে, ডানে দুজন বামে দুজন চলবে। আমি এটাকে একদম পছন্দ করি না। যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ চলে সেভাবেই চলা উচিত। আমি আমার হাতে কোন সামানা নিয়ে চলতে থাকলে কেউ যেন আমার সামানা না নেয়। আমাকে ঐভাবেই যেতে দিন।"

এসবের উদ্দেশ্য এটাই যাতে মানুষের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য না থাকে। যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ থাকে সেভাবেই যেন থাকে।

৩৬. হযরত থানভী রহ. এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর নিকট অনেক মানুষ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করত যে, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি হযরত থানভী রহ. সাধারণত উত্তরে এ কবিতাটি পাঠ করতেন :

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم + من غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

অর্থাৎ, আমি রাতও না, রাতের পূজারীও না যে, স্বপ্নের কথা বলব। বরং আমি তো হলাম সূর্যের (দিনের বেলা) গোলাম। এ জন্য শুধু এর কথাই বলি।

যাইহোক, স্বপ্ন যত ভালোই হোক এর উপর মহান আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। এগুলো হল مُبَشِّرَاتُ বা সুসংবাদের বার্তাবাহক। হতে পারে কোন সময় আল্লাহ তাআলা এর বরকত দান করবেন। কিন্তু শুধুমাত্র স্বপ্নের কারণে বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের ফয়সালা করা উচিত নয়।

৩৭. তাসাওউফের সার নির্যাস হল দুটি কথা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: ঐ সামান্য কথা যা তাসাওউফের সারনির্যাস সেটা হল (১) যখন কোন নেক কাজ করতে অলসতা লাগে, তখন অলসতা পরিত্যাগ করে ঐ নেক কাজটা করবে। (২) আর যখন গুনাহের চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হবে, তখন সেই চাহিদার বিরোধিতা করে ঐ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। এ দুটো জিনিস যদি অর্জিত হয় তাহলে

আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এর দ্বারাই মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, দৃঢ় হয় এবং এর দ্বারাই মানুষ উন্নতি করে।

যাই হোক। অলসতা দূর করার উপায় স্রেফ এটাই যে, হিম্মত করে সেটার মোকাবেলা করতে হবে। লোকেরা মনে করে যে শাইখ কোন ব্যবস্থাপত্র ঘুলিয়ে পান করিয়ে দিবে। তাহলেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। এবং সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে! মনে রাখবেন অলসতার মোকাবেলা হিম্মতের দ্বারাই হয়। এর অন্য কোন চিকিৎসা নেই।

৩৮. জীবনের এ মুহূর্তগুলো কোন্ কাজের জন্য?

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এবং ডাক্তারগণ তাঁকে সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। একদিন তিনি বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ চোখ খুললেন এবং বললেন: "মৌলভী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব কোথায়? তাঁকে ডাকো।"

"মৌলভী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব" দ্বারা উদ্দেশ্য আমার সম্মানিত পিতা। হযরতওয়ালা থানভী রহ. আমার আব্বাকে "আহকামুল কুরআন" আরবী ভাষায় রচনার কাজে লাগিয়ে রেখেছিলেন। ফলে আব্বা আসার পরে হযরতওয়ালা তাঁকে বললেন আপনি "আহকামুল কুরআন" লিখছেন। আমার এইমাত্র খেয়াল হল যে, অমুক আয়াত দ্বারা অমুক মাসআলা বের হয়, এই মাসআলা আমি ইতোপূর্বে কোথাও দেখিনি। ঐ আয়াতে পৌঁছলে আপনি ঐ মাসআলাটিও লিখে দিবেন। এ কথা বলে পুনরায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন।

এখন দেখুন! একজন মানুষ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। কিন্তু তাঁর মন ও মস্তিষ্কে কুরআনে কারীমের আয়াত ও সেটার তাফসীর ঘুরপাক খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুললেন এবং বললেন যে অমুক ছাহেবকে ডাকো। উনি আসার পর তাঁর সাথে সম্পৃক্ত কিছু কাজের কথা বললেন। বারবার এমন করতে থাকলে হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হযরতের খানকার নাযেম মাওলানা শিব্বীর আলী ছাহেব রহ. বললেন: হযরত! ডাক্তার ও হেকীমগণ তো আপনাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন অথচ আপনি বারবার লোকদেরকে ডেকে ডেকে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাদের জানের উপর তো রহম করুন।

প্রতিউত্তরে হযরতওয়ালা থানভী রহ. বললেন: “কথা তো তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি ভাবছি জীবনের ঐ মুহূর্তগুলো কোন্ কাজের জন্য যা কারো খেদমতে ব্যয়িত হল না? যদি এই যিন্দেগী কারো খেদমতে ব্যয় হয় তাহলে এটা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত।”

৩৯. ঐ কথা তোমার হয়ে গেছে, সময় মত মনে এসে যাবে

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. একদিন হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর নিকট আরয করলেন হযরত! আমার মনে চায় আপনার মালফূযাত লিখে ফেলব। কিন্তু আমি মজলিসে দ্রুত লিখতে পারি না। আর আপনার কথাগুলো আমি মনেও রাখতে পারি না। ভুলে যাই।

উত্তরে হযরতওয়ালা থানভী রহ. বলেন: “লেখার প্রয়োজন কী? তুমি নিজেই কেন ছাহেবে মালফূয হয়ে যাচ্ছ না?”

আমার আব্বাজান মরহুম বলেন: আমি তো বিস্ময়ে থ হয়ে যাই। আমি আবার কিভাবে ‘ছাহেবে মালফূয’ বা বাণীওয়ালা ব্যক্তিত্ব হব? অতঃপর হযরতওয়ালা থানভী রহ. বলেন: আসল ব্যাপার হল, যদি কথা হক হয় বুঝ সহীহ হয় আর ফিকির পরিশুদ্ধ হয় আর এ জাতীয় কথা তোমার কানে পড়ে আর তোমার দিল সেটাকে কবূল করে তাহলে সেই কথাটা তোমার হয়ে গেছে। এখন ঐ কথাটা হুবহু ঐ শব্দে স্মরণ থাক বা না থাক, যখন সময় হবে ইনশাআল্লাহ মনে এসে যাবে এবং সেটার উপর আমলের তাউফীক হাসিল হবে।

বুযুর্গানে দ্বীনের খেদমতে যাওয়া এবং তাঁদের কথাবার্তা শোনার এটাই হল ফায়েদা। তাঁরা কলবের মধ্যে কথা ঢালতে থাকেন। এমনকি সেই কথাগুলো মানুষের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর সময় মত মনে পড়ে যায়।

৪০. রাস্তায় চলার সময় নজর নিচু রাখুন

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: যখন মহান আল্লাহ শয়তানকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করলেন। তখন যেতে যেতে সে এই বলে দু‘আ করেছিল হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিন। আল্লাহ পাক তাকে সুযোগ দিয়েছেন। তখন সে অহংকারের সাথে বলেছিল:

لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآئِلِهِمْ

অর্থাৎ “আমি অবশ্যই অবশ্যই বনী আদমের সামনে দিয়ে পেছন দিয়ে ডান দিক দিয়ে ও বাম দিয়ে আসব।” (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭)

শয়তান চতুর্দিক দিয়ে হামলার কথা বলেছে। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে। কিন্তু দুই দিকের কথা বলেনি। উপর আর নিচ। এজন্য উপরের দিকও সংরক্ষিত। আর নিচের দিকও সংরক্ষিত। এখন দৃষ্টি উচুঁ করে হাঁটলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার আশংকা। তাই একটা পথই এখন উন্মুক্ত আছে। আর তা হল দৃষ্টি নত করে চলা। তাহলেই ইনশাআল্লাহ শয়তানের চতুর্মুখী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এজন্য অকারণে ডানে বামে তাকাবেন না। ব্যস আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটবেন। তবেই দেখবেন মহান আল্লাহ কিভাবে আপনার হেফাযত করেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

“আপনি ঈমানদার পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।” (সূরা নূর, আয়াত : ৩০)

৪১. শয়তান বড় আরেফ ছিল

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: “ইবলীস” আল্লাহ পাকের ব্যাপারে অনেক বড় আরেফ ছিল। কেননা একদিকে তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। তার উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হচ্ছে। কিন্তু এই গযব নাযিল হওয়ার মুহূর্তেও সে মহান আল্লাহর নিকট থেকে অবকাশ চেয়ে নিল। কেননা সে জানত যে, মহান আল্লাহ গোস্বার কাছে পরাস্ত হন না। বরং গোস্বার হালতেও যদি তার নিকট কিছু চাওয়া হয়, তবুও তিনি দিয়ে দেন। ফলশ্রুতিতে শয়তান অবকাশ চেয়ে নিল।

৪২. চাকরকে কেমন খানা দেয়া উচিত?

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: মনে করুন কেউ একজন একটি চাকর রাখল। এবং তার সাথে এই চুক্তি হল যে, তোমাকে মাসে এত টাকা বেতন দেয়া হবে আর দৈনিক দুবার খানা দেয়া হবে। কিন্তু যখন খানার সময় আসল তখন দেখা গেল যে, নিজে তো খুব পোলাও জর্দা

উড়াল, উন্নত মানের খানা খেল, আর বেঁচে যাওয়া খানা যাকে একজন ভদ্র ও অভিজাত মানুষ পছন্দ করে না সেটা চাকরকে দিয়ে দিল। তো এটাও কুরআনে পাকে নিষিদ্ধ تَطْفِيْف বা অন্যকে ঠকানোর অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট খানা চাকরকে দেয়া তার হক নষ্ট করা ও বেইনসাফী কাজ।

৪৩. হযরত থানভী রহ.-এর বাকপটুতা

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.কে আল্লাহ তাআলা এমন বাকপটুতা দান করেছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য আসত, তাহলে তিনি মাত্র কয়েক মিনিটে তাকে লা জবাব করে দিতে পারতেন।

বরং আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একবার হযরত অসুস্থ ছিলেন এবং বিছানায় শোয়া ছিলেন। তখন তিনি বললেন যে, "আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর ভরসা করে এ কথা বলছি। যদি সারা দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী মানুষ একত্রিত হয়ে এসে পড়ে এবং ইসলামের সাধারণ কোন মাসআলার ব্যাপারেও কোন আপত্তি উঠায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ এই অধম মাত্র দুই মিনিটে তাকে লা জবাব করতে পারবে"।

অতঃপর বললেন যে, আমি তো সামান্য একজন তালিবে ইলম। উলামায়ে কিরামের মর্যাদা তো অনেক বেশি।

আর বাস্তবতাও এটাই ছিল যে, হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.এর সামনে যে কেউ কোন বিষয়ে কথা বললে কয়েক মিনিটের চেয়ে বেশি চলত না।

৪৪. বিতর্কের দ্বারা সাধারণত উপকার হয় না

স্বয়ং হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: যখন আমি দারুল উলূম দেওবন্দ হতে দরসে নিযামী সমাপ্ত করলাম, তখন আমার বাতিল ফিরকাগুলোর সাথে 'মুনাযারা' তথা বিতর্ক করার খুব শখ ছিল। তাইতো কখনো শিয়াদের সাথে, কখনো গাইরে মুকাল্লিদদের সাথে, কখনো বেরেলভীদের সাথে, কখনো হিন্দুদের সাথে, তো কখনো শিখদের সাথে মুনাযারা হচ্ছে। যেহেতু নতুন নতুন ফারেগ হয়েছি। এজন্য শখ আর জোশে এ মুনাযারা করছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমি মুনাযারা হতে তাওবা করি।

কেননা বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা ফায়েদা হয় না। বরং নিজ বাতেনী বা আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর এর প্রভাব পড়ে। এজন্য আমি এটা ছেড়ে দিয়েছি।

৪৫. এটা তো দুশমনী (শত্রুতা)

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর একটি ওয়ায আছে। যেটা তিনি রেঙ্গুনে (বার্মার সূরতী মসজিদে) করেছিলেন। ঐ ওয়াযে এটা লিখেছেন যে, যখন হযরত থানভী রহ. ওয়ায থেকে ফারেগ হলেন, তখন মুসাফাহার জন্য এমন চাপ পড়ল যে, হযরতওয়ালা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। এটা প্রকৃত মহব্বত নয়। এটা মহব্বতের আকৃতি মাত্র। কেননা মহব্বতের জন্যও বিবেক থাকা চাই। যাঁকে মহব্বত করি তাঁর সাথে সহমর্মিতামূলক আচরণ করা চাই। এবং তাঁকে দুঃখ ও কষ্ট থেকে বাঁচানো উচিত। এটা হল প্রকৃত মহব্বত।

৪৬. আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অদ্ভূত ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করত বলেন: এক ব্যক্তি নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। পরবর্তীতে তার তাওবার চিন্তা শুরু হয়। সে চিন্তা করে যে, এখন আমি কী করব? ফলে সে খ্রীষ্টান পাদ্রীর নিকট গেল। এবং তাকে জানাল যে, আমি এভাবে নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছি। আমার জন্য কি তাওবা ও নাজাতের কোন উপায় আছে? পাদ্রী বলল: তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ। এখন তোমার ধ্বংস অবধারিত। এই উত্তর শুনে ঐ ব্যক্তি হতাশ হয়ে গেল। সে চিন্তা করল যে, নিরানব্বইজনকে তো হত্যা করেছি, এখন বাকী আছে একজন। ফলে ঐ পাদ্রীকেও সে হত্যা করল। এবং একশর সংখ্যা পূরণ করে দিল।

কিন্তু অন্তরে যেহেতু তাওবার ফিকির লেগেই ছিল। এজন্য পুনরায় কোন আল্লাহওয়ালার সন্ধানে বের হয়ে পড়ল। তালাশ করতে করতে একজন আল্লাহওয়ালার সন্ধান সে পেল। সে ঐ বুযুর্গের খেদমতে গিয়ে নিজ পুরো বৃত্তান্ত জানাল। বুযুর্গ বললেন: এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এখন প্রথমে তুমি তাওবা কর। অতঃপর এই বস্তি ছেড়ে ঐ বস্তিতে চলে যাও। কারণ সেটা হল নেককারদের বস্তি। তাঁদের সাহচর্য অবলম্বন কর। যেহেতু সে তাওবা করার ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিল, ফলে সে ঐ বস্তির দিকে রওয়ানা হল। রাস্তার মধ্যেই তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল।

বর্ণনায় এসেছে যে, যখন সে মৃত্যুর মুখোমুখি তখন ঐ অবস্থাতেও বুকের ওপর ভর দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিজেকে ঐ বস্তির নিকটবর্তী করতে লাগল, যে বস্তির দিকে সে যাচ্ছিল। অবশেষে তার প্রাণ বের হয়ে গেল। এখন এর রূহ নেয়ার জন্য রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা উভয় প্রকার ফেরেশতা পৌঁছে গেলেন, এবং তাদের মধ্যে পরস্পরে মতভেদ হল। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেন: যেহেতু এ লোকটি তাওবা করে আল্লাহ ওয়ালাদের বস্তির দিকে যাচ্ছিল এজন্য এর রূহ আমরা নিয়ে যাবো। আর আযাবের ফেরেশতাগণ বলতে লাগলেন: এ লোকটি একশত মানুষকে হত্যা করেছে। আর এখনো তাকে মাফ করা হয়নি। অতএব এর রূহকে আমরা নিয়ে যাব।

অবশেষে আল্লাহ পাক এ ফয়সালা দিলেন যে, এটা দেখা হোক সে কোন্ বস্তির বেশি নিকটবর্তী ছিল? যে বস্তি ছেড়ে রওয়ানা হয়েছিল ঐ বস্তির বেশি নিকটবর্তী? নাকি যে বস্তির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল ঐ বস্তির বেশি নিকটবর্তী? ফলশ্রুতিতে রহমতের ফেরেশতাগণ তার রূহ নিয়ে গেলেন। এ প্রচেষ্টার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিলেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, হত্যাকারী ব্যক্তির তাওবা অধ্যায়, হাদীস নম্বর ২৭৬৬)

হযরত থানভী রহ. বলেন: যদিও তার যিম্মায় 'হুকূকুল ইবাদ' বা বান্দার হকসমূহ ছিল, কিন্তু যেহেতু নিজের পক্ষ থেকে উদ্যোগী হয়ে প্রচেষ্টা আরম্ভ করে দিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে যদি কোন মানুষের যিম্মায় বান্দার হক থাকে এবং সে ঐ হক আদায়ের চেষ্টা আরম্ভ করে দেয় এবং সেটার ফিকিরে লেগে যায় আর মাঝখানে মৃত্যু এসে পড়ে, তাহলে আল্লাহ পাকের রহমত এর ব্যাপারে আশা এটাই যে, তিনি হকওয়ালাদেরকে কেয়ামাতের দিন খুশী করে দিবেন।

যাইহোক, এ ব্যক্তি দু'ধরনের তাওবা করেছিল। একটি হল সংক্ষিপ্ত তাওবা। আর আরেকটি হল বিস্তারিত তাওবা। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এর তাউফীক দান করুন। আমীন।

৪৭. সীমাতিরিক্ত ভক্তির ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: একবার এক বুযুর্গ কোন এলাকায় চলে গেলেন। সেখানের লোকজনের ঐ বুযুর্গের প্রতি এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি হল যে, তারা এই সিদ্ধান্ত নিল যে, এই বুযুর্গকে আমরা

আমাদের এলাকার বাইরে যেতে দিব না। তাঁকে এখানেই রেখে দিব। যাতে তাঁর বরকত হাসিল হয়। আর সেটার পন্থা এমনটিই বুঝে আসছে যে, ঐ বুযুর্গকে হত্যা করে এখানে দাফন করে দেয়া হোক, যাতে তার এ বরকত এই এলাকার বাইরে বের হয়ে না যায়!

মহব্বতের জোশে নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কাজের সাথে দ্বীনে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। মহব্বত তো ঐ জিনিস যার দ্বারা মাহবূব বা প্রেমাস্পদের আরাম হয়। এমনিভাবে মুসাফাহার সময় এটা বিবেচনা করে মুসাফাহা করা উচিত যে, এ সময় মুসাফাহা করা সমীচীন কিনা? এদিকে লক্ষ রাখা চাই। যদি উভয় হাত ব্যস্ত থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় আরাম ও শান্তির নিয়্যতে মুসাফাহা না করলেই সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

৪৮. ঝগড়া কিভাবে খতম হবে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, পরস্পরের ঝগড়া কিভাবে খতম হবে? হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর একটি বাণী আমি আপনাদেরকে শুনাচ্ছি। যা একটি সোনালী নীতিমালা। যদি মানুষ এই মূলনীতির উপর আমল করে, তাহলে পঁচাত্তর শতাংশ ঝগড়া তো ওখানেই শেষ হয়ে যায়। তো হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. বলেন: "একটি কাজ এই করো যে, দুনিয়াদারদের নিকট আশা করা ছেড়ে দাও। যখন আশা ছেড়ে দিবে তখন ইনশাআল্লাহ আর দিলের মধ্যে কখনো হিংসা ও ঝগড়ার খেয়ালও আসবে না।"

মানুষেরা সাধারণত যেসব অভিযোগ করে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে সম্মান করল না। অমুক এটা করল না। অমুক ঐটা করল না। অথবা অমুকের উপর আমি অমুক অনুগ্রহ করেছিলাম। অথচ সে সেটার প্রতিদান দিল না। ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার কারণ এটাই যে, অন্যের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করে। এখন যখন ঐ আশা পুরা হয় না, তখন এর পরিণতিতে অন্তরে চোট্ অনুভূত হয় যে, অমুক আমার সাথে সদ্ব্যবহার করেনি।

এ জাতীয় ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ হল: "যদি কারো ব্যাপারে কোন অভিযোগ পয়দা হয়ে যায়, তবে তাকে গিয়ে বল যে, তোমার ব্যাপারে আমার অন্তরে এই অভিযোগ আছে। তোমার ঐ কথাটা আমার পছন্দ হয়নি। ভাল লাগেনি। এটা বলে দিল সাফ করে নাও।"

কিন্তু বর্তমানে কথা বলে দিল সাফ করার রীতি খতম হয়ে গেছে। বরং বর্তমানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে, সে ঐ কথা এবং অভিযোগ অন্তরে নিয়ে বসে থাকে। পরবর্তীতে হয়ত অন্য আরেকটি ব্যাপার সামনে আসল। এভাবে ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এটাই হিংসার আকৃতি ধারণ করে। আর হিংসার পরিণতিতে পরস্পরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

৪৯. আশা রাখবেন না

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: ঝগড়ার বুনিয়াদ এভাবে কেটে দাও যে, কারো নিকট কোন কিছুর আশাই করবে না। মাখলূকের কাছে আশা করে কী লাভ যে, অমুক আমাকে এটা দিবে, অমুক আমার এই কাজ করে দিবে। আশা রাখ একমাত্র খালিক ও মালিক মহান আল্লাহর নিকট। বরং দুনিয়াদারদের কাছ থেকে খারাবীর আশা রাখ যে, তাদের কাছ থেকে তো খারাবীই মিলবে। অতঃপর খারাবীর আশা করার পর যদি কখনো ভাল কিছু পাওয়া যায় তাহলে ঐ সময় আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় কর যে, ইয়া আল্লাহ! আপনার শোকর ও ইহসান। আর যদি খারাপ ব্যবহার মিলে, তাহলে মনে করবে যে, আমার তো প্রথমেই খারাবীর আশংকা ছিল। ফলশ্রুতিতে দিলের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে না। ঝগড়াও হবে না। এজন্য কারো কাছে আশাই রাখবে না।

৫০. প্রতিশোধ গ্রহণের নিয়্যত করবে না

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: আরেকটি মূলনীতি এই বয়ান করেছেন যে, যখন তুমি অন্য কারো সাথে কোন ভাল আচরণ কর বা ভাল ব্যবহার কর, তো স্রেফ আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য যেন তোমার না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ: তুমি কারো সাহায্য করলে বা কারো জন্য সুপারিশ করলে বা কারো সাথে সদ্ব্যবহার করলে কিংবা সম্মান করলে, তাহলে এটা চিন্তা করে করবে যে, আমি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ আচরণ করছি। আমার আখেরাত সাজানোর জন্য এ কাজ করছি। যখন এ নিয়্যতে তুমি ঐ কাজটি করবে, তখন স্বাভাবিক কথা যে, তোমার মধ্যে এ আচরণের দ্বারা কোন কিছু পাওয়ার আশা থাকবে না।

এখন মনে করুন আপনি একজনের সাথে ভাল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সে আপনার ভাল আচরণের বদলা ভাল আচরণ দ্বারা দিল না। আর

আপনি যে তার উপর অনুগ্রহ করেছেন সেটা সে স্বীকার করতেই রাযী নয়। তাহলে এমতাবস্থায় বলাই বাহুল্য যে, আপনার অন্তরে অবশ্যই এই খেয়াল আসবে যে, আমি তো তার সাথে এ আচরণ করেছিলাম অথচ সে আমার সাথে উল্টো আচরণ করল। এখন যদি ঐ ব্যক্তির সাথে সদ্ব্যবহার আপনি একমাত্র মহান আল্লাহকে রাযী খুশী করার জন্য করে থাকেন, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে মন্দ ব্যবহার সত্ত্বেও আপনার মনে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হবে না। কেননা আপনার উদ্দেশ্য তো ছিল শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা।

এ দুটি মূলনীতির ওপর যদি আমরা আমল করি তাহলে আমাদের পরস্পরের সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ খতম হয়ে যাবে। এবং এর মাধ্যমে ঐ হাদীসের উপরও আমল হবে, যে হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি হকের উপর থেকে ঝগড়া ছেড়ে দিবে, আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মাঝে ঘর দেয়ানোর যিম্মাদার।"

৫১. হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর সীমাহীন বিনয়

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: আমি প্রত্যেক মুসলমানকে ফিলহাল আমার থেকে উত্তম মনে করি। এবং প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিক দিয়ে আমার থেকে উত্তম মনে করি। অর্থাৎ যে মুসলমান, চাই তার ঈমান যত নিম্ন পর্যায়েরই হোক না কেন, সেই মুসলমান আমার চেয়ে বেশি অগ্রসর। এজন্য আমি প্রত্যেক মুসলমানকে উত্তম মনে করি।

আর প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিচারে উত্তম মনে করি। কেননা যদিও এ মুহূর্তে বাহ্যত: সে কাফির। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে মহান আল্লাহ তাকে ঈমান আনয়নের তাউফীক দান করবেন। আর সে ঈমানের দিক দিয়ে আমার চেয়ে আগে বেড়ে যাবে।

হযরতওয়ালা থানভী রহ. যদি এ কথা বলেন, তাহলে আমাদের কী অবস্থা?

৫২. নেকীর খেয়াল আল্লাহর মেহমান

আমার শাইখ হযরত মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. (আল্লাহ তাআলা তাঁর মাগফিরাত নসীব করুন। আমীন) বলতেন : অন্তরে নেক কাজের যে

খেয়াল আসে। এটাকে সূফীয়ায়ে কিরাম এর পরিভাষায় "ওয়ারিদ" (আগন্তুক) বলা হয়।

হযরত বলতেন : এই "ওয়ারিদ" আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা আল্লাহর মেহমান হয়ে থাকে। যদি তুমি এ মেহমান এর খাতির যত্ন কর এভাবে যে, যে নেকীর খেয়াল এসেছিল ঐ নেক কাজটি করে ফেললে। তাহলে এই মেহমান তার মূল্যায়ন এর কারণে দ্বিতীয়বারও আসবে। আজকে একটি নেক কাজ করবে তো কালকে আরেকটি নেক কাজ করবে। এভাবে সে তোমার নেকী বৃদ্ধি করতে থাকবে। কিন্তু যদি তুমি এ মেহমানের খাতির যত্ন না কর বরং তাকে উপেক্ষা কর অর্থাৎ যে নেক কাজ করার খেয়াল তোমার অন্তরে এসেছিল সেটা না কর, তাহলে ধীরে ধীরে এ মেহমান আসা বন্ধ করে দিবে। ফলে নেক কাজের ইচ্ছাই পরবর্তীতে অন্তরে সৃষ্টি হবে না। নেকীর খেয়ালও আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ○

"বদ আমলীর কারণে তাদের অন্তরে জং পড়ে গেছে"।

(সূরা মুতাফফিফীন : ১৪)

এ জন্য এ সব ছোট ছোট নেকীর ব্যাপারে অবহেলা করা ঠিক নয়। কেননা এগুলো বড় নেকী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

৫৩. আত্মশুদ্ধির সারকথা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: ঐ সামান্য কথা যেটা আত্মশুদ্ধির সারমর্ম এই যে, যখন অন্তরে কোন নেককাজ করার ক্ষেত্রে অলসতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ: নামাযের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু নামাযে যেতে অলসতা লাগছে, তাহলে ঐ অলসতার মোকাবেলা করে সেই নেককাজটা করতে হবে। ব্যস এর দ্বারাই আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর দ্বারাই আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মধ্যে উন্নতি হয়। যে ব্যক্তির এ জিনিস হাসিল হয়ে যাবে। তার আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই।

৫৪. হযরত থানভী রহ. এর একটি সুন্নাতের উপর আমল

একবার হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. থানাভবন থেকে একটু দূরে একটি গ্রামে দাওয়াত উপলক্ষে যাচ্ছিলেন। হযরতের স্ত্রীও হযরতের সঙ্গে ছিলেন। মাঠের মধ্যে পদব্রজে সফর ছিল। অন্য কেউ সাথে

ছিল না। যখন মাঠের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন খেয়াল আসল যে, আলহামদুলিল্লাহ হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক সুন্নাতের উপর আমল করার তাউফীক হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতার সুন্নাতের উপর এখনো পর্যন্ত আমল করার সুযোগ হয়ে উঠেনি। আজ যখন সুযোগ এসেছে, তাহলে এই সুন্নাতের উপরও আমল হয়ে যাক। ফলশ্রুতিতে তখনই তিনি দৌড় দিয়ে এই সুন্নাতের উপরও আমল করে নিয়েছেন।

জানা কথাই যে, দৌড় দেয়ার কোন শখ হযরতওয়ালার ছিল না, কিন্তু প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য এ দৌড় দিয়েছেন। সুন্নাত অনুসরণের আগ্রহ, নেক কাজের আগ্রহ, সাওয়াব অর্জনের আগ্রহ এগুলোই ছিল হযরতওয়ালার ঐ দৌড়ের মূল উপলক্ষসমূহ।

৫৫. একটি উদাহরণ

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: এক ব্যক্তি আপনার প্রিয় মানুষ। তাকে আপনি খুব মহব্বত করেন। ঐ প্রিয় ব্যক্তি দূরে থাকার কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপনার সাথে সাক্ষাত হয়নি। হঠাৎ করে ঐ প্রিয় ব্যক্তি আপনার কাছে আসে। এবং চুপে চুপে এসে আপনাকে পেছন থেকে জোরে জাপটে ধরে। এবং এত জোরে জাপটে ধরে যে, পাজরের হাড্ডিসমূহ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। আপনার কষ্ট হয়। যদ্দরুন আপনি চিৎকার করেন। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কে? উত্তরে সে বলে যে, আমি তোমার অমুক প্রেমাস্পদ। আমার এই দাবানো যদি তোমার পছন্দ না হয়। তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আর তোমার পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে দাবাচ্ছি।

যদি আপনি সত্যিকার প্রেমিক হয়ে থাকেন, তাহলে এটাই উত্তর দিবেন যে, আমার বন্ধুকে দাবিয়ো না। বরং আমাকেই দাবাও এবং জোরে দাবাও। আর এ কবিতা পাঠ করবেন :

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت تیغت

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

অর্থাৎ তোমার তরবারীর আঘাতে শত্রুর যেন ধ্বংসের সৌভাগ্য না হয়। বন্ধুদের মাথা নিরাপদই আছে। যেহেতু আপনি ঐ মাথায় খঞ্জরের পরীক্ষা চালিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে এ অনুভূতি দান করুন যে, এইসব কষ্টও আল্লাহ তাআলার একেকটি রহমত। কিন্তু আমরা যেহেতু দুর্বল, তাই আমরা ঐসব কষ্ট কামনা করব না। কিন্তু কষ্ট যদি এসেই পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে মহান আল্লাহর হেকমত আছে। এবং এটা তাঁর ফয়সালা অনুসারেই এসেছে। এজন্য তোমার জন্য এটা কল্যাণকর।

৫৬. শাস্তি উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: এমন শাস্তি নির্ধারণ কর, যাতে নফসের কিছুটা কষ্টও হয়। এত বেশি যেন না হয় যে, নফস বিগড়ে যায়। আবার এত কমও যেন না হয় যে, এর দ্বারা নফসের কোন কষ্টও হয় না। যেমন হিন্দুস্তানে যখন স্যার সৈয়দ মরহুম আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি ছাত্রদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে মসজিদে আদায় করা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছিলেন। আর এ ঘোষণাও করেছিলেন যে, যে ছাত্র নামাযে উপস্থিত হবে না, তার থেকে জরিমানা আদায় করতে হবে। এবং এক নামাযের জরিমানা সম্ভবত: এক আনা নির্ধারিত করেছিলেন।

এর পরিণাম হয়েছিল এই যে, যে সব ছাত্র সম্পদশালী ছিল, তারা পুরো মাসের সমস্ত নামাযের জরিমানা একত্রে মাসের শুরুতেই জমা করে দিত যে, এই জরিমানা আমাদের থেকে আদায় করে নিন। আর নামাযকে ছুটি দিয়ে দিত। এজন্য জরিমানা যেন এত কম আর মামুলী না হয়ে যায় যে, মানুষ সহজেই জমা করতে পারে। আবার এত বেশিও যেন না হয় যে, মানুষ পলায়ন করে। বরং মধ্যম পর্যায়ের এবং ভারসাম্যপূর্ণ জরিমানা নির্ধারণ করা উচিত।

উদাহরণ স্বরূপ: আট রাকাআত নফল নামায পড়ার শাস্তি নির্ধারণ করা একটি উপযুক্ত শাস্তি।

৫৭. কারণের ব্যাপারে প্রশ্নের চমৎকার উত্তর

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর নিকট আসল এবং শরীয়ত এর কোন মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল যে, আল্লাহ তাআলা অমুক জিনিসকে হারাম করেছেন কেন? এর কারণ কী? হেকমত বা গুঢ়তত্ত্ব

কী? হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: একটি কথার আপনি উত্তর দিন। তাহলে আমিও আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। উনি জিজ্ঞেস করলেন সেটা কী? হযরত বললেন: আপনার নাক সামনে লাগানো কেন? পেছনে লাগানো নয় কেন?

উদ্দেশ্য হল এই যে, মহান আল্লাহ আপন হেকমত ও প্রজ্ঞার দ্বারা জগত নামক এ কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন। তুমি কি মনে করেছ তোমার এই ছোট্ট মস্তিষ্ক যা তোমার মাথার মধ্যে আছে, এর সমস্ত হেকমত ও রহস্য উদঘাটন করে ফেলবে? অথচ বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও এই ছোট্ট মস্তিষ্কেরও পূর্ণ গবেষণা শেষ করতে পারেনি। বরং বিজ্ঞান বলছে যে, এ মস্তিষ্কের অধিকাংশ এমন, যার ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত এটা জানা যায়নি যে, এর আমল কি? এমন মস্তিষ্কের মাধ্যমে তুমি চাচ্ছ মহান আল্লাহর সমস্ত হেকমতের ভেদ তত্ত্ব উদঘাটন করে ফেলবে যে, আল্লাহ পাক অমুক জিনিসকে হারাম করেছেন কেন? এবং অমুক জিনিসকে হালাল করেছেন কেন?

আসল কথা হল নিজ হাকীকতের ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং অন্তরে মহান আল্লাহর বড়ত্বের কমতির কারণে এ জাতীয় প্রশ্ন মনের মধ্যে আসে।

৫৮. হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর একটি ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) এর একটি ঘটনা লিখেছেন: হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) দৈনিক তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জাগ্রত হতেন। একদিন তাঁর চোখ লেগে গেল এবং তাহাজ্জুদ কাযা হয়ে গেল। সারাদিন কাঁদতে কাঁদতে পার হল। এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করলেন: ইয়া আল্লাহ! আজ আমার তাহাজ্জুদ ছুটে গেছে। পরের রাতে যখন ঘুমালেন, তখন তাহাজ্জুদের সময় এক ব্যক্তি আসল এবং তাঁকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করল। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) জাগ্রত হওয়ার পর দেখলেন যে, জাগ্রতকারী ব্যক্তি অপরিচিত মানুষ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? সে বলল: আমি ইবলীস। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন: যদি তুমি ইবলীসই হয়ে থাক, তাহলে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠানোর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? শয়তান বলল: ব্যস আপনি উঠে পড়ুন এবং তাহাজ্জুদ পড়ুন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন: তুমি তো তাহাজ্জুদ হতে বাধাপ্রদানকারী। তুমি উঠানেওয়ালা কিভাবে হলে? তখন শয়তান বলল:

আসল ব্যাপার হল, গতরাতে তাহাজ্জুদের সময় আমি আপনাকে ঘুমের মধ্যে রেখেছি এবং আপনার তাহাজ্জুদ ছুটিয়ে দিয়েছি। যদ্দরুন সারাদিন আপনি তাহাজ্জুদ ছুটার উপর অনুশোচনা করে ক্রন্দন করলেন এবং ইস্তিগফার করলেন। ফলশ্রুতিতে আপনার মর্যাদা এত বেশি হয়ে গেছে যে, তাহাজ্জুদ পড়লেও এত বেশি হত না। এর চেয়ে ভাল তো এটাই ছিল যে, আপনি তাহাজ্জুদ নামাযই পড়ে নিতেন। এজন্য আজকে আমি নিজেই আপনাকে তাহাজ্জুদ থেকে উঠানোর জন্য এসেছি। যাতে আপনার মর্যাদা বেশি উঁচু হয়ে না যায়।

৫৯. মৃত্যু এবং আখেরাতের ধ্যান করার পদ্ধতি

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: দিনের মধ্যে কোন একটা সময় নির্জনতার জন্য বের করুন। এরপর ঐ সময় এ কথার একটু ধ্যান করবেন যে, আমার শেষ সময় এসে গেছে। ফেরেশতা রূহ কবয করার জন্য এসে গেছেন। মালাকুত মাউত বা মৃত্যুর ফেরেশতা আমার রূহ কবয করে ফেলেছেন। আমার আত্মীয়-স্বজনরা আমার গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশেষে আমাকে গোসল দিয়ে কাফন-দাফন পরিধান করিয়ে খাটিয়ায় উঠিয়ে কবরস্থান নিয়ে গেছে। জানাযার নামাযের পরে আমাকে একটি কবরে রেখেছে। অতঃপর ঐ কবরটি বন্ধ করে দিয়েছে। আর উপরে কয়েক মন মাটি ঢেলে সবাই সেখান থেকে বিদায় হয়ে গেছে।

এখন অন্ধকার কবরে আমি একা। ইতোমধ্যে প্রশ্নোত্তরের জন্য ফেরেশতাগণ এসে গেছেন। তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করছেন। এরপর আখেরাতের ধ্যান করুন যে, আমাকে দ্বিতীয়বার কবর থেকে উঠানো হল। এখন হাশরের ময়দান কায়েম হয়েছে। সমস্ত মানুষ হাশরের মাঠে একত্রিত হয়েছে। সেখানে প্রচণ্ড গরম লাগছে। ঘাম পড়ছে। সূর্য একেবারেই নিকটবর্তী। প্রত্যেকটা মানুষ পেরেশান। লোকেরা আম্বিয়ায়ে কেরামের আ. নিকট গিয়ে সুপারিশ করছে যেন তাঁরা আল্লাহ পাকের নিকট হিসাব- কিতাব শুরু হওয়ার দরখাস্ত করেন।

অতঃপর এভাবেই হিসাব ও কিতাব, পুলসিরাত ও জান্নাত-জাহান্নামের ধ্যান করছে। প্রত্যহ ফযর নামাযের পর কুরআনে কারীম তিলাওয়াত, মুনাজাতে মাকবূল এবং নিজ যিকির আযকার থেকে অবসর হওয়ার পর

একটু ধ্যান করবে যে, এই সময় আসছে। জানা নেই কখন এসে যাবে? আজকেই যে আমার মৃত্যু হবে না সেটার নিশ্চয়তা কী?

এসব চিন্তা করার পর দু'আ করবে হে আল্লাহ! আমি দুনিয়ার কারবার এর উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি। এমন কোন কাজ যেন আমার দ্বারা না হয় যা আমার আখেরাতের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়। প্রতিদিন এভাবে ধ্যান করবেন। যখন একবার মৃত্যুর ধ্যান দিলের মধ্যে বসে যাবে, তখন ইনশাআল্লাহ স্বীয় ইসলাহ বা আত্মশুদ্ধির ফিকির পয়দা হবে।

৬০. একজন নবাবের ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. তাঁর ওয়াযের মধ্যে বলেন: লাখনৌ শহরে একজন নবাব ছিলেন। তার অনেক জায়গা জমিন ও ভূমি সম্পদ ছিল। চাকর নওকর সবকিছু ছিল। একবার তার সাথে আমার সাক্ষাত হল। তখন ঐ নবাব সাহেব নিজে আমাকে বলেছেন যে, আমি আমার ব্যাপারে আপনাকে কী বলব? এই যে দেখুন এত এত সম্পদ। কিন্তু আমার এমন একটি অসুখ হয়েছে যে, এর কারণে কোন জিনিস খেতে পারি না। আমার চিকিৎসক আমার জন্য একটিমাত্র খাদ্য নির্ধারণ করেছেন। সেটা হল গোশতের কিমা বানিয়ে একটি কাপড়ে বেঁধে সেটার রস চিপে বের করে চামচের মাধ্যমে পান করতে হবে।

এখন দেখুন! দস্তরখানে দুনিয়া ভর্তি নানা প্রজাতির খানা বিদ্যমান। হাজারো প্রকারের নেয়ামত উপস্থিত। কিন্তু আমি খেতে পারছি না। যেহেতু আমি অসুস্থ, ডাক্তার সাহেব নিষেধ করে দিয়েছেন। বলুন! ঐ সম্পদ এর কী মূল্য যেটাকে মানুষ নিজ মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে না। এর অর্থ এটাই যে,মহান আল্লাহ এই নেয়ামতের মধ্যে বরকত দেননি। যার পরিরণাম হচ্ছে এই যে, ঐ নেয়ামত বেকার হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অন্য একজন মানুষ যে মেহনত মজদুরী করে। শাক রুটি খায়। ঐ খানা তার শরীরে গিয়ে লাগে। এখন বলুন এই মজদুর ভাল নাকি ঐ নবাব ভাল? অথচ এর সম্পদ বেশি। আর ঐ মজদুরের সম্পদ কম। কিন্তু শান্তি নসীব হয়েছে মজদুরের। নবাবের নসীব হয়নি। এর নাম হল বরকত।

৬১. একটি আশ্চর্য ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. নিজ ওয়াযের মধ্যে একটি ঘটনার কথা বলেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, এক শহরে দুজন মানুষ মৃত্যু

শয্যায় শায়িত ছিলেন। মৃত্যুর নিকটবর্তী ছিলেন। একজন মুসলমান। অপরজন ইয়াহুদী। ঐ ইয়াহুদীর অন্তরে মাছ খাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হল। অথচ আশেপাশে কোথাও মাছ পাওয়া যেত না। আর ঐ মুসলমানের অন্তরে যাইতুনের তেল খাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হল। তো আল্লাহ তাআলা দুজন ফেরেশতাকে ডাকলেন। একজন ফেরেশতাকে বললেন যে, অমুক শহরে একজন ইয়াহুদী মৃত্যুর নিকটবর্তী। আর তার অন্তর মাছ খেতে চায়। তুমি একটা মাছ নিয়ে ওর ঘরের পুকুরের মধ্যে ফেলে দাও। যাতে করে সে মাছ খেয়ে নিজ অভিলাষ পূর্ণ করতে পারে।

অন্য একজন ফেরেশতাকে আল্লাহ পাক বললেন: অমুক শহরে একজন মুসলমান মৃত্যুর নিকটবর্তী। তার যাইতুনের তৈল খাওয়ার আগ্রহ। যাইতুনের তৈল তার আলমারীর মধ্যে রাখা আছে। তুমি যেয়ে তার তৈল বের করে নষ্ট করে দাও। যাতে করে সে তার অভিলাষ পূর্ণ করতে না পারে। ফলশ্রুতিতে উভয় ফেরেশতা নিজ নিজ মিশনে চললেন। রাস্তায় উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হল। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কোন্ কাজে যাচ্ছেন? একজন ফেরেশতা বললেন যে আমি অমুক ইয়াহুদীকে মাছ খাওয়াতে যাচ্ছি। অপর ফেরেশতা বললেন যে অমুক মুসলমানের যাইতুনের তৈল নষ্ট করার জন্য যাচ্ছি। উভয়েই বিস্মিত। আমাদেরকে এমন বিপরীতমুখী কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেন? কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ তাই উভয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেন।

ফিরে আসার পর উভয়ে আরয করলেন ইয়া আল্লাহ! আমরা আপনার নির্দেশ তো পালন করেছি সত্য, কিন্তু এ ব্যাপারটি আমাদের বোধগম্য হয়নি যে, একজন মুসলমান যে আপনার নির্দেশ পালনকারী ছিল আর তার নিকট যাইতুনের তৈলও বিদ্যমান ছিল এতদসত্ত্বেও আপনি তার ঐ যাইতুনের তৈল নষ্ট করিয়ে দিলেন। আর অন্য দিকে একজন ইয়াহুদী। যার নিকট মাছ ছিল না। অথচ এতদসত্ত্বেও আপনি তাকে মাছ খাইয়ে দিলেন। এজন্য আমাদের বুঝে আসেনি ব্যাপারটা কি? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বললেন: আমার কাজের হেকমত তোমাদের জানা নেই। আসল কথা হল, কাফেরদের সাথে আমার ব্যবহার এক রকম। আর মুসলমানদের সাথে আরেক রকম। কাফেরদের সাথে আমার ব্যবহার হচ্ছে এই যে, যেহেতু কাফের ব্যক্তিও দুনিয়াতে নেক আমল করতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ: কখনো সাদকা-খয়রাত করল। কখনো কোন ফকীরকে সাহায্য করল। তার এ সমস্ত নেক আমল যদিও

আখেরাতে আমার কাছে মাকবূল হবে না। তাই আমি তার নেক আমলের হিসাব কিতাব দুনিয়াতেই চুকিয়ে দেই। যাতে করে আখেরাতে আমার যিম্মায় তার নেকীর কোন বদলা অবশিষ্ট না থাকে।

কিন্তু মুসলমান ব্যক্তির সাথে আমার আচার-আচরণ ভিন্ন। সেটা হচ্ছে এই যে, আমি চাই মুসলমান ব্যক্তির গুনাহের হিসাব কিতাব দুনিয়াতেই চুকিয়ে দিব, যাতে করে যখন সে আমার কাছে আসবে তখন গুনাহ থেকে পাক সাফ হয়ে আসতে পারে। এজন্য ঐ ইয়াহুদী ব্যক্তি যত নেক আমল করেছিল, সেগুলোর প্রতিদান আমি তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিয়েছি। শুধু একটি নেকীর প্রতিদান দেয়া বাকী ছিল। এখন সে আমার নিকট আসছিল। যখন তার অন্তরে মাছ খাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হল, তখন আমি তার অভিলাষ পুরা করার জন্য তাকে মাছ খাইয়ে দিয়েছি। যাতে করে যখন সে আমার নিকট আসবে, তখন এমন অবস্থায় আসে যে তার সমস্ত নেক আমলের প্রতিদান দিয়ে দেয়া হয়েছে।

আর ঐ মুসলমান অসুস্থ অবস্থায় তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র একটি গুনাহ তার মাথায় ছিল, এখন সে আমার নিকট আসবে। এ অবস্থাতেই যদি সে আমার নিকট চলে আসত তাহলে তার ঐ গুনাহটি তার আমলনামায় থেকে যেত। এজন্য আমি এটা চাইলাম যে, তার যাইতুন তৈল নষ্ট করে এবং তার মনের আকাংখাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার অন্তরে আঘাত দিব এবং এর মাধ্যমে তার গুনাহগুলোও মাফ করে দিব। যাতে করে যখন সে আমার নিকট আসবে তখন সম্পূর্ণ পাক সাফ হয়ে আসে।

যাই হোক। মহান আল্লাহ তাআলার হেকমত বা গুঢ়তত্ত্ব বুঝার সামর্থ কার আছে? আমাদের এই ছোট্ট আকল কি ঐসব হেকমত অনুধাবন করতে পারে? মহান আল্লাহর হেকমতের অধীনে পুরো জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে।

৬২. দৃষ্টিতে কেউ খারাপ থাকেনি

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কে মহান আল্লাহ এ যুগে আমল এবং তাকওয়ার নমুনা বানিয়েছিলেন। তাঁর একজন খলীফা বলেন: একবার আমি হযরতওয়ালা থানভী রহ. কে বললাম: হযরত! যখন আপনি বয়ান করেন আর আমি আপনার মজলিসে থাকি তখন আমার কাছে মনে হয় যে, ঐ মজমায় আমার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোন মানুষ নেই।

এবং সবচেয়ে বড় গুনাহগার আমিই। অন্য মানুষদের তুলনায় আমার নিকট নিজেকে জানোয়ার মনে হয়।

উত্তরে হযরতওয়ালা থানভী রহ. বললেন: "ভাই! এই যে হালত তুমি বয়ান করলে সত্য কথা হল আমার হালতও এমনিই হয়। যখন আমি ওয়ায ও বয়ান করি, তখন এমন মনে হয় যে, সবাই আমার থেকে ভাল। আমি সবার থেকে খারাপ।"

এর কারণ কি? এর কারণ হল সবসময় তাঁর মধ্যে এই ফিকির ছিল যে, আমার মধ্যে কোন্ দোষ আছে? কোন্ গুনাহ আছে? আমি এটা কিভাবে দূর করতে পারি? এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কিভাবে অর্জন করতে পারি? যদি মানুষ নিজের দোষ এর সমীক্ষা নেয়া শুরু করে, তাহলে অন্যের দোষ আর তার নজরে আসবে না। তখন মানুষ নিজের চিন্তায় লেগে যায়।

বাহাদুর শাহ যুফার মরহুম বলেছিলেন:

تھے جو اپنی برائی سے بے خبر
رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر
تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

অর্থাৎ যে ছিল নিজ খারাবীর ব্যাপারে বেখবর
ছিল সে অন্যের ত্রুটি অন্বেষণে বিভোর
নিজ খারাবীর প্রতি পড়ল যখন নজর
তার দৃষ্টিতে আর কেউ থাকল না ইতর।

মনে রাখবেন কোন মানুষ অন্যের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে এতটা অবগত থাকে না যতটা অবগত থাকে স্বীয় দোষ ত্রুটির ব্যাপারে। মানুষ নিজের ব্যাপারে জানে সে কী চিন্তা করছে। তার অন্তরে কী কী খেয়াল আসছে। কিন্তু যেহেতু স্বীয় দোষ ত্রুটির ব্যাপারে উদাসীন। এজন্য অন্যের দোষ তার নজরে আসে। নিজের ব্যাপারে সে হয়ে যায় বেপরোয়া।

৬৩. হযরত থানভী রহ. এর অন্যান্যদেরকে উত্তম মনে করা

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ. এর এই ইরশাদ আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ

শফী ছাহেব রহ. থেকেও শুনেছি এবং আমার শাইখ ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী রহ. থেকেও শুনেছি। সেটা হচ্ছে এই যে, আমি ফিলহাল সমস্ত মুসলমানকে এবং ভবিষ্যত বিচারে সমস্ত কাফেরকে আমার থেকে উত্তম মনে করি। কেননা যদিও সে এ মুহূর্তে কাফের। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ পাক তাকে তাওবার তাউফীক দান করবেন এবং সে কুফরের মুসীবত থেকে বের হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার দারাজাত এমন বুলন্দ করে দিবেন যে, সে আমার থেকেও আগে বেড়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমান, ঈমানওয়ালা, আল্লাহ পাক তাঁকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। মহান আল্লাহর সাথে তার কেমন সম্পর্ক তা তো আমার জানা নেই। এ জন্য আমি প্রত্যেক মুসলমানকে আমার থেকে উত্তম মনে করি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর মধ্যে মিথ্যা এবং ভুল বর্ণনার কোন সম্ভাবনা তো নেই যে, মনে হয় ভদ্রতার খাতিরে এটা বলে দিয়েছেন যে, "আমি প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের থেকে উত্তম মনে করি।" নিশ্চয়ই তিনি নিজেকে এমনই মনে করতেন। তাই তো তিনি একথা বলেছেন।

যাই হোক গুনাহের কারণে কাউকে তুচ্ছ মনে করা জায়েয নেই।

৬৪. একজনের দোষ অন্যকে বলবেন না

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ বা 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ।'

তো এ হাদীসে পাকের দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি তুমি অন্য কারো মধ্যে কোন দোষ দেখ তাহলে শুধু তাকেই জানাও যে, তোমার মধ্যে এই দোষ আছে। অন্যের নিকট এ কথা বলে বেড়িওনা যে, অমুকের মধ্যে এই দোষ আছে। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনকে আয়নার সাথে তুলনা করেছেন। আর আয়না শুধুমাত্র এ ব্যক্তির চেহারার দাগের ব্যাপারে বলে যে তার সামনে দণ্ডায়মান। ঐ আয়না অন্য মানুষকে এ কথা বলে না যে, অমুকের চেহারায় দাগ আছে।

এজন্য একজন মুমিন ব্যক্তির করণীয় হল: কারো মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে শুধু তাকেই জানাবে। অন্য কারো নিকট সেটার আলোচনা করবে না যে, অমুকের মধ্যে এই দোষ বা বদ অভ্যাস আছে। কেননা অন্যের কাছে তার দোষের আলোচনা করার অর্থ হল এ কাজে তোমার কুপ্রবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত আছে। তাহলে তো আর সেটা দ্বীনের কাজ হবে না। পক্ষান্তরে যদি নির্জনে

স্রেফ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মহব্বতের সাথে তার ভুল-ক্রুটির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয় তাহলে এটা হল ঈমানী ভ্রাতৃত্বের চাহিদা। কিন্তু তাকে তুচ্ছ বা নীচু মনে করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই।

৬৫. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. নিজ ওয়াযের মধ্যে একটি কিচ্ছা লিখেছেন। জনৈক ব্যক্তির হযরত খিযির (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তি হযরত খিযির (আঃ) কে বললেনঃ হযরত! আমার জন্য এই দু'আ করুন যেন জীবনে কখনো আমার কোন দুঃখ-কষ্ট না হয়। এবং সারাজীবন দুঃশ্চিন্তামুক্ত অবস্থায় যেন কেটে যায়।

হযরত খিযির (আঃ) বললেনঃ এই দু'আ তো আমি করতে পারি না। কেননা এই দুনিয়াতে চিন্তা ও কষ্ট আসবেই। অবশ্য একটি কাজ এই করতে পারি যে, তুমি দুনিয়াতে এমন একজন মানুষ তালাশ কর যে তোমার নিকট সব থেকে বেশি চিন্তামুক্ত অথবা কম চিন্তাযুক্ত নজরে আসে অতঃপর আমাকে ঐ ব্যক্তির ঠিকানা জানিয়ে দিবে। আমি আল্লাহর নিকট এই দু'আ করব যেন তিনি তোমাকে ঐ ব্যক্তির মত বানিয়ে দেন।

এই ব্যক্তি খুব আনন্দিত হলেন একথা ভেবে যে, যাক এমন একজন মানুষ পাব যে অনেক শান্তিতে থাকবে আর আমি তার মত হওয়ার জন্য দু'আ করিয়ে নিব। এখন তালাশ করার জন্য বের হলেন। কখনো একজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন যে, তার মত হওয়ার জন্য দু'আ করাব। এরপর অন্য আরেকজন তার থেকে বেশি সম্পদশালী দেখা গেলে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন।

মোটকথা, লম্বা সময় পর্যন্ত তালাশ করার পর জনৈক রত্ন ব্যবসায়ীর সন্ধান তিনি পেলেন। যিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য এবং দামী পাথরের ব্যবসা করতেন। তার দোকান ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সুসজ্জিত। তার বাড়ী ছিল দারুণ আলীশান। বাহনও ছিল খুব মূল্যবান। চাকর-নওকর তার খেদমতে লেগে থাকত। তার ছেলে ছিল অপূর্ব সুদর্শন যুবক। বাহ্যিক অবস্থা দেখে তিনি মনে করলেন যে, এ মানুষটি নিশ্চয়ই খুব শান্তিতে আছেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তার মত হওয়ার জন্য হযরত খিযির (আঃ) এর মাধ্যমে দু'আ করাব।

ফিরে যাওয়ার সময় খেয়াল আসল যে, এ ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা তো খুব শানদার। এখন তার ভিতরগত অবস্থা একটু খবর নিয়ে দেখি। হতে পারে কোন রোগে আক্রান্ত বা কোন পেরেশানীতে লিপ্ত। তাহলে তো আমার বর্তমান হালতও খতম হয়ে যাবে। এজন্য ঐ রত্ন ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত তার আসল অবস্থা কী?

ফলশ্রুতিতে এই লোক ঐ রত্ন ব্যবসায়ীর নিকট গেলেন এবং তার নিকট গিয়ে বললেন যে, আপনাকে তো বাহ্যিকভাবে খুব শান শওকতে দেখা যায়, ধন-সম্পদের বিশাল স্তুপ। চাকর-নওকর লেগে আছে। আমি আপনার মত হতে চাই। আপনার আভ্যন্তরীণ বা ভিতরগত কোন পেরেশানী তো নেই? বা কোন অসুখ-বিপদের শিকার নন তো আপনি?

ঐ রত্ন ব্যবসায়ী এই ব্যক্তিকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। আর বললেন যে, আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা তো এটাই যে, আমি খুব শান্তি ও আরামে আছি। তাই না? আমি অনেক সম্পদশালী, অনেক খাদেম চাকর আমার সেবায় আছে। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে বেশি অশান্তিতে আর কেউ নেই।

এরপর তিনি তার স্ত্রীর চরিত্রগত অবস্থার দারুণ শিক্ষণীয় ঘটনা শুনিয়ে বললেনঃ এই যে সুদর্শন ছেলেটি তুমি দেখছ বাস্তবিকপক্ষে সে আমার ছেলে নয়, এজন্য একটা মুহূর্তও আমার কষ্ট ছাড়া অতিবাহিত হয় না। আমার ভিতরে কষ্টের যে আগুন এ ব্যাপারে তো তুমি জাননা। এজন্য আমার মত হওয়ার দু'আ কখনো করাবে না।

এখন এই ব্যক্তির টনক নড়ল যে, যত মানুষ মাল-দৌলত ও আরাম আয়েশে মত্ত দেখা যায়, তারা কোন না কোন মুসীবতের শিকার।

হযরত খিযির (আঃ) এর সঙ্গে যখন পুনরায় সাক্ষাত হল, তখন তিনি বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, বলঃ তুমি কার মত হতে চাও? এই ব্যক্তি বললেনঃ আমি একজন মানুষও চিন্তা ও পেরেশানীমুক্ত পেলাম না। যার মত হওয়ার জন্য দু'আ করাব।

হযরত খিযির (আঃ) বললেনঃ আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, এই পৃথিবীতে কোন একজন মানুষও তুমি চিন্তামুক্ত পাবে না। অবশ্য আমি তোমার জন্য এই দু'আ করছি যেন তিনি তোমাকে আফিয়াত বা সুখময় জীবন দান করেন।

৬৬. দুঃখ-কষ্টের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: এসব কষ্টের উদাহরণ এরূপ যেমন মনে করুন জনৈক ব্যক্তির শরীরে কোন ব্যাধি আছে। যদ্দরুন ডাক্তার সাহেব অপারেশন করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এখন রোগী জানে যে, অপারেশন মানেই কাটা-চেরা হবে। কষ্ট হবে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে ডাক্তারের নিকট দরখাস্ত করছে: দ্রুত আমার অপারেশন করুন। অন্যদের মাধ্যমেও সুপারিশ করায়। ডাক্তার সাহেবকেও মোটা অংকের ফিস দেয়। কেমন যেন সে এ উদ্দেশ্যের জন্য টাকা দিচ্ছে যে, আমার উপর ছুরি চালাও।

সে এসব কিছু কেন করছে? কেননা সে জানে যে, এই অপারেশন ও ছুরি চালানোর কষ্ট হল সাময়িক ও সামান্য। কয়েকদিন পর ক্ষতস্থান ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ অপারেশন এবং এরপর সুস্থতার যে নেয়ামত অর্জিত হবে সেটা এত বিশাল যে, এর বিপরীতে এই কষ্ট কিছুই নয়। আর যে ডাক্তার কাটা-চেরা করছেন যদিও বাহ্যিকভাবে তিনি কষ্ট দিচ্ছেন কিন্তু ঐ রোগীর জন্য ঐ সময় এই ডাক্তারের চেয়ে বেশি স্নেহপরায়ন ও অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই। কেননা এই ডাক্তার অপারেশনের মাধ্যমে তার সুস্থতার পাথেয় প্রস্তুত করছেন।

৬৭. হযরত বাহলূল রহ. এর উপদেশমূলক ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: একজন বুযুর্গ ছিলেন বাহলূল মাজযূব রহ. বা আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা। বাদশাহ হারূনুর রশীদ রহ. এর যুগ ছিল। হারূনুর রশীদ ঐ মাজযূবের সাথে হাস্য রসিকতা করতেন। বাহলূল যদিও মাজযূব ছিলেন কিন্তু খুব প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বলতেন।

বাদশাহ হারূনুর রশীদ স্বীয় দারোয়ানদেরকে বলে রেখেছিলেন যে, এই মাজযূব যখন আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসবে তখন তাঁকে আসতে দিবে। তাঁকে বাধা দিবে না। ফলে যখনই বাহলূলের ইচ্ছা হত শাহী দরবারে চলে আসতেন। একদিন তিনি দরবারে আসলেন। তখন হারূনুর রশীদের হাতে একটি ছড়ি ছিল। হারূনুর রশীদ বাহলূলকে লক্ষ্য করে বললেন: বাহলূল ছাহেব! আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। বাহলূল জিজ্ঞেস করলেন: কী সেই অনুরোধ? হারূনুর রশীদ বললেন: এই ছড়িটা আমি আপনাকে আমানত হিসেবে দিচ্ছি। পৃথিবীতে যদি আপনি আপনার

থেকে বেশি নির্বোধ কাউকে পান, তাহলে তাকে আমার পক্ষ থেকে এই ছড়িটি হাদিয়া দিবেন। বাহলূল বললেন: "খুব ভাল কথা।" এটা বলে তিনি ঐ ছড়িটিকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

বাদশাহ তো রসিকতাবশত এমনটি করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, হে বাহলূল! পৃথিবীতে তোমার চেয়ে বড় নির্বোধ আর কেউ নেই। যাই হোক, বাহলূল ঐ ছড়িটি নিয়ে চলে গেলেন। এ ঘটনার কয়েক বছর পর। একদিন বাহলূল সংবাদ পেলেন যে, হারূনুর রশীদ খুব অসুস্থ। বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর চিকিৎসা চলছে। কিন্তু কোন উপকার হচ্ছে না।

এই বাহলূল মাজযূব বাদশাহর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য দরবারে পৌঁছলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন: আমীরুল মুমিনীন! কী অবস্থা? বাদশাহ উত্তর দিলেন: অবস্থা আর কী জিজ্ঞেস কর? সফর সামনে। পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। বাহলূল জিজ্ঞেস করলেন: কত দিনে ফিরে আসবেন? হারূনুর রশীদ বললেন: ভাই! এটা আখেরাতের সফর। এর থেকে কেউ ফিরে আসে না। বাহলূল বললেন: আচ্ছা বুঝলাম ফিরে আসবে না। তো আপনি এ সফরের আরামের ব্যবস্থাপনার জন্য কত সৈন্যবাহিনী সামনে প্রেরণ করেছেন? বাদশাহ উত্তর দিলেন: তুমি পুনরায় বেকুবের মত কথা বলছ। আখেরাত এর সফরে কেউ সাথে যায় না। দেহরক্ষীও যায় না। সৈন্যবাহিনীও যায় না। সেখানে তো মানুষ একাই যায়। বাহলূল বললেন: এত লম্বা সফর যে সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না অথচ আপনি কোন সৈন্যবাহিনী পাঠালেন না! ইতোপূর্বে আপনার যত সফর হত, সেখানে ব্যবস্থাপনার জন্য সফরের সামানা ও সৈন্যবাহিনী যেত। এই সফরে কেন পাঠান নি?

বাদশাহ বললেন: না, এটা এমন এক সফর যেখানে কোন সৈন্য বাহিনী আগে পাঠানো হয় না। বাহলূল বললেন: সম্মানিত বাদশাহ! আপনার একটি আমানত দীর্ঘদিন যাবত আমার নিকট রাখা আছে সেটা হল একটি ছড়ি। আপনি বলেছিলেন: আমার থেকে বেশি বেকুব কাউকে পেলে এটাকে দিয়ে দিতে। আমি অনেক তালাশ করেছি। কিন্তু আমি আমার থেকে বড় বেকুব আপনাকে ছাড়া আর কাউকে পাইনি। কেননা আমি দেখতাম যে, যদি আপনার সংক্ষিপ্ত সফরও হত, তাহলে মাসখানেক পূর্ব থেকেই এর প্রস্তুতি

আরম্ভ হয়ে যেত। পানাহারের সামানা, তাঁবু, সৈন্যবাহিনী, দেহরক্ষী সবকিছু প্রথমে পাঠানো হত।

অথচ এখন এত লম্বা সফর যেখান থেকে ফিরে আসাও হবে না, তার জন্য কোন প্রস্তুতি নাই। এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বড় বেকুব আমি আর কাউকে পাইনি। এজন্য আপনার এ আমানত আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি।

এটা শুনে হারূনুর রশীদ কেঁদে ফেললেন। এবং বললেন: "বাহলূল! তুমি সত্য কথা বলেছ। সারাজীবন আমরা তোমাকে বেকুব মনে করেছি। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, হেকমতের কথা একমাত্র তুমিই বললে। বাস্তবেই আমি আমার জীবন নষ্ট করেছি। আর ঐ আখেরাতের সফরের কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ করিনি।"

৬৮. পাশ্চাত্য সভ্যতার সবকিছু উল্টো

হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ. বলতেন যে, পাশ্চাত্যের নতুন সভ্যতার সবকিছু উল্টো। অতঃপর রসিকতা করে বলতেন যে, আগে বাতির নিচে অন্ধকার হত আর এখন বাতির উপরে অন্ধকার হয়। এই পাশ্চাত্য সভ্যতা (?) আমাদের সবকিছুকে বিগড়ে দিয়েছে। তাই তো বর্তমানে সভ্যতা হচ্ছে এই যে, খানা খাওয়ার সময় চামচ এবং ছুরি ডান হাতে ধরে বাম হাতে খানা খাওয়া হবে।

আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে আমি বিমানে সফর করছিলাম। আমার পাশের সিটে একজন সাহেব বসা ছিলেন। সফরের মাঝে তার সাথে কিছুটা অকৃত্রিম সম্পর্কও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যখন খানা আসল তখন ঐ ব্যক্তি অভ্যাস অনুযায়ী ডান হাতে ছুরি নিলেন এবং বাম হাতে খাওয়া আরম্ভ করলেন। আমি তাকে বললাম যে, "আমরা প্রত্যেক কাজে ইংরেজদের অনুসরণ আরম্ভ করেছি। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছিল, তিনি ডান হাতে খানা খেতেন। এজন্য যদি আপনি ডান হাতে খানা খান তাহলে আপনার এই আমলই সাওয়াবের উপলক্ষ হবে"। এটা শুনে ঐ লোক বলতে লাগল : আসলে আমাদের সম্প্রদায় এ কারণেই পিছনে রয়ে গেছে। যেহেতু তারা এসব ছোট ছোট জিনিসের পিছনে পড়েছে! এই মৌলভীরা ঐ সব জিনিসের মধ্যে আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়কে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। এবং উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে বড় বড় কাজ থেকে আমরা পিছনে রয়ে গেছি!! (নাউযুবিল্লাহ)

৬৯. জনৈক ইয়াহুদীর দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. একজন ইয়াহুদীর ঘটনা লিখেছেন যে, সে মাল-দৌলতের বিশাল ভাণ্ডার একত্রিত করে রেখেছিল। একদিন সে এ ধন-ভাণ্ডার পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে চলল। ধন-ভাণ্ডারে চৌকিদার বসে ছিল। কিন্তু মালিক এটা দেখতে চাচ্ছিল যে, ঐ চৌকিদার কোন খেয়ানত করে কিনা? এজন্য চৌকিদারকে না জানিয়ে নিজের নিকট রক্ষিত গোপন চাবি দ্বারা গুপ্তভাণ্ডারের তালা খুলে ভিতরে চলে গেল। চৌকিদারের জানা ছিল না যে, মালিক পরিদর্শন এর জন্য ভিতরে গিয়েছে। সে যখন দেখল যে, ধন-ভাণ্ডারের দরওয়াযা খোলা, সে বাহির থেকে তালা লাগিয়ে দিল। এখন ঐ মালিক ভিতরে পরিদর্শন করতে থাকল। ধন-ভাণ্ডার এর জগতে পরিভ্রমণ করতে থাকল। যখন পরিভ্রমণ শেষে বাইরে বের হওয়ার জন্য দরওয়াযার নিকটে আসল তখন দেখল যে, দরওয়াযা বাহির থেকে বন্ধ। এখন ভিতর থেকে সে আওয়ায দিচ্ছে, কিন্তু এ আওয়ায বাইরে যাচ্ছে না। ঐ ধন-ভাণ্ডারে স্বর্ণ-রূপার স্তূপ। কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে সেটা খেতে পারছে না। পিপাসা লাগছে। কিন্তু সেগুলোর দ্বারা নিজ পিপাসা মিটাতে পারছে না। অবশেষে ঐ ধন-ভাণ্ডারের ভিতরেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে মরে গেল। আর ঐ ধন-ভাণ্ডারই তার মৃত্যুর উপলক্ষ হয়ে গেল।

৭০. প্রথমে মানুষ হও

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর প্রসিদ্ধ উক্তি: যদি তোমরা সূফী বা আবেদ-যাহেদ হতে চাও, তাহলে এ উদ্দেশ্যে অসংখ্য খানকা খোলা আছে। সেখানে চলে যাও। আর যদি মানুষ হতে চাও তাহলে এখানে আস। কেননা এখানে তো মানুষ বানানো হয়। মুসলমান হওয়া, আলেম হওয়া, সূফী হওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। উচ্চ পর্যায়ের কথা। আরে প্রথমে মানুষ তো বনে যাও। প্রথমে জানোয়ারদের কাতার থেকে বেরিয়ে যাও।

আর মানুষ ঐ সময় পর্যন্ত মানুষ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে ইসলামী সামাজিকতার রীতি-নীতি পুরোপুরি না আসবে। এবং এর উপর সে আমল না করবে।

৭১. সগীরা এবং কবীরা গুনাহের উদাহরণ

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: ছোট গুনাহের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আর বড় গুনাহের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন বড় আগুন এবং বড় অঙ্গার। এখন যদি কেউ চিন্তা করে যে, আরে এটা তো ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ, বড় আগুন তো আর নয়। আন, এটাকে আমি আমার সিন্দুকের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। তো এটার পরিণতি এই হবে যে, ঐ ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ পুরো সিন্দুক ও সমস্ত কাপড় জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিবে।

৭২. মাখলূক থেকে উন্নত আশা খতম করে দাও

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: দুনিয়াতে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থাপত্র স্রেফ একটাই। আর সেটা হল মাখলূক থেকে কিছু পাওয়ার আশা খতম করে দাও। উদাহরণ স্বরূপ: এমন আশা রাখা যে, অমুক আমার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। অমুক আমার কাজে আসবে। সে আমার দুঃখ ব্যথায় শরীক হবে। এই সমস্ত আশা খতম করে স্রেফ এক সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথে সম্পর্ক রাখ। তাঁর থেকেই কোন কিছু পাওয়ার আশা কর। কেননা মাখলূকাত থেকে আশা বাদ দিয়ে দেয়ার পর যদি তাদের থেকে ভাল কিছু পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে ধারণাতীত ব্যাপার। ফলশ্রুতিতে দারুণ আনন্দ লাভ হবে। আর যদি মাখলূকের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পৌঁছে, তাহলে এতে বেশি ব্যথা লাগবে না।

৭৩. আত্মশুদ্ধির জন্য প্রথম পদক্ষেপ

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা সুলূক ও তরীকতের একটি বিরাট অধ্যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের পথে চলতে চায় এবং স্বীয় আত্মশুদ্ধি করতে চায় তার জন্য প্রথম করণীয় হল নিজ গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ফিকির করা।

৭৪. একজনের দোষ অন্যকে বলা অনুচিৎ

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: আয়নার কাজ হল যে ব্যক্তি তার সামনে আসবে তার যদি কোন দোষ থাকে, তাহলে আয়না শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিকেই বলবে যে, তোমার মধ্যে এই দোষ আছে। ঐ আয়না অন্যান্যদেরকে এ কথা বলবে না যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে এই দোষ আছে। আর সে ঐ দোষের চর্চাও করবে না।

অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিও এক আয়না। যখন সে অন্য কারো কোন দোষ দেখবে, তখন সে স্রেফ তাকেই একাকী বলবে। অন্য মানুষদেরকে জানানো ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয়। বরং এটা তো হল নিজের চাহিদা পুরা করা। মনের মধ্যে পাপ থাকলে এই খেয়াল আসবে যে, তার দোষের কারণে আমি তাকে অপদস্থ করব। অথচ কোন মুসলমানকে অপদস্থ করা হারাম।

৭৫. হযরত থানভী রহ.-এর ঘটনা

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর একজন পুরানো খাদেম ছিলেন ভাই নিয়ায মরহুম। থানাভবনের খানকায় হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর নিকট থাকতেন। যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত হযরতওয়ালার খেদমত করছিলেন। এজন্য তবিয়তে সামান্য অহংকারের ভাব এসে গিয়েছিল।

একবার কেউ একজন হযরতওয়ালার নিকট এসে তার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন যে, ভাই নিয়াযের মুখ বেশি বড় হয়ে গেছে। অনেক সময় মানুষকে বকা দিয়ে বসেন। হযরতওয়ালার মনে হল যে, খানকায় আগন্তুকদেরকে এভাবে অন্যায় বকাঝকা তো খুব খারাপ কথা।

ফলে হযরতওয়ালা রহ. তাঁকে ডেকে বললেন: মিঞা নিয়ায! এটা কোন্ ধরনের আচরণ যে, তুমি যাকে তাকে বকা দাও। ভাই নিয়াযের মুখ থেকে এ কথা বের হয়ে গেল যে, "হযরতজী! মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন।"

বাহ্যত: ভাই নিয়ায ছাহেব এ কথা বলতে চাচ্ছিলেন যে, যারা আপনার নিকট আমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে যে, আমি মানুষদেরকে বকাঝকা করি, তারা যেন মিথ্যা না বলে। আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু তার মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে যে, "মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন।"

এ জাতীয় পরিস্থিতিতে ঐ খাদেম আরো বেশি শাস্তি ও ধমকের উপযুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু হযরত থানভী রহ. এ কথা শোনামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি অবনত করে ফেললেন। এবং اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার এ কথা বলার দ্বারা হযরতওয়ালার এই চেতনা জাগ্রত হল যে, আমি তো এক তরফা কথা শুনে তাকে ধমক দেয়া আরম্ভ করেছি। কেউ একজন এসে তার ব্যাপারে কান ভারী করেছে। কিন্তু সরাসরি ভাই নিয়াযকে জিজ্ঞেস করা হয়নি যে, আসল ব্যাপার কী

ছিল? আর শুধু ঐ কথার উপর ভিত্তি করে আমি তাকে বকাঝকা দেয়া শুরু করে দিয়েছি। এ কাজটি আমি ঠিক করিনি।

এজন্য সঙ্গে সঙ্গে "আসতাগফিরুল্লাহ" বলে সেখান থেকে চলে গিয়েছেন।

অথচ এই মহান ব্যক্তিত্বের (হযরত থানভী রহ.) ব্যাপারে বলা হয় তিনি জালালী (প্রকৃতির) বুযুর্গ ছিলেন! আর মানুষদেরকে খুব বকাঝকা দিতেন!!

৭৬. জনৈক শিশুর বাদশাহকে গালী দেয়া

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী রহ. একটি ঘটনা বলেছেন: দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদের একজন নবাব সাহেব ছিলেন। তাঁর উজির বা সভাসদ একদিন তাকে দাওয়াত করল। তাঁকে নিজের ঘরে ডাকল। যখন নবাব সাহেব ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন উজিরের বাচ্চা সেখানে খেলছিল। এদিকে নবাব সাহেবের শিশুদের সাথে রসিকতার অভ্যাস ছিল। তিনি উজিরের বাচ্চাকে উত্যক্ত করার জন্য তার কান ধরলেন। ঐ বাচ্চাটিও ছিল খুব দুরন্ত। সে কি আর বুঝে নবাব কে? বাদশাহ কে? বাচ্চা পাল্টা নবাব সাহেবকে গালী দিয়ে বসল। উজির যখন বাচ্চার মুখে নবাব সাহেব এর উদ্দেশ্যে গালী শুনল, তখন তার প্রাণপাখী উড়াল দেবার দশা যে, হায় আমার সন্তান নবাব সাহেবকে গালী দিয়েছে! আর নবাবদের মুখই আইন হয়ে থাকে। আল্লাহই জানেন এ সন্তানের কী অবস্থা হবে?

এজন্য উজির স্বীয় বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য তলোয়ার বের করল আর বলল যে, আমি এখনই এর মাথা উড়িয়ে দিচ্ছি। যেহেতু সে নবাব সাহেবের শানে গোস্তাখী করেছে। নবাব সাহেব বাধা দিয়ে বললেন: "না, ছেড়ে দাও। এতো বাচ্চাই। অবশ্য এ বাচ্চাটিকে মেধাবী মনে হচ্ছে। আর এ বাচ্চার মধ্যে এতটুকু আত্মপ্রত্যয় আছে যে, কেউ তার কান মুড়ে দিলে এই বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী নয় বরং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী। নিজের প্রতিশোধ নিজেই নেয়। সে আত্মবিশ্বাসী শিশু। এজন্য আমি এর মাসিক ভাতা চালু করে দিচ্ছি।" ফলে তার ভাতা চালু হয়ে গেল। ঐ ভাতার নাম ছিল 'ওযীফায়ে দুশনাম' অর্থাৎ গালী দেয়ার ভাতা।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলেন: এখন তুমিও যদি এটা চিন্তা কর যে, গালী দিলে ভাতা জারী হয়, তাই আমিও গিয়ে নবাব সাহেবকে গালী দিয়ে আসব। বলা বাহুল্য যে, কেউ এমনটি করবে না। কেননা ঐটা

ছিল ঐ শিশু আর সেই নবাবের মধ্যকার একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিচ্ছিন্ন ঘটনা যে, গালী দেয়া সত্ত্বেও পুরস্কৃত করেছে। কিন্তু এটা কোন সাধারণ নিয়ম ছিল না যে, যে কেউ নবাব সাহেবকে গালী দিবে সেই ভাতা পাবে। বরং এখন কেউ গালী দিলে তাকে প্রহার করা হবে। জেলখানায় বন্দী করে দেয়া হবে। এমনকি এটাও হতে পারে যে, তার শিরোচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া হবে।

বান্দার সাথে আল্লাহ পাকের মুআমালা একই ধরনের। কারো এই আমল কবূল করবেন আবার কারো ঐ আমল কবূল করবেন। তাঁর রহমত কোন বন্ধন কোন শর্ত এবং কোন নিয়মের পাবন্দ নয়। আল্লাহ পাক বলেন : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ "আর আমার রহমত প্রত্যেক জিনিসকে বেষ্টন করে নিয়েছে।" (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৬)

এজন্য আল্লাহ পাক কখনো কারো সাথে বেইনসাফী করেন না। তবে কারো কোন আমল যদি আল্লাহ পাকের পসন্দ হয়ে যায় তাহলে এর উপর তিনি বিশেষ পুরস্কার দান করেন।

৭৭. হযরত থানভী রহ. এর একটি ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী রহ. এর একজন খাদেম ছিলেন যাকে সবাই "ভাই নিয়ায" বলে ডাকত। খুব মহব্বতের খাদেম ছিলেন। এ জন্য আগন্তুকরাও তাকে মহব্বত করত। আর যেহেতু খানকার মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের সুনির্ধারিত সময় ও ব্যবস্থাপনা ছিল। এ জন্য নতুন আগন্তুকদেরকে বিভিন্ন ব্যাপারে সাবধানও করতেন যে, এ কাজ করো না। এ কাজ এভাবে কর ইত্যাদি।

কেউ একজন হযরতওয়ালার নিকট তার ব্যাপারে অভিযোগ করল যে, হযরত! আপনার এই খাদেম ভাই নিয়ায খুব মাথায় উঠেছে। অনেক মানুষকে সে বকাঝকা দেয়। এটা শুনে হযরতওয়ালা থানভীর রহ. গোস্বা আসল যে, সে এমনটি করবে কেন? ফলে হযরত তাকে ডাকলেন এবং ধমকালেন যে, ভাই নিয়ায! তুমি এমনটি কেন কর? সবাইকে তুমি বকাঝকা কর। এ অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

উত্তরে ভাই নিয়ায বলল : "হযরত! আল্লাহকে ভয় করুন। মিথ্যা বলবেন না"!

আসলে হযরতওয়ালাকে বলা তার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল, যারা আপনার নিকট আমার ব্যাপারে অভিযোগ করছে, তারা যেন

আল্লাহকে ভয় করে। মিথ্যা কথা না বলে। যখন হযরত থানভী রহ. ভাই নিয়াযের কাছ থেকে এ কথাটি শুনলেন, তখনই গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা হতভম্ব হয়ে গেল যে, এটা কী হল? একজন সামান্য খাদেম হযরতওয়ালাকে এমন শক্ত কথা বলল আর হযরত তাকে কিছু না বলে ইসতিগফার পড়তে পড়তে চলে গেলেন। পরবর্তীতে হযরতওয়ালা বললেন : "আসলে ভুল আমারই ছিল। কেননা আমি একপক্ষের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দেয়া আরম্ভ করেছি। আমার উচিত ছিল প্রথমে তাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা যে, লোকেরা তোমার নাম এই এই অভিযোগ করছে। এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? অভিযোগ সঠিক না ভুল? আর অপরপক্ষের কথা শোনা ছাড়া ধমক দেয়া শরীয়তের খেলাফ বা পরিপন্থী। যেহেতু এ কাজটি শরীয়তপরিপন্থী ছিল, তাই আমি এর উপর ইসতিগফার করতে করতে সেখান থেকে চলে এসেছি।"

বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তির অন্তরে মহান আল্লাহ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার দাড়িপাল্লা সৃষ্টি করে দেন। তাঁর অবস্থা এই হয় যে, তাঁর কোন কথা সীমার বাইরে যায় না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর বুঝ দান করুন। আমীন।

৭৮. কাউকে মানসিক কষ্ট দেয়া হারাম

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: হাদীসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে: ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ। এ হাদীসে পাকে মুখ এবং হাতের দ্বারা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি স্বীয় মুখ বা হাতের দ্বারা এমন কোন কাজ করে যার দ্বারা অন্য মানুষের মানসিক কষ্ট হয়, তাহলে সেটাও এ হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ স্বরূপ: আপনি কারো নিকট থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং তার সাথে এই অঙ্গীকার করেছেন যে, এত দিনের মধ্যে আমি এই ঋণ পরিশোধ করে দিব। এখন যদি আপনি সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারেন, তাহলে আপনার উচিত তাকে জানিয়ে দেয়া যে, আমি এই মুহূর্তে আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারছি না। এতদিন পরে আদায় করে দিব ইনশাআল্লাহ। তারপরও আদায় করতে না পারলে ঋণদাতাকে জানিয়ে দিন।

কিন্তু তাকে ঝুলিয়ে রাখা অনুচিত। বা আজ দিব কাল দিব এভাবে ঘুরাতে থাকা খুবই অন্যায়।

এভাবে একজন মানুষকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া হয়। এখন ঐ বেচারা কোন পরিকল্পনাও করতে পারছে না। কেননা সে বুঝতেই পারছে না যে, তার ঋণ সে ফেরৎ পাবে কিনা? পেলে কবে পাবে? আপনার এ পদ্ধতিও নাজায়েয ও হারাম।

৭৯. কর্মচারীর উপর মানসিক পীড়ন

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: মনে করুন, আপনার একজন কর্মচারী আছে। এখন আপনি এক সঙ্গে চারটি কাজ তাঁকে দিলেন যে, প্রথমে এই কাজ করবে। অতঃপর এই কাজ, অতঃপর...এভাবে আপনি চারটি কাজ মনে রাখার বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিলেন।

এমনটি করা যদি বেশি প্রয়োজনীয় না হয় তাহলে একই সঙ্গে চারটি কাজের বোঝা কারো উপর চাপানো অনুচিত। বরং তাকে প্রথমে একটি কাজের কথা বলবে। প্রথম কাজটি করার পর দ্বিতীয় কাজের কথা বলতে হবে। দ্বিতীয় কাজের পর তৃতীয় কাজ।

হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. নিজ কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করে বলেছেন: আমি আমার চাকরকে একই সময়ে একটি কাজের কথা বলি। তার দ্বারা দ্বিতীয় যে কাজটি নিব সেটা মনে রাখার বোঝা আমার নিজের মাথায় রাখি। চাকরের মাথায় রাখি না। যাতে করে সে মানসিকভাবে চাপ অনুভব না করে। যখন সে এক কাজ করে অবসর হয় তখন তাকে অন্য কাজের কথা বলি।

এর মাধ্যমেই অনুমান করে নিন হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর দূরদর্শিতা কেমন ছিল!!

৮০. "আদাবুল মুআশারাত" পাঠ করুন

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব আছে। নাম "আদাবুল মুআশারাত" বা সামাজিকতার রীতি-নীতিসমূহ। এই কিতাবে হযরত মুআশারাতের আদবসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ কিতাবটি প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই পাঠ করা উচিত।

এই কিতাবের ভূমিকায় হযরত থানভী রহ. লিখেছেন: আমি এই কিতাবে মুআশারাতের সমস্ত আদব তো লিখতে পারিনি বরং বিক্ষিপ্তভাবে যেসব আদব আমার যেহেনে এসেছে, সেগুলোই এখানে জমা করে দিয়েছি। যাতে করে এই আদবগুলো পাঠ করার সময় আপনাআপনি পাঠকের মন এদিকে নিবদ্ধ হয় যে, যখন এটা আদবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাহলে অমুক স্থানেও আমাদের অনুরূপ করা উচিত। ধীরে ধীরে আমাদের মন-মানসিকতায় ঐ আদবগুলো বদ্ধমূল হবে।

উদাহরণ স্বরূপ: মুআশারাত বা সামাজিকতার একটি আদব হল: গাড়ী এমনভাবে রাখতে হবে, যদ্দরুন অন্য মানুষের চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে না যায়। এবং অন্য মানুষের কষ্ট না হয়। এটাও দ্বীনের একটা অংশ।

আজ আমরা এসব জিনিস ভুলে গেছি। এ কারণে আমরা স্রেফ গুনাহগার হচ্ছি তাই নয় বরং দ্বীনের ভুল প্রতিনিধিত্ব করছি। ফলশ্রুতিতে আমাকে দেখে বহিরাগত ব্যক্তি বলবে যে, এ লোক নামাযও পড়ে আবার মানুষের হকও নষ্ট করে!

এর দ্বারা ইসলামের কী চিত্র সামনে আসবে? এসব দেখে বিধর্মীরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে নাকি ইসলাম থেকে আরো দূরে সরে পড়বে? আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন।

বর্তমানে আমরা দ্বীনের উত্তম নমুনা পেশ করে মানুষের জন্য আকর্ষণের পরিবর্তে দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার উপলক্ষ হচ্ছি।

সামাজিকতার এই অধ্যায় আমরা বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছি। এই বিচ্যুতি থেকে মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্রুত নাজাত দান করুন। আমাদের বুঝকে সঠিক করে দিন। এবং আমাদেরকে দ্বীনের সকল শাখা-প্রশাখাসমূহের উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

৮১. মানুষের কাছ থেকে ভাল কিছু পাওয়ার আশা বাদ দিয়ে দিন

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. স্বীয় ওয়াযে দারুণ সুন্দর একটি কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন: দুনিয়াতে শান্তিতে থাকার শুধুমাত্র একটিই পথ। আর সেটা হল: মাখলূক থেকে কিছু পাওয়ার আশা খতম করে দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ: এই আশা রাখা যে, অমুক ব্যক্তি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। অমুক ব্যক্তি আমার কাজে আসবে। অমুক ব্যক্তি আমার দুঃখ-ব্যথায় শরীক হবে।

এই সমস্ত আশা খতম করে স্রেফ এক সত্তা মহান আল্লাহর থেকে পাওয়ার আশা রাখ। কেননা মাখলূকাতের কাছ থেকে আশা খতম করে দেয়ার পর যদি তাদের পক্ষ থেকে ভাল কিছু পাওয়া যায়। তাহলে সেটা হবে ধারণাতীত ব্যাপার। যদ্দরুণ আনন্দ অনেক বেশি হবে। আর যদি মাখলূকাতের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পৌঁছে, তাহলে বেশি কষ্ট লাগবে না। কেননা ভাল কিছুর আশা তো সে করেইনি। কষ্ট পাওয়ার আশাই করেছিল। এজন্য দুঃখ-কষ্ট বেশি হবে না।

৮২. এক বুযুর্গের ঘটনা

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. একজন বুযুর্গের ব্যাপারে লিখেছেন যে, তাঁকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করল: হযরত! কী অবস্থা? কেমন আছেন? তিনি উত্তরে বললেন: আলহামদুলিল্লাহ! খুব ভাল আছি। অতঃপর বললেন: মিঞা! আমার অবস্থা কী জিজ্ঞেস কর? এই জগতের কোন কাজ আমার মর্জির বিপরীত হয় না। বরং প্রতিটি কাজ আমার মর্জি মোতাবেক হয়। আর জগতের সমস্ত কাজ যার মর্জি মোতাবেক হয়, তার থেকে বেশি সুখী আর কে হতে পারে?

প্রশ্নকারী দারুণ হতবাক হলেন। তিনি বললেন: এই ব্যাপার তো নবী (আ:)গণেরও নসীব হয়নি যে, জগতের সকল কাজ তাঁদের মর্জি বা চাহিদা অনুযায়ী হবে। বরং তাঁদের মর্জির বিপরীতও কাজ হত। আপনার প্রতিটি কাজ আপনার মর্জি অনুযায়ী কিভাবে হয়? প্রতিউত্তরে ঐ বুযুর্গ বললেন: আমি আমার মর্জিকে মহান আল্লাহর মর্জির অনুগত বানিয়ে দিয়েছি। ব্যস, যেটা আমার আল্লাহর মর্জি, সেটাই আমার মর্জি। যেটা আমার মাওলার ইচ্ছা, সেটাই আমার ইচ্ছা। আর জানা কথাই যে, এ জগতের সমস্ত কাজ মহান আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী হচ্ছে। আমি আমার আমিত্বকে মিটিয়ে দিয়েছি। এজন্য প্রতিটি কাজ আমার মর্জি অনুযায়ী হচ্ছে। যেহেতু সেটা আল্লাহ পাকের মর্জিতেই হচ্ছে। এজন্য আমি খুব খুশী ও দারুণ আনন্দিত।

৮৩. এই গুনাহটি সাগীরাহ না কাবীরাহ?

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: লোকেরা খুব আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করে যে, অমুক গুনাহটি সাগীরাহ নাকি কাবীরাহ? অর্থাৎ ছোট গুনাহ নাকি বড় গুনাহ? জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি সাগীরাহ হয়, তাহলে করে ফেলব। আর যদি কাবীরাহ হয়, তাহলে সেটা করতে কিছুটা ভয় অনুভূত হবে।

হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলতেনঃ সাগীরাহ এবং কাবীরাহ গুনাহের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমনঃ আগুনের ছোট্ট একটি স্ফুলিঙ্গ আর বড় একটি অঙ্গার। আপনি কি কখনো কাউকে দেখেছেন যে, ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ সিন্দুকের মধ্যে রাখে? আর এটা ভাবে যে, আরে এটা তো ছোট্ট একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

কোন বিবেকবান মানুষ কখনো এমনটি করবে না। কেননা সিন্দুকে রাখার পর সেটা আগুন হয়ে যাবে। এবং সিন্দুকের ভিতরের যত জিনিস আছে, সব কিছুকে জ্বালিয়ে দিবে। হতে পারে পুরো ঘরকে জ্বালিয়ে দিবে।

এজন্য এ ফিকিরে পড়ো না যে, এটা ছোট গুনাহ নাকি বড় গুনাহ। বরং এটা দেখ যে, এটা গুনাহ কিনা? এই কাজটি নাজায়েয কিনা? আল্লাহ তাআলা এর থেকে নিষেধ করেছেন কিনা? যখন এটা জানা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহীর অনুভূতি সৃষ্টি করে এটা চিন্তা কর যে, এই গুনাহ করে আমি আল্লাহ তাআলাকে কিভাবে মুখ দেখাব?

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর ইরশাদাত বা বাণীসমূহ

১. কাজ করার চমৎকার গুঢ়তত্ত্ব

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলেনঃ যে কাজটিকে সুযোগের অপেক্ষায় উপেক্ষা করা হল, সেটা বাদ পড়ে গেল। এটা আর পরে হবে না। কেননা তুমি এটাকে উপেক্ষা করেছ। কাজ করার পদ্ধতি হল দুই কাজের মধ্যে তৃতীয় কাজটিকে ঢুকিয়ে দাও। অর্থাৎ যে দুটি কাজ তুমি পূর্ব থেকে করে আসছ, এখন তৃতীয় কাজ করার খেয়াল আসল, তাহলে ঐ দুই কাজের মাঝে তৃতীয় কাজটিকে জোর করে ঢুকিয়ে দাও। তৃতীয় কাজটিও হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এভাবে পরিকল্পনা করা যে, এ কাজটি হয়ে গেলে ঐ কাজটি করব। এগুলো হল এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষণ। শয়তান সাধারণতঃ এভাবেই মানুষকে ধোঁকার মধ্যে রাখে।

২. মাল-দৌলতের মাধ্যমে শান্তি ক্রয় করা যায় না

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলেনঃ শান্তি এক জিনিস, আর শান্তির উপকরণ থাকা আরেক জিনিস। শান্তির উপকরণ থাকলেই শান্তি লাভ হওয়া জরুরী নয়। শান্তি তো আল্লাহ পাকের দান। অথচ আজ আমরা শান্তির উপকরণের নাম শান্তি রেখে দিয়েছি। কারো নিকট অনেক টাকা-পয়সা আছে। তবে কি সে ক্ষুধার সময় সেগুলো খেয়ে ফেলবে? কাপড়ের প্রয়োজন হলে কি সে টাকা পরিধান করবে? গরম লাগলে কি ঐ টাকা তাকে ঠাণ্ডা পৌঁছাবে?

এই টাকা সরাসরি শান্তি নয়। আর এর মাধ্যমে আপনি শান্তি ক্রয় করতেও পারবেন না। আর যদি এর মাধ্যমে আপনি শান্তির উপকরণ ক্রয় করেও ফেলেন, উদাহরণ স্বরূপঃ আরামের জন্য আপনি এর মাধ্যমে

পানাহারের জিনিস ক্রয় করলেন, ভাল কাপড় ক্রয় করলেন, কিন্তু এর মাধ্যমেই কি শান্তি হাসিল হয়ে গেছে? মনে রেখ, শুধুমাত্র এই সব সামান জমা করলেই শান্তির সন্ধান পাওয়া জরুরী নয়। কেননা মনে করুন একজনের নিকট শান্তির সমস্ত উপকরণ আছে, কিন্তু এই সাহেব বাহাদুরের বড়ি খাওয়া ব্যতীত রাত্রে ঘুম আসে না। আরামদায়ক বিছানা। এয়ারকণ্ডিশণ্ড রুম। চাকর-নকর সবকিছু বিদ্যমান কিন্তু নিদ্রা আসছে না। এখন বলুন: শান্তির উপকরণ সবকিছু আছে। কিন্তু নিদ্রা পেল? শান্তি পেল?

পক্ষান্তরে আরেকজন মানুষ, যার মাথার উপর না আছে পাকা ছাদ, বরং টিনের চাল। খাটও নেই, মাটির উপর ঘুমায়। কিন্তু ব্যস মাথার নিচে একটি হাত রাখল আর সোজা ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল। এবং আট ঘন্টার ভরপুর নিদ্রা নিয়ে সকালে জাগ্রত হল। বলুন শান্তি কে পেল? এ ব্যক্তি? নাকি ঐ ব্যক্তি? এ ব্যক্তির নিকট শান্তির উপকরণ ছিল না। কিন্তু তবুও সে শান্তি পেয়ে গেছে।

মনে রাখবেন, যদি কেউ দুনিয়ার আসবাব জমা করার ফিকিরে লেগে যায়, অন্যের থেকে আগে বাড়ার চিন্তা তাকে পেয়ে বসে, তাহলে খুব বুঝে নিন যে, শান্তির উপকরণ একত্রিত হবে ঠিক, কিন্তু তারপরও শান্তি হাসিল হবে না।

৩. ঐ সম্পদ কোন্ কাজের যা সন্তানকে পিতার আকৃতি দেখাতে পারে না!!

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলেন: এক ব্যক্তি ছিলেন কোটি কোটি টাকার মালিক। তার ব্যবসা বাণিজ্য শুধু পাকিস্তানেই নয় বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনার সন্তান কয়জন? তিনি উত্তরে বললেন: এক ছেলে সিঙ্গাপুরে থাকে। আরেক ছেলে অমুক দেশে থাকে। সবাই দেশের বাইরে থাকে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম: আপনার সন্তানদের সাথে আপনার দেখা-সাক্ষাত হয় কি? তারা কি আসা-যাওয়া করে?

প্রতিউত্তরে তিনি বললেন: এক ছেলের সাথে দেখা হয়েছে পনের বছর হয়ে গেল। পনের বছর যাবত পিতা ছেলের আকৃতি দেখেনি। ছেলে পিতার আকৃতি দেখেনি। বলুন এ পয়সা কোন্ কাজের যা সন্তানকে পিতার আকৃতি দেখাতে পারে না? এই সমস্ত দৌড়ঝাপ হচ্ছে শান্তির উপকরণ লাভের জন্য। কিন্তু শান্তি নাই। এজন্য মনে রাখবেন: টাকা-পয়সার দ্বারা শান্তি ক্রয় করা যায় না।

৪. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর পবিত্র অভ্যাস

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. সবসময় মেহনতের দ্বারা অর্জিত আমদানীর বিশ ভাগের এক ভাগ আর মেহনতবিহীন আমদানীর দশ ভাগের এক ভাগ আলাদা খামে রেখে দিতেন। এটা তাঁর পুরো জীবনের অভ্যাস ছিল। যে কোন স্থান হতে এক টাকা আসলেও সঙ্গে সঙ্গে সেটার এক দশমাংশ বের করে ভাংতি করে ঐ খামে ভরে রাখতেন। একশত টাকা আসলে দশ টাকা রেখে দিতেন। সাময়িকভাবে যদিও এই আমলটি করতে কিছুটা কষ্ট হত, কেননা তাৎক্ষণিকভাবে ভাংতি টাকা পাওয়া দুষ্কর। এখন কী করা? এর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হত। কিন্তু জীবনে কখনো এই আমলের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। আর আমি ঐ থলে কখনো সারা জীবনেও খালী দেখিনি।

এই আমলের ফলাফল হয় এই যে, যখন মানুষ এভাবে টাকা বের করে পৃথক করতে থাকে, তখন ঐ থলে নিজেই স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে যে, আমাকে খরচ করুন। এবং কোন সঠিক খাতে লাগিয়ে দিন। এর বরকতে আল্লাহ তাআলা খরচ করার তাউফীক দান করেন।

৫. মৌলভীর শয়তানও মৌলভী

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলেন: মৌলভী মানুষের শয়তানও মৌলভী হয়। সাধারণ মানুষকে শয়তান একভাবে বিভ্রান্ত করে। আর যে শয়তান মৌলভী ছাহেবকে বিভ্রান্ত করে সে মৌলভী বনে বিভ্রান্ত করে।

ঐ আলেম এই আয়াতে কারীমার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করে যে, কুরআনে কারীমের মধ্যে এসেছে: “সুপারিশ করো।” কেননা সুপারিশ অনেক বড় নেকী ও সাওয়াবের কাজ। এজন্য আমি সুপারিশ নিয়ে এসেছি। খুব ভালভাবে বুঝে নিন যে, এই সুপারিশ জায়েয নেই।

৬. মাদরাসার মুহতামিম ছাহেবের নিজে চাঁদা সংগ্রহ করা

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলেন: অনেক সময় চাঁদা উসূল করার জন্য কোন বড় মাওলানা ছাহেবকে সাথে নেয়া হয়। অথবা

মাদরাসার মুহতামিম বা অধ্যক্ষ নিজেই চাঁদা উসূল করার জন্য কারো নিকট চলে গেলেন তো তাঁদের স্বশরীরে উপস্থিতিটাই একটা চাপ প্রয়োগ। কেননা মুখোমুখী ব্যক্তি এটা চিন্তা করবে যে, আরে বড় মাওলানা ছাহেব নিজে এসে গেছেন। এখন আমি কিভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি? ফলশ্রুতিতে মনে না চাইলেও তাঁকে চাঁদা দিয়ে দেয়। এভাবে চাঁদা উসূল করা জায়েয নেই।

৭. নিজের পরিবেশ নিজেই তৈরী করুন

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলেন: তোমরা বল যে, পরিবেশ খারাপ। সমাজ খারাপ। আরে! তোমরা নিজেদের পরিবেশ নিজেরাই বানিয়ে নাও। তোমাদের সম্পর্ক ঐসব মানুষদের সাথে হওয়া উচিত, যারা ঐসব মূলনীতির ক্ষেত্রে তোমাদের সমমনা। যেসব মানুষ ঐসব মূলনীতির ক্ষেত্রে তোমাদের সমমনা নয় তাদের পথ ভিন্ন। আর তোমাদের পথ ভিন্ন।

এজন্য নিজেদের বন্ধু-বান্ধবের এমন এক বৃত্ত তৈরী কর, যারা ঐসব বিষয়ে একে অপরের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকবে আর ঐসব মানুষের সাথে সম্পর্ক কমিয়ে ফেল, যারা এসব বিষয়ে তোমাদের পথের প্রতিবন্ধক।

৮. সোহাগিনী তো সেই প্রিয় মানুষ যাকে চায়

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. হিন্দী ভাষার একটি প্রবাদ খুব বেশি শোনাতেন। তিনি বলতেন :

سہاگن وہ جسے پیا چاہے

অর্থাৎ "সোহাগিনী তো সেই প্রিয় মানুষ যাকে চায় বা পসন্দ করে।"

ঘটনা হলো এই যে, একটি মেয়েকে নববধূ বানানো হচ্ছিল, তাকে সাজানো গুছানো হচ্ছিল। এখন যেই আসত সেই তার প্রশংসা করে বলত: তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। তোমার চেহারা এত সুন্দর, তোমার শরীর এত সুন্দর! তোমার অলংকার এত সুন্দর। তার এক একটি জিনিসের প্রশংসা করা হচ্ছিল। ঐ মেয়েটি প্রত্যেকের প্রশংসা শুনত। কিন্তু নীরব থাকত। কোন আনন্দ প্রকাশ করত না। সবাই তাকে বলল: আরে তোমার বান্ধবীরা তোমার এত প্রশংসা করছে। এতে কি তোমার মনে আনন্দ লাগছে না? ঐ মেয়েটি উত্তরে বলল: এদের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার কী আছে? কেননা এদের সব প্রশংসা বাতাসে উড়ে যাবে।

এই সাজানো তো তখনই স্বার্থক হবে, যখন যার জন্য আমাকে সাজানো হচ্ছে সে আমার প্রশংসা করবে। আমাকে পসন্দ করে বলবে: হ্যাঁ, তোমায় সুন্দর লাগছে। ফলশ্রুতিতে আমার জীবন সুখী হবে। পক্ষান্তরে যদি এসব মহিলা প্রশংসা করে চলে যায় আর যার জন্য আমাকে সাজানো হয়েছে সে পসন্দ না করে, তাহলে এই নববধূ হওয়া আর সাজ-গোজের কী স্বার্থকতা?

৯. কুদরতের কারখানায় কেউ খারাপ নয়

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. আল্লামা ইকবাল মরহুমের একটি কবিতা খুব বেশি পাঠ করতেন:

نہیں ہے چیز نکمّی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

অর্থাৎ "কোন যুগে কোন জিনিস অনর্থক নয়। কুদরতের কারখানায় কোন কিছুই খারাপ নয়।"

উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন নিজ হেকমত ও ইচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তবে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই হেকমত ও রহস্য দৃষ্টিগোচর হবে। কিন্তু হয় কি মানুষ শুধু খারাপ দিকগুলো দেখতে থাকে। ভালোর দিকে দৃষ্টিপাত করে না। এ কারণে সে অন্তর কালো করে অত্যাচার ও বেইনসাফীর পথ বেছে নেয়।

১০. আমীর হও তো এমন

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. একটি ঘটনা শোনাতেন যে, একবার আমরা দেওবন্দ থেকে অন্য কোন স্থানে সফরে যাচ্ছিলাম। তো আমাদের উস্তায হযরত মাওলানা ইযায আলী ছাহেব রহ. যিনি দারুল উলূম দেওবন্দে 'শাইখুল আদব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনিও আমাদের সাথে সফরে ছিলেন। আমরা যখন ষ্টেশনে পৌঁছলাম, তখন জানতে পারলাম যে, গাড়ী আসতে বিলম্ব হবে। মাওলানা ইযায আলী ছাহেব রহ. বললেন: হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: "তোমরা কোথাও সফরে গেলে কাউকে নিজেদের আমীর বানাবে।" কাজেই আমাদেরও আমীর বানানো উচিত। এদিকে হযরত শাইখুল আদব রহ. যেহেতু আমাদের উসতায ছিলেন। আর আমরা ছিলাম হযরতের ছাত্র, এজন্য আমরা বললাম যে: আমীর বানানোর কী প্রয়োজন, আমীর তো বানানোই আছে।

হযরত মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন : কে? আমরা বললাম: আমীর হলেন আপনি। কেননা আপনি উসতায। আর আমরা আপনার ছাত্র। হযরত মাওলানা বললেন: আচ্ছা, আপনারা আমাকে আমীর বানাতে চান? আমরা বললাম: জী, হ্যাঁ। আপনি ছাড়া আর কে আমীর হতে পারেন? হযরত মাওলানা বললেন: আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু আমীর ছাহেবের প্রতিটা নির্দেশ মানতে হবে। কেননা 'আমীর' শব্দের অর্থই হল: যার নির্দেশের অনুসরণ করা হয়।

আমরা বললাম: হযরত! আপনাকে যখন আমীর বানিয়েছি, তখন আপনার প্রতিটা নির্দেশ মান্য করব ইনশাআল্লাহ। হযরত মাওলানা বললেন: ঠিক আছে। আমি আমীর হলাম। আমার হুকুম মেনে চলবেন। যখন গাড়ী আসল। তখন হযরত শাইখুল আদব রহ. সমস্ত সাথীদের কিছু সামানা মাথায় আর কিছু সামানা হাতে উঠালেন। এবং চলা আরম্ভ করে দিলেন। আমরা বললাম: হযরত! আপনি একী করছেন? আমাদেরকে উঠাতে দিন। মাওলানা বললেন: না, যেহেতু আমীর বানিয়েছেন, সেহেতু আমার নির্দেশ মানতে হবে। আর এই সব সামানা আমাকে উঠাতে দিতে হবে। ফলশ্রুতিতে তিনি সব সামানা উঠিয়ে গাড়ীতে রাখলেন। অতঃপর পুরো সফরে যখনই কষ্টকর কোন কাজ আসত, তখন সেই কাজ নিজেই করতেন। আর যখনই আমরা কিছু বলতাম, তখনই সঙ্গে সঙ্গে বলতেন: দেখো! তোমরাই আমাকে আমীর বানিয়েছ। অতএব আমীরের নির্দেশ মানতে হবে। তাঁকে আমীর বানানো আমাদের জন্য কেয়ামত হয়ে গেছে। এই হল বাস্তব আমীরের প্রতিকৃতি।

১১. সুন্নাত ও বিদআতের চিত্তাকর্ষক উদাহরণ

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর নিকট হযরত শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. নামক জনৈক বুযুর্গ আগমন করতেন। তাবলীগ জামাআতের প্রসিদ্ধ আকাবিরের একজন। এবং বড় অদ্ভূত বুযুর্গ ছিলেন। একদিন তিনি এসে আমার আব্বাজান এর নিকট একটি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন বয়ান করলেন। বললেন যে, স্বপ্নে আপনাকে দেখেছি। আপনি ব্লাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আর আপনার পাশে কিছু লোক বসে আছে। তাঁদেরকে আপনি কিছু একটি পড়াচ্ছেন। হযরত আব্বাজান রহ. ব্লাকবোর্ডে চকের সাহায্যে (১) এক এর আকৃতি বানালেন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কি? লোকেরা উত্তর দিল: এটা এক,

অতঃপর তিনি ঐ এক আকৃতির ডান দিকে (১০) একটি শূন্য বসালেন। লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: এখন কী হয়েছে? লোকেরা বলল: এটা দশ হয়েছে। অতঃপর আরেকটি শূন্য বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: এখন কী হয়েছে? লোকেরা বলল: এখন একশত (১০০) হয়েছে। অতঃপর আরেকটি শূন্য বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন এখন কী হয়েছে? লোকেরা বলল: এখন এক হাজার (১০০০) হয়েছে।

অতঃপর বললেন: আমি যতই শূন্য বসাচ্ছি। ততই সেটা দশ গুণ বেড়ে যাচ্ছে। অতঃপর তিনি ঐসব শূন্য মুছে দিলেন। এবং একের পর এক বাম দিকে শূন্য বসালেন। যদ্দরুন কখনো হল একের দশমাংশ। কখনো একের শতমাংশ। কখনো একের সহস্রাংশ।

অতঃপর বললেন: এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বাম দিকের শূন্য এ সংখ্যাকে দশগুণ কম করে দিচ্ছে। অতঃপর বললেন: ডান দিকে যে বিন্দু লাগছে সেটা হল সুন্নাত। আর বাম দিকে যে বিন্দু লাগছে সেটা হল বিদআত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় বিন্দু একই রকম মনে হয়। কিন্তু যখন ডান দিকে লাগানো হচ্ছে, তখন হচ্ছে সুন্নাত। আর বাম দিকে যেটা লাগছে সেটা হচ্ছে বিদআত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাতলানো তরীকার সাথে যেটার মিল হবে সেটাই হবে সাওয়াবের উপলক্ষ। আর এর বিপরীত যেটা মানুষের আমল নষ্ট করে, সাওয়াব হ্রাস করে সেটাই হল বিদআত। সুন্নাত ও বিদআতের মধ্যে এই হল পার্থক্য।

ভাই! পুরো দ্বীন হল অনুসরণের নাম। যখন যে কাজের কথা বলা হয়েছে, তখন সে কাজ সুন্নাতে নববীর অনুসরণে করা হল সাওয়াবের উপলক্ষ। পক্ষান্তরে সেখান থেকে সরে গিয়ে নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে কাজ করলে কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

১২. হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি.-এর তাহাজ্জুদ নামায পড়া

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর একটি কথা মনে পড়ল। প্রসিদ্ধ ঘটনা, আপনারাও হয়ত শুনেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো রাত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) কে দেখার জন্য বের হতেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বের হলেন, তো হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-কে দেখলেন যে, তাহাজ্জুদ এর নামাযে খুব ক্ষীণকণ্ঠে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করছেন। সামনে অগ্রসর হওয়ার পর দেখলেন যে, হযরত উমর ফারূক (রাযি.) উচ্চস্বরে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করছেন।

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে ফিরে আসলেন। সকালে ফজরের নামাযের পর যখন হযরত আবু বকর (রাযি.) আসলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: রাত্রে আমি দেখলাম যে, তুমি নামাযে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করছ, এত ক্ষীণ কণ্ঠে তিলাওয়াত করছিলে কেন? হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) উত্তরে কত সুন্দর কথা বললেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি যাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলাম, তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। এজন্য আমার আওয়ায উঁচু করার প্রয়োজন নেই। যে সত্তাকে শোনানো উদ্দেশ্য তিনি তো শুনেছেন। সেটার জন্য তো উচ্চস্বরে হওয়ার কোন শর্ত নেই।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফারূকে আযম (রাযি.) কে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি এত জোরে কেন তিলাওয়াত করছিলে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন: ঘুমন্ত মানুষদেরকে জাগানোর জন্য এবং শয়তানকে তাড়ানোর জন্য।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) কে বললেন: "তুমি আরেকটু উচ্চস্বরে পড়বে।"

আর হযরত ফারূকে আযম (রাযি.)-কে বললেন যে, "তুমি তোমার আওয়াজকে আরেকটু কম করে দিবে।" (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ১৩২৯)

১৩. বেনিয়া থেকে সেয়ানা সুতরাং পাগল

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. হিন্দী ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য শোনাতেন। এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ। بنئے سے سیانا سو باؤلا বেনিয়া থেকে সেয়ানা অতএব পাগল!! অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আমি ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে ইংরেজ বেনিয়ার চেয়েও অধিক সেয়ানা এবং চতুর! তাদের থেকেও ব্যবসায়িক গুঢ়তত্ত্ব আমি বেশি বুঝি। তবে এ লোকটি পাগল ও উম্মাদ বৈ কিছুই নয়। কেননা বাস্তবিকপক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যে কেউ ইংরেজদের থেকে বেশি সেয়ানা হতে পারে না।

এ প্রবাদটি শোনানোর পর হযরত আব্বাজান রহ. বলতেন: যে ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আমি সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর চেয়েও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বড় আশেক। এবং তাঁদের চেয়েও বেশি মহব্বতকারী। বাস্তবে সে একটি পাগল, নির্বোধ, আহমক। কেননা সাহাবায়ে কেরামের থেকে বড় আশেক আর কেউ হতে পারে না।

১৪. দিল তো আছে ভাঙ্গার জন্য

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. একটি উদাহরণ দিতেন। এখন তো আর ঐ যুগ নেই, পূর্বের যুগে ইউনানী হেকিম হতেন। তারা পাউডার বানাতেন। স্বর্ণের পাউডার, রূপার পাউডার, সংখিয়ার পাউডার। আরো না জানি কি কি পাউডার বানাতেন। আর পাউডার বানানোর জন্য তারা স্বর্ণকে জ্বালাতেন। আর এত জ্বালাতেন যে, ঐ স্বর্ণ ছাই হয়ে যেত, এবং বলতেন যে, স্বর্ণকে যতবেশি জ্বালানো হবে তার শক্তি ততবেশি বাড়বে। এখন জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে যখন পাউডার তৈরী করল, তো ঐ পাউডার তৈরী হয়ে গেল। কেউ যদি সেটা সামান্য পরিমাণ খায়, তাহলে অনেক বেশি শক্তি চলে আসবে।

হযরতওয়ালা রহ. বলেন: প্রবৃত্তির তাড়নাগুলোকে যখন এভাবে ডলে ডলে পিষে পিষে ছাই বানিয়ে শেষ করে ফেলবে, তখন এটা পাউডার বনে যাবে। এর মধ্যে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের শক্তি এসে যাবে। এবং আল্লাহ তাআলার মহব্বত এসে যাবে। দিল তখন মহান আল্লাহর তাজাল্লীগাহ বনে যাবে। এই দিলকে যতই ভাঙ্গবে ততই সে মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় হবে। কবি বলেন:

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

অর্থাৎ তুমি এজন্য তাকে (দিল) বাঁচিয়ে রেখ না যে, এটা তো আয়না। বরং তুমি এটাকে যত ভাঙ্গবে ততই সে বানানেওয়ালার নজরে প্রিয় হতে থাকবে। কেননা বানানেওয়ালা তো তাকে এজন্যই বানিয়েছেন যে, এটাকে ভাঙ্গা হবে। তাঁর সন্তুষ্টির নিমিত্ত মনের কামনা বাসনাগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে। তখন সেটা কিসের থেকে কী হয়ে যাবে।

১৫. ওজনও কম আল্লাহও সন্তুষ্ট

এ বিষয়টি আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এবং আমার শাইখ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. থেকে কয়েকবার শুনেছি। ওয়াযের মধ্যেও পড়েছি। কিন্তু পরবর্তীকালে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রবন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। যাতে তিনি লিখেছিলেন: বর্তমানে লোকেরা নিজেদের শরীরের ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কেউ হয়ত রুটি খাওয়া ছেড়ে দেয়। কেউ দুপুরের খাওয়া বাদ দিয়ে দেয়। বর্তমান পরিভাষায় এটাকে "ডায়েটিং" বলা হয়। ইউরোপে এর ব্যাপক প্রচলন আছে। এসব জিনিস সেখানে মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে আছে। এর উদ্দেশ্য হল শরীরের ওজন কমানো। আর বিশেষত: মহিলাদের মধ্যে এর চর্চা আরো বেশি যে, ঔষধ সেবন করে করে ওজন হ্রাস করার চেষ্টা করে। অনেক সময় এ ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুও হয়। অতঃপর ঐ ডাক্তার সাহেব লিখেন যে, আমার নিকট ওজন কমানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি হল: মানুষ কোন সময়ের খানা স্বতন্ত্রভাবে ছেড়ে দিবে না। রুচিও কমিয়ে দিবে না। বরং সারাজীবন এই অভ্যাস বানিয়ে নিবে যে, যতটুকু ক্ষুধা তার থেকে সামান্য কম খেয়ে খানা খাওয়া বন্ধ করে দিবে।

এরপর ঐ ডাক্তার হুবহু এ কথাটিই লিখেছেন যে, যখন খানা খেতে খেতে মনের মধ্যে এ সংশয় সৃষ্টি হবে যে, আর খাব নাকি খাবনা...তখনই খানা খাওয়া বন্ধ করে দিবে। যে ব্যক্তি এ ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করবে, তার কখনো শরীর বেড়ে যাওয়ার এবং পাকস্থলী খারাপ হওয়ার অভিযোগ হবে না। আর না তার ডায়েটিং করার প্রয়োজন হবে।

এ কথাটিই হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কয়েক বছর পূর্বে লিখে দিয়েছেন। এখন আপনার ইচ্ছা। আপনি চাইলে ওজন কমানোর জন্য এর উপর আমল করতে পারেন। চাইলে আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশী করার জন্য এ পরামর্শের উপরও আমল করতে পারেন। কিন্তু যদি নফসের চিকিৎসা হিসেবে আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশী করার জন্য এ আমল করেন, তাহলে এ কাজে সাওয়াবও পাবেন এবং ওজনও কমে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি শুধু ওজন কমানোর জন্য এমনটি করেন তাহলে ওজন হয়ত কমবে ঠিকই কিন্তু কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

১৬. মেহমানদের সাথে কথা-বার্তা বলা সুন্নাত

আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর নিকট এক ব্যক্তি আসতেন। তিনি কথা অনেক বেশি বলতেন। যখনই আসতেন এদিক সেদিকের কথা-বার্তা আরম্ভ করে দিতেন। থামার কোন নামও নিতেন না।

আমাদের বড়দের প্রত্যেকের অভ্যাস এটাই ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি মেহমান হয়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতেন, তাহলে তার সম্মান করতেন। তার কথা শুনতেন। এবং যথাসম্ভব তাকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করতেন। একজন ব্যস্ত মানুষের জন্য এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। যাঁদের জীবন ব্যস্ততায় ঠাসা, তাঁরা জানেন এটা কত মুশকিল কাজ। কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, যখন কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা-বার্তা আরম্ভ করতেন, তখন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি থেকে অতক্ষণ পর্যন্ত মুখ ফিরাতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই মুখ ফিরিয়ে না নেয়। তার কথা শুনতে থাকতেন।

তাইতো হাদীসে পাকের শব্দ এমন حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আগন্তুক নিজেই ফিরে না যায়।

(শামায়িলে তিরমিযী: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিনয় অধ্যায়)

এটা অনেক কঠিন কাজ। কেননা অনেক মানুষ লম্বা কথা-বার্তা বলায় অভ্যস্ত থাকে। তাদের পুরো কথা পূর্ণ মনোযোগ সহ শোনা একটি বিরক্তিকর কাজ। কিন্তু প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের কারণে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের পন্থা এটাই ছিল যে, আগন্তুকদের কথা শুনতেন। তাঁদেরকে পরিতৃপ্ত করতেন।

১৭. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. একটি ঘটনা শুনিয়ে বলেন: ছেলেবেলায় যখন আমি ছোট শিশু ছিলাম, আমার এক ভাইয়ের সাথে খেলছিলাম। তখন হিন্দুস্তানের দেওবন্দে এ যুগের শিশুদের ন্যায় নতুন নতুন খেলা তো ছিল না এমনিতেই ছোট ছোট খেলা হত। এই নলখাগড়া এর পাতা দিয়ে ছোট পুরিয়া বানিয়ে শিশুরা খেলাধুলা করত। একটি শিশু নিজের পুরিয়া নিচের দিকে গড়িয়ে দিল। আরেকটি শিশুও গড়িয়ে দিল। যার

পুরিয়া প্রথমে পৌঁছে গেল সে জিতে গেল। আর সে অন্য শিশুর নিকট থেকে এক পুরিয়া নিয়ে নিত।

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলেন: একবার আমি এই খেলা আমার ভাইয়ের সাথে খেলছিলাম। অনেক পুরিয়া নিয়ে এসেছিলাম, আমার ভাইও নিয়ে এসেছিলেন। এখন যখন খেলা আরম্ভ করলাম, তো যখনই আমি আমার পুরিয়া গড়িয়ে দিচ্ছিলাম, সেটা পিছনে রয়ে যাচ্ছিল। আর ভাইয়ের পুরিয়া আগে বেড়ে যাচ্ছিল। আর প্রত্যেকবারই তিনি আমার থেকে একটি একটি পুরিয়া নিয়ে নিচ্ছিলেন। এমনকি আমি যত পুরিয়া নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো সব একটি একটি করে খতম হয়ে গেল। এখন আমার নিকট কোন পুরিয়া নেই। আর আমার ভাই যে পরিমাণ পুরিয়া নিয়ে এসেছিলেন তার নিকট এর দ্বিগুণ হয়ে গেল।

হযরতওয়ালা রহ. বলেন: যখন আমি সব পুরিয়া হারিয়ে ফেললাম, আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে যে, আমার এত বেশি কষ্ট হয়েছিল আর এত বেশি ক্রন্দন করেছিলাম যে, পরবর্তীতে এর চেয়ে বড় বড় ক্ষতির উপরও এমন কষ্ট হয়নি। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার দুনিয়া লুট হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে। এ ব্যথা ঐ সময় এত বেশি হয়েছিল যে, বড় কোন ভূ-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হলেও এত ব্যথা হত না।

আজকে আমি চিন্তা করি কিসের উপর কেঁদে ছিলাম। কিসের উপর মনে এত ব্যথা পেয়েছিলাম। এই সামান্য মূল্যহীন পাতার পুরিয়াগুলো হাত ছাড়া হওয়ার দরূন এত মনোকষ্ট হচ্ছিল। আজ এ ঘটনা মনে পড়লে হাসি পায়। কী পরিমাণ নির্বুদ্ধিতার ব্যাপার ছিল। এখন আমরা বুঝতে পারি যে, ঐ সময় আমরা নির্বোধ ছিলাম। ছিলাম শিশু। আকল ছিল না। কিন্তু এখন যেহেতু আকল হয়েছে তাই বুঝে আসে যে ঐসব পুরিয়াগুলো অন্তসারশূন্য ছিল।

বাস্তবিকপক্ষে এই টাকা-পয়সা এই বাংলো জায়গা-জমি, বাড়ী-গাড়ী এসব হল এমন মূল্যহীন বস্তু যেমন ঐ নলখাগড়ার পাতার তৈরী পুরিয়া। যখন আমরা মহান আল্লাহর কাছে চলে যাব, তখন এসবের বাস্তবতা বুঝে আসবে। প্রকৃত সম্পদ হল নেক আমল যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

১৮. অন্যের জুতা সোজা করা

এক ব্যক্তি হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর মজলিসে আসতেন। একদিন মুফতী ছাহেব দেখলেন যে, তিনি নিজ ইচ্ছায় মজলিসে

আগন্তুক ব্যক্তিদের জুতা সোজা করছেন। পরবর্তীতে উনি প্রতিবার এসে প্রথমে মজলিসে আগন্তুকদের জুতা সোজা করে মজলিসে বসতেন। মুফতী ছাহেব রহ. কয়েকদিন তাকে এ কাজ করতে দেখলেন। তো একদিন নিষেধ করে বললেন যে, এ কাজ করো না। পরবর্তীতে এর কারণ হিসেবে বললেন: আসল ব্যাপার ছিল এই যে, এই বেচারা মনে করেছিল আমার মধ্যে অহংকার আছে এবং ঐ অহংকারের চিকিৎসা নিজে নিজে ঠিক করে নিয়েছে যে, আমি মানুষদের জুতা সোজা করব। এর ফলে আমার অহংকার দূর হয়ে যাবে।

হযরত মুফতী ছাহেব রহ. বলেন: এ চিকিৎসার দ্বারা উপকারের পরিবর্তে তার আরো অপকার হত। কেননা যখন জুতা সোজা করা আরম্ভ করল, তখন তার মন মস্তিষ্কে এ কথা আসত যে, আমি তো নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছি! আমি তো চরম পর্যায়ের বিনয় অবলম্বন করেছি! এই জন্যই তো মানুষের জুতা সোজা করেছি। এর দ্বারা আরো বেশি খোদপসন্দী সৃষ্টি হত। এজন্য তাকে আটকে দেয়া হয়েছে যে, তোমার কাজ এটা নয়। তার জন্য অন্য চিকিৎসা ঠিক করা হয়।

এখন বাহ্যত: যদিও মনে হচ্ছে আহা! মানুষটি কতইনা বিনয়ী যে, অন্যের জুতা সোজা করছে। কিন্তু যারা জানার তারা জানে যে, এই কাজ বাস্তবিকপক্ষে অহংকার সৃষ্টি করছে। বিনয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং বুঝা গেল যে, মানুষের নফসের মধ্যে এমন এমন সূক্ষ্ম বিষয় আছে যে, মানুষ নিজে নিজে সেটা বুঝতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ রোগের বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন না হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এটা না বলবেন যে, তোমার এই আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে নাকি সীমারেখার বাইরে? সেই বিশেষজ্ঞ বুযুর্গই এটা বলতে পারবেন।

১৯. আমার আব্বাজান ও দুনিয়ার মহব্বত

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে শরীয়ত ও তরীকতের অসংখ্য নমূনা দেখিয়েছে। যদি আমরা সেগুলো না দেখতাম তাহলে আমাদের বুঝে আসত না যে, 'সুন্নাতী যিন্দেগী' কেমন হয়? তিনি দুনিয়ায় থেকে সব কাজ করেছেন। দরস ও তাদরীস করেছেন। ফতওয়া লিখেছেন। গ্রন্থ রচনা করেছেন। পীর, মুরীদীও তিনি করেছেন। আবার সাথে সাথে নিজ সন্তানদের

প্রতিপালনের জন্য তাঁদের হক আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসাও করেছেন। কিন্তু এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও আমি দেখেছি যে, তাঁর অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও দুনিয়ার মহব্বত প্রবেশ করেনি।

২০. দুনিয়া অপদস্থ হয়ে আসে

সারাজীবন হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এর অভ্যাস এই দেখেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের ব্যাপারে বিনা কারণে তাঁর সাথে ঝগড়া আরম্ভ করত, তো মুফতী ছাহেব যদিও হকের উপর থাকতেন কিন্তু সব সময় তাঁর এই অভ্যাস দেখেছি যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে বলতেন: আরে ভাই! ঝগড়া ছেড়ে দাও। এটা নিয়ে যাও। নিজের হক ছেড়ে দিতেন। "আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের ঘর দেওয়ার যিম্মাদার যে হকের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া ছেড়ে দেয়।"

হযরত মুফতী ছাহেব রহ.-কে সারাজীবন এই হাদীসের উপর আমল করতে দেখেছি। অনেক সময় আমাদের মনের মধ্যে এই খটকা সৃষ্টি হত যে, তিনি তো হকের উপর ছিলেন। পীড়াপীড়ি করলে পাওনাও পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি স্বীয় হক ছেড়ে পৃথক হয়ে যেতেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়া দান করেন। এমন মানুষদের কাছে দুনিয়া অপদস্থ হয়ে আসে। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে। "যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট দুনিয়াকে অপদস্থ করে উপস্থিত করেন।"

ঐ দুনিয়া তার আশেপাশেই থাকে, কিন্তু তার দিলে দুনিয়ার কোন মহব্বত থাকে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৪১৫৭)

২১. হযরত আব্বাজানের মজলিসে আমার উপস্থিতি

হযরত আব্বাজান রহ. এর মজলিস রবিবার দিন হত। কেননা ঐ সময় রবিবার সরকারী ছুটি ছিল। এটা শেষ মজলিসের ঘটনা। এরপর হযরত আব্বাজানের আর কোন মজলিস হয়নি। বরং পরবর্তী মজলিসের দিন আসার পূর্বেই আব্বাজানের ইন্তিকাল হয়ে যায়। যেহেতু আব্বাজান অসুস্থ ও শয্যাশায়ী ছিলেন। এজন্য তাঁর কামরাতেই লোকজন জমা হয়ে যেত। আব্বাজান চারপায়ীর উপর হতেন, লোকজন সামনে, নিচে এবং কার্পেটের উপর বসে পড়তেন। ঐদিন মানুষ অনেক বেশি এসেছিল। পুরো কামরা ভরে গিয়েছিল। এমনকি কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। এদিকে আমার উপস্থিত হতে বিলম্ব হয়েছিল। আমরা একটু দেরীতে পৌঁছলাম। হযরত আব্বাজান

রহ. যখন আমাকে দেখলেন তখন বললেন: তুমি এখানে আমার কাছে চলে আস। আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম যে, লোকদের কাঁধের উপর দিয়ে যাব। আর আব্বাজানের কাছে গিয়ে বসব। যদিও এ কথা মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল যে, বড় ব্যক্তি কোন কথা বললে সেটা মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু আমি কিছুটা সংকোচবোধ করছিলাম। আব্বাজান আমার সংকোচ দেখে দ্বিতীয়বার বললেন: তুমি এখানে এসে পড়। তোমাদেরকে একটি কিচ্ছা শুনাব। যাই হোক, আমি কোনভাবে সেখানে পৌঁছে গেলাম এবং আব্বাজানের কাছে গিয়ে বসলাম।

২২. হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর মজলিসে আব্বাজানের উপস্থিতি

আব্বাজান মরহুম বলতে লাগলেন: একবার হযরত থানভী রহ. এর মজলিস হচ্ছিল। আর সেখানে এধরনের পরিস্থিতিই হয়েছিল অর্থাৎ স্থান সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর আমি কিছুটা বিলম্বে পৌঁছেছিলাম। তখন হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. আমাকে বলেছিলেন: "তুমি এখানে আমার কাছে এসে পড়।" আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম যে, হযরতের একদম নিকটে গিয়ে বসব! তখন হযরতওয়ালা রহ. দ্বিতীয়বার বললেন: "তুমি এখানে এসে পড়। তারপর তোমাকে আমি একটি কিচ্ছা শোনাব।"

হযরত আব্বাজান রহ. বলেন: অতঃপর আমি কোনভাবে পৌঁছে গেলাম। আর হযরতওয়ালা থানভীর রহ. কাছে গিয়ে বসলাম।

২৩. এই গুনাহ বাস্তবিকপক্ষে আগুন

আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: আল্লাহ তাআলা এই যে কুরআনে কারীমে বলেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা তাহরীম, আয়াত : ৬)

এটা এমনভাবে বলা হচ্ছে যেমন সামনেই আগুন। অথচ ঐ সময় কোন আগুন প্রজ্বলিত নজরে আসেনি। বাস্তব কথা হল, যত গুনাহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এই সবগুলো বাস্তবে আগুন। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে এ গুনাহ সুস্বাদু ও মনোমুগ্ধকর মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এসব হল আগুন। আর এই দুনিয়া যা গুনাহে ভরপুর, এই গুনাহগুলোর কারণে জাহান্নাম বনে আছে।

কিন্তু বাস্তবে গুনাহ করতে করতে আমাদের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য গুনাহের অন্ধকার ও আগুন বুঝে আসে না। নতুবা যাদেরকে মহান আল্লাহ সহীহ অনুভূতি দান করেন এবং ঈমানের নূর দান করেন তাঁদের সামনে এই গুনাহ বাস্তব আগুনের আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়। অথবা অন্ধকারের আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়।

২৪. এই দুনিয়া গুনাহের আগুনে ভর্তি

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: এই দুনিয়া যা গুনাহের আগুনে ভর্তি, তার উদাহরণ ঠিক এরূপ যেমন কোন কামরায় গ্যাস ভরে গেছে। এখন ঐ গ্যাস বাস্তবে হল আগুন। শুধু দিয়াসলাই লাগাতে দেরী। মুহূর্তের মধ্যে পুরো কামরা আগুন হয়ে যাবে। তদ্রুপ এইসব গুনাহ ও বদ আমল যা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাস্তবে আগুন। শুধু একবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া বাকী। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন এই সমাজ আগুনের গ্রাসে পরিণত হবে। আমাদের এ বদ আমলগুলোও বাস্তবিকপক্ষে জাহান্নাম। এর থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবারের সদস্যদেরকেও বাঁচান।

২৫. দিলের সূচ হবে আল্লাহর দিকে

মুহতারাম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর একটি চিঠি দেখলাম। যা তিনি তাঁর শাইখ হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর নামে লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেন: "হযরত! আমি আমার দিলের এ কাইফিয়াত অনুভব করছি যে, যেমনিভাবে কম্পাসের কাটা সবসময় উত্তর দিকে থাকে। এমনিভাবে আমার দিলের এখন এ কাইফিয়াত হয়ে গেছে যে, চাই যেখানেই কাজ করি না কেন, মাদরাসায় থাকি বা বাসায়, দোকানে থাকি বা বাজারে কিন্তু এমন অনুভব করি যে, দিলের সূচ আছে থানাভবনের দিকে।"

এখন আমরা এই কাইফিয়াত ঐ সময় পর্যন্ত কী বুঝব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা দান না করেন। অবশ্য চেষ্টা ও মশকের দ্বারা এই জিনিস অর্জিত হয়। চলতে ফিরতে উঠতে বসতে মানুষ মহান আল্লাহর যিকির করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিতির ধ্যান খেয়াল মনের মধ্যে রাখবে। তাহলে পরে আস্তে আস্তে এই কাইফিয়াত হাসিল হবে যে, মুখের দ্বারা তো মানুষের সাথে কথা হবে কিন্তু হৃদয় এর সূচ

মহান আল্লাহর দিকেই নিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ কাইফিয়াত দান করুন। আমীন।

২৬. রাত মহান আল্লাহ মহান নেয়ামত

হযরতওয়ালা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন যে, এটার উপর চিন্তা কর যে মহান আল্লাহ নিদ্রার ব্যবস্থাপনা এমন বানিয়ে দিয়েছেন যে, সকলের একই সময়ে নিদ্রার ইচ্ছা হয়। নতুবা যদি এমন হত যে নিদ্রার ব্যাপারে প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেয়া হত যে, যখন ইচ্ছা ঘুমিয়ে পড়বে, তাহলে দেখা যেত যে কেউ ঘুমাতে চায় সকাল আটটায়। কেউ দুপুর বারটায়। আবার কেউ বিকেল চারটায়। তো এটার ফলাফল হত এই যে, কেউ হয়ত ঘুমানোর ইচ্ছা করত আবার কেউ করত কাজ করার ইচ্ছা। যদ্দরুন সে ঘুমন্ত ব্যক্তির মাথার সামনে খটখট করতে। এখন এ বেচারার ঠিকমত নিদ্রা আসতো না, আরাম লাভ হত না।

এজন্য মহান আল্লাহ সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপনা এমন বানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু, হিংস্র প্রাণী ও পাখীদের একই সময়ে নিদ্রা আসে। মুফতী ছাহেব রহ. বলতেন: একই মুহূর্তে ঘুমানোর জন্য কি কোন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল? আর সারা দুনিয়ার প্রতিনিধিদের ডেকে কি কোন পরামর্শ করা হয়েছিল যে, কোন্ সময় তারা ঘুমাবে?

যদি এ ব্যাপারটি মানুষের উপর ছাড়া হত, তাহলে এটা মানুষের সামর্থে থাকত না যে, তারা পুরো দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা এমনভাবে বানাবে যে, প্রতিটা মানুষ ঐ সময় ঘুমাবে। এজন্য মহান আল্লাহ আপন অনুগ্রহে প্রত্যেকের অন্তরে আপনা আপনি এ অনুভূতি ঢেলে দিয়েছেন যে, রাত্র হল ঘুমানোর সময়। এবং তাদের উপর নিদ্রাকে প্রবল করে দিয়েছেন। সবাই ঐ একই সময়ে ঘুমুচ্ছে।

এজন্যই কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا

অর্থাৎ "তিনি রাতকে বানিয়েছেন আরামের সময়।" (সূরা আনআম : ৯৬)

আর দিনকে বানিয়েছেন জীবিকা উপার্জন ও কারবারের জন্য। এজন্য এ নিদ্রা মহান আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। ব্যস কথা এতটুকুই যে, মহান আল্লাহর দানের মাধ্যমে উপকার লাভ করো। এবং এটাও একটু স্মরণ রেখো

যে, এই দান কার পক্ষ থেকে? তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো। এবং তাঁর সামনে উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত করো। এই হল ঐসব শিক্ষার সারকথা।

২৭. হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ.

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর একজন উস্তায ছিলেন হযরত মিঞাঁ সায়্যিদ আসগার হুসাইন ছাহেব রহ. অনেক উচুঁ পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত মিঞাঁ ছাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার আব্বাজান রহ. বলেন: একবার আমি হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং গিয়ে বসে পড়লাম। তখন হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. বলতে লাগলেন: দেখ ভাই মৌলভী শফী ছাহেব! আজ আমরা আরবীতে কথা বলব। উর্দূতে কথা বলব না।

আমার আব্বাজান মরহুম বলেন: আমি হতবাক হয়ে পড়লাম। ইতোপূর্বে কখনো এমন হয়নি। আজ বসে বসে আরবীতে কথা বলার খেয়াল কিভাবে আসল? আমি জিজ্ঞেস করলাম: হযরত! কারণ কি? হযরত বললেন: না এমনিই খেয়াল আসল যে, আরবীতে কথা বলব। যখন আমি খুব বেশি পীড়াপীড়ি করলাম, তখন বললেন: আসল ব্যাপার হল, আমি লক্ষ্য করেছি যখন আমরা উভয়ে বসি, তখন কথাবার্তা অনেক বেশি হয়। এদিক সেদিকের কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে যায়। এর পরিণতিতে অনেক সময় আমরা ভুল কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে পড়ি। আমার খেয়াল আসল যদি আমরা আরবীতে কথা বলার উদ্যোগ নেই, তো তুমিও সাচ্ছন্দ্যে আরবী বলতে পারনা আমিও পারি না, যদ্দরুন কিছুটা কসরত করেই আরবী বলতে হবে, ফলশ্রুতিতে এই যবান যা লাগামহীনভাবে চলছে, নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। অতঃপর বিনা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা হবে না। শুধু প্রয়োজনের কথা হবে।

২৮. যবানের উপর তালা লাগিয়ে দাও

জনৈক ব্যক্তি হযরত মুফতী শফী ছাহেব রহ. এর খেদমতে আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু কোন ইসলাহী বা আত্মশুদ্ধিমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেননি। ব্যস, এমনিই সাক্ষাতের জন্য আসতেন। আর যখন কথা আরম্ভ করতেন, তখন থামার নামও নিতেন না। একটি কিচ্ছা বয়ান করলেন। সেটা শেষ হল, আবার আরেকটি শোনানো শুরু করতেন। হযরত আব্বাজান রহ. সহ্য করতে থাকতেন। একদিন তিনি আব্বাজান রহ. এর নিকট দরখাস্ত

করেন যে, আমি আপনার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক করতে আগ্রহী। হযরত আব্বাজান সেটা কবূল করলেন এবং অনুমতি দিয়ে দিলেন।

পরবর্তীতে তিনি বললেন যে, হযরত! আমাকে পড়ার জন্য কোন ওযীফা দান করুন। আমি কী পড়ব? আব্বাজান রহ. বললেন: তোমার ওযীফা একটিই। আর সেটা হল যবানে তালা লাগানো। আর এই যবান যেটা সব সময় চলতে থাকে সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। তোমার জন্য আর কোন ওযীফা নেই। ফলে তিনি যবানকে নিয়ন্ত্রণ করলেন এর মাধ্যমেই তাঁর ইসলাহ তথা সংশোধন হয়ে গেছে।

২৯. যৌথ কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বড়র দিকে করা চাই

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর অভ্যাস ছিল, দৈনিক যখন কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করতেন, তখন তিলাওয়াত এর সময়েই কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কখনো কখনো আমাদের মধ্যে কেউ বা হযরতের খাদেমদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকলে তিলাওয়াতের মুহূর্তে যে কথাটি মনের মধ্যে আসত, সেটার ব্যাপারে তার সামনে কথাও বলতেন।

একদিন হযরত আব্বাজান রহ. কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করছিলেন। আমি নিকটেই বসা ছিলাম। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

অর্থাৎ "ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন ইবরাহীম (আ:) বাইতুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং ইসমাঈলও।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৭)

তখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে আমাকে বললেন: দেখ কুরআনে কারীমের এই আয়াতে মহান আল্লাহ অদ্ভূত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ তাআলা এভাবেও বলতে পারতেন:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ مِنَ الْبَيْتِ

অর্থাৎ ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল উভয়েই বাইতুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করেননি বরং প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর নাম নিয়ে বাক্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত ইসমাঈল (আ:) এর নাম বাক্যের শেষে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। আব্বাজান রহ. বলেন: হযরত ইসমাঈলও

(আ:) বাইতুল্লাহ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ:) এর সাথে এই আমলে বরাবর শরীক ছিলেন। পাথর উঠিয়ে আনছিলেন। এবং হযরত ইবরাহীম (আ:)-কে দিচ্ছিলেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ:) ঐ পাথরগুলো দিয়ে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করছিলেন।

কিন্তু এতদসত্বেও কুরআনে কারীম এই নির্মাণের সম্বন্ধ সরাসরি হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর দিকে করেছে। অতঃপর হযরত আব্বাজান রহ. বলেন: আসল কথা হল, যদি বড় ও ছোট উভয়ে মিলে কোন একটি কাজ আঞ্জাম দেয়, তো আদবের চাহিদা হচ্ছে এই যে, ঐ কাজটিকে বড়র দিকে সম্বন্ধ করা হবে। আর এর পাশাপাশি ছোটর কথা এভাবে উল্লেখ করা হবে যে, ছোটও তাঁর সাথে উপস্থিত ছিল।

এমনটি নয় যে, ছোট ও বড় উভয়কে সমমর্যাদাসম্পন্ন ঘোষণা করে উভয়ের দিকে এই কাজকে সমানভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে।

৩০. হযরত উমর (রাযি:) ও আদব

এ ব্যাপারটিকেই হযরত আব্বাজান রহ. আরেকটি ঘটনার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন: হাদীসে পাকে এসেছে, হযরত উমর (রাযি:) বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাধারণ অভ্যাস তো এই ছিল যে, ইশার নামাযের পর অন্য কোন কাজে লিপ্ত হতেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইশার নামাযের পর গল্প-গুজবে এবং অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া অনুচিত। যাতে সকালের নামাযের উপর চাপ না পড়ে।"

তবে এর সাথে সাথেই হযরত ফারূকে আযম (রাযি:) বলেন: "কখনো কখানো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি:) এর সাথে মুসলমানদের ব্যাপারে পরামর্শ করতেন। আর আমিও তাঁদের সাথে থাকতাম।"

দেখুন! যখন হযরত ফারূকে আযম (রাযি:) এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন তখন এ কথা বলেননি যে, আমার সাথে এবং আবু বকর (রাযি:) এর সাথে পরামর্শ করতেন আর আমিও তাঁদের সঙ্গে থাকতাম।

এই হল ছোট ব্যক্তির আদব। যখন ছোট ব্যক্তি বড় ব্যক্তির সাথে কোন কাজ করবে, তখন সে কাজের সম্বন্ধ নিজের দিকে না করে বড় মানুষের

দিকে করবে যে বড় মানুষ এই কাজ করেছেন। আর আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। এজন্যই কুরআনে কারীমে এই ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ:) বাইতুল্লাহর ভিত্তি উচুঁ করছিলেন আর হযরত ইসমাঈলও (আ:) তাঁর সাথে ছিলেন।

এ আয়াতে কারীমায় বাইতুল্লাহ নির্মাণের মূল সম্বন্ধ হযরত ইবরাহীম (আ:) এর দিকে করা হয়েছে এবং হযরত ইসমাঈল (আ:) কে তাঁর সাথে শামিল করা হয়েছে।

৩১. মালাকুল মউতের সাথে কথোপকথন

আমি আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. থেকে একটি ঘটনা শুনেছি। সেটা হচ্ছে এই: জনৈক ব্যক্তির মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা হযরত ইযরাঈল (আ:) এর সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তি অভিযোগ করে বলল যে, আপনার ব্যবহার বড় অদ্ভূত। দুনিয়াতে যদি কাউকে গ্রেফতার করা হয়, তাহলে দুনিয়ার আদালতের নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে তার নিকট নোটিশ পাঠায় যে, তোমার বিরুদ্ধে এই মোকাদ্দামা দায়ের করা হয়েছে, তুমি এর জবাব দিহীতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কিন্তু আপনার আচরণ বড় অদ্ভূত। যখনই চান বিনা নোটিশে এসে পড়েন আর রূহ কবয করে ফেলেন। এটা কেমন আচরণ?

প্রতিউত্তরে মালাকুল মউত (আ:) বললেন: আমি তো এত নোটিশ পাঠাই যে, দুনিয়াতে কেউ এত নোটিশ পাঠায় না। কিন্তু আমি কী করব? তোমরা তো আমার নোটিশকে নোটিশ হিসেবেই নাওনা। এটার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না। আরে যখন তোমার জ্বর আসে সেটা কি আমার নোটিশ হয় না? যখন তুমি অসুস্থ হও সেটা আমার নোটিশ। যখন তোমার চুল সাদা হয়ে যায় সেটা আমার নোটিশ। তোমার নাতি-নাতনী হয় সেটাও আমার নোটিশ। আমি তো এত নোটিশ পাঠাই যে, সেগুলোর কোন সীমা ও হিসাব নেই। কিন্তু তোমরা এগুলোকে কোন পাত্তাই দাও না।

এজন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং ব্যস্ততার পূর্বে অবসর মুহূর্তকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন আগামীতে কী জগত সামনে আসবে?

৩২. হযরত মুফতী শফী ছাহেব রহ. এবং সময়ের মূল্য

হযরত মুফতী শফী ছাহেব রহ. বলতেন যে, আমি আমার সময়কে খুব হিসেব করে খরচ করি। যাতে করে কোন মুহূর্ত বেকার না যায়। হয়ত দ্বীনের কাজে ব্যয় হবে। অথবা দুনিয়ার কাজে। আর দুনিয়ার কাজেও যদি নিয়্যত ঠিক থাকে, তাহলে সেটাও শেষ পর্যন্ত দ্বীনের কাজই হয়ে যায়। আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করত: বলতেন যে, কথাটা তো কিছুটা শরমের। কিন্তু তোমাদেরকে বুঝানোর জন্য বলছি। যখন মানুষ বাইতুল খালায় বসা থাকে, তো ঐ সময়টা তো এমন যে, তখন মানুষ যিকির করতে পারে না, কেননা তখন যিকির করা নিষেধ। আর না অন্য কোন কাজ করতে পারে। আর আমার মন-মানসিকতা এমন হয়ে গেছে যে, যে সময়টা সেখানে বেকার অতিবাহিত হয়, সেটা খুব কষ্টকর মনে হয়। কেননা তখন কোন কাজ হচ্ছে না। এজন্য ঐসময় আমি বাইতুল খালার বদনা ধৌত করি। যাতে এ সময়টাও কোন একটি কাজে লেগে যায়। আর যাতে করে পরবর্তীতে যে এ বদনা ব্যবহার করবে তার কাছে এটা খারাপ মনে না হয়।

হযরত আরো বলতেন: প্রথমে আমি চিন্তা করে নেই যে, অমুক সময় আমি পাঁচ মিনিট সময় পাব। এই পাঁচ মিনিটে কী কাজ করব?

অথবা খানা খাওয়ার পরপরই পড়া-লেখা করা সমীচীন নয়। বরং দশ মিনিটের বিরতি থাকা চাই। এজন্য আমি পূর্বেই চিন্তা করে রাখি যে, খানার পরে দশ মিনিট অমুক কাজে ব্যয় করব। ফলে ঐ সময় ঐ কাজটি করে ফেলি।

যারা আমার আব্বাজানের রহ. সাথে সাক্ষাত করেছেন, তারা দেখে থাকবেন যে, তিনি গাড়ীতে সফরও করছেন এবং তাঁর কলমও চলছে। বরং আমি তো তাঁকে সফর অবস্থায় রিক্সার মধ্যেও লিখতে দেখেছি। যার মধ্যে ঝাঁকুনি অনেক বেশি লাগে।

আরেকটা কথা অত্যন্ত মূল্যবান যা তিনি বলতেন: সেটা হল দেখো! যে কাজকে সুযোগের অপেক্ষায় রেখে দেয়া হয়, সেটা আর হয়ে উঠে না। কাজ করার রাস্তা হল এই যে, দুই কাজের মধ্যে তৃতীয় কাজকে জোর করে ঢুকিয়ে দাও, তাহলে ঐ কাজ হয়ে যাবে।

৩৩. কবর থেকে আওয়ায আসছে

আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর একটি কবিতা পাঠ করার যোগ্য। যা বাস্তবিকপক্ষে হযরত আলী (রাযি:) এর কথা থেকে গৃহীত। ঐ কবিতার শিরোনাম হল 'কবরের আওয়ায' কেমন যেন কবি সুলভ একটি কল্পনা। কেউ কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তো ঐ কবরওয়ালা পথচারীকে আওয়ায দিচ্ছে। ঐ কবিতাটা আরম্ভ করেছেন এভাবে:

مقبرے پر گزرنے والے سن
ٹھر، ہم پر گزرنے والے سن
ہم بھی اک دن زمیں پہ چلتے تھے
باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے

কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী শোনো, থামো, আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী শোনো, আমরাও একদিন পৃথিবীতে চলাফেরা করতাম কথায় কথায় আমরা ফূর্তি করতাম।

একথাগুলোর মাধ্যমে কবর অবস্থার ভাষায় নিজ বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে যে, আমিও এক সময় এ পৃথিবীর সদস্য ছিলাম। তোমাদের মত পানাহার করতাম। কিন্তু সারাজীবন আমরা যা কিছু উপার্জন করেছি, সেখান থেকে এক বিন্দুও আমাদের সাথে আসেনি। আর মহান আল্লাহর অনুগ্রহে যতটুকু নেক আমলের তাউফীক হয়েছে সেটাই সাথে এসেছে। এছাড়া আর অন্য কিছু সাথে আসেনি।

এজন্য কবর পথচারীকে উপদেশ দিচ্ছে যে, আজ এই হল আমাদের অবস্থা যে, আমরা চাতকপাখীর ন্যায় অপেক্ষায় থাকি যে, আহা! কতইনা ভাল হত যদি আল্লাহর কোন বান্দা আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঈসালে সাওয়াব করত।

৩৪. যাপিত জীবনের উপর শোকগাঁথা

আমার আব্বাজান রহ. নিজ জীবনের ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সারাজীবন এর উপর আমল করেছেন যে, যখন জীবনের কয়েকটি বছর পার হত, তখন একটি শোকগাঁথা বলতেন। সাধারণত: মানুষের ইন্তিকালের পর

তার শোকগাঁথা পাঠ করা হয়। কিন্তু আমার আব্বাজান রহ. নিজের শোকগাঁথা নিজেই বলতেন। আর এর নাম রাখতেন مرثیہ عمر رفتہ অর্থাৎ "যাপিত জীবনের শোকগাঁথা"।

যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝ দান করেন, তাহলে এ কথা বুঝে আসবে যে, এটাই বাস্তব সত্য যে, যে সময়টি অতীত হয়ে গেছে, সেটা আর ফিরে আসবে না। এজন্য এর উপর আনন্দিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই বরং আগামীর জন্য চিন্তার ব্যাপার যে, জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তগুলো কিভাবে কাজে লাগানো যায়।

বর্তমানে আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি মূল্যহীন জিনিস হল 'সময়'। এটাকে যেখানে সেখানে অপচয় করা হয়। ঘন্টা, দিন, মাস অনর্থক কাজ ও বেহুদা কথাবার্তায় নষ্ট হচ্ছে। যার মধ্যে না আছে দুনিয়ার উপকার না দ্বীনের উপকার।

৩৫. জনৈক ব্যবসায়ীর অদ্ভূত ক্ষতি

আমার আব্বাজান রহ. এর নিকট একজন ব্যবসায়ী আসতেন। তার অনেক বড় ব্যবসা ছিল। একবার তিনি এসে বলতে লাগলেন যে, হযরত! কী আরয করব? কোন দু'আ করে দিন। মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেছে। আব্বাজান রহ. বললেন: একটু ব্যাখ্যা করে বলুন যে, কোন্ ধরনের ক্ষতি হয়েছে? কিভাবে হয়েছে? যখন তিনি এই ক্ষতির বিবরণ দিলেন তখন বুঝা গেল যে, কোটি টাকার একটা লাভ হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি। নতুবা এর পূর্বে লক্ষ লক্ষ টাকার যে লাভ পূর্ব থেকে আসছিল, সেটা এখনো আসছে। এর মধ্যে কোন কমতি হয়নি। শুধু একটি লাভ যা হওয়ার ছিল সেটা হয়নি। সেটা না হওয়ার প্রেক্ষিতে বলছেন যে, এটা মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেল।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আমার আব্বাজান রহ. বলেন: কতইনা ভাল হত যদি এই ফিকির তার দ্বীনের ব্যাপারেও থাকত।

৩৬. দস্তরখান ঝাড়ার সঠিক পদ্ধতি

আমার আব্বাজানের দারুল উলূম দেওবন্দে একজন উস্তায ছিলেন। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসগার হুসাইন দেওবন্দী রহ. যিনি "হযরত

মিঞাঁ ছাহেব" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক উচুঁ পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর কথা শুনে সাহাবায়ে কেরামের (রাযিঃ) যুগের স্মরণ তাজা হয়ে যায়।

আব্বাজান রহ. বলেন: একবার আমি তাঁর খিদমতে গেলাম। তখন তিনি বলেন: খানার সময় হয়ে গেছে। আসো খানা খাও। আমি তাঁর সাথে খানা খেতে বসে গেলাম। খানা থেকে ফারেগ হওয়ার পর আমি দস্তরখান গুটানো আরম্ভ করলাম। যাতে আমি দস্তরখান ঝাড়তে পারি। তো হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. আমার হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন: কী করছ? আমি বললাম: হযরত! দস্তরখান ঝাড়তে যাচ্ছি। হযরত মিঞাঁ ছাহেব জিজ্ঞেস করলেন: তুমি দস্তরখান ঝাড়তে পার? আমি বললাম: হযরত! দস্তরখান ঝাড়া কোন্ শাস্ত্র বা বিদ্যা যার জন্য নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার প্রয়োজন হবে? বাইরে গিয়ে ঝেড়ে দিব। হযরত মিঞাঁ ছাহেব রহ. বললেন: এজন্যই তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: তুমি দস্তরখান ঝাড়তে পার কিনা? বুঝা গেল যে, তুমি দস্তরখান ঝাড়তে পারনা? আমি বললাম: তাহলে আপনি শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: হ্যাঁ দস্তরখান ঝাড়াও একটি শাস্ত্র।

অতঃপর তিনি ঐ দস্তরখানকে পুনরায় খুললেন। আর ঐ দস্তরখানে গোশত বা গোশতের যে টুকরো ছিল সেগুলোকে একদিকে করলেন। আর ঐসব হাড্ডি যার উপর কিছু গোশত লেগে ছিল সেগুলোকে একদিকে করলেন। রুটির টুকরোগুলো এক পাশে রাখলেন। আর রুটির অতি ক্ষুদ্র অংশগুলোকে একত্রিত করলেন। অতঃপর আমাকে বললেন যে, দেখ! এই চারটি জিনিস। আর আমার এখানে এই চারটি জিনিসের পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারিত আছে। এই যে গোশতগুলো এর জন্য হল অমুক স্থান, বিড়াল জানে খাওয়ার পর ঐস্থানে গোশত রাখা হয়। ও এসে এগুলো খেয়ে নেয়। আর এই সব হাড্ডির জন্য অমুক স্থান নির্ধারিত, মহল্লার কুকুরগুলো ঐস্থানটি সম্পর্কে অবগত। ওরা এসে এগুলো খেয়ে ফেলে। আর এই যে রুটির টুকরোগুলো, এগুলো আমি ঐ দেয়ালের উপর রাখি। এখানে বিভিন্ন পাখী, চিল ও কাক আসে। ওরা এগুলো উঠিয়ে খেয়ে ফেলে। আর এই রুটির অতিক্ষুদ্র অংশগুলো এগুলোর স্থানও নির্ধারিত আছে। পিঁপড়া এগুলোকে খেয়ে ফেলে।

অতঃপর বললেন যে, এসব হল মহান আল্লাহর রিয্ক। এর কোন অংশ নষ্ট করা উচিত নয়। আমার আব্বাজান রহ. বলতেন: ঐদিন আমি বুঝতে পারলাম যে, দস্তরখান ঝাড়াও একটি শাস্ত্র। এবং এটাও শেখা দরকার।

৩৭. হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এবং রাওযায়ে আকদাসের যিয়ারত

আমার আব্বাজান যখন রাওযায়ে আকদাসে উপস্থিত হতেন, তখন কখনো রাওযায়ে আকদাসের জালী পর্যন্ত পৌঁছতেই পারতেন না, বরং সবসময় এটা দেখেছি যে, জালীর সামনে একটি স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভের সাথে লেগে দাঁড়িয়ে যেতেন। জালীর একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন না। বরং সেখানে যদি কেউ দাঁড়ানো থাকত, তাহলে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন।

একদিন নিজেই বলতে লাগলেন। একবার আমার অন্তরে এই খেয়াল সৃষ্টি হল যে, সম্ভবত: তুমি অত্যন্ত হতভাগা ব্যক্তি। আল্লাহর এই সব বান্দা জালীর কাছাকছি পৌঁছে যায় এবং নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। আর দোজাহানের সরদার জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যতই নৈকট্য অর্জিত হবে সেটা নেয়ামতই নেয়ামত। কিন্তু আমি কী করব? আমার কদম যে আগেই বাড়ে না। সম্ভবত: এটা আমার অন্তরের খারাবীর পরিণাম। হযরত বলেন: সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিলে এই খেয়াল পয়দা হল। কিন্তু এরপর সঙ্গে সঙ্গে এটা অনুভব হল কেমন যেন রাওযায়ে আকদাস থেকে এ আওয়ায আসছে যে, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করে, সে আমার নিকটবর্তী। চাই হাজারো মাইল দূরেই থাকুক না কেন। আর যে আমার সুন্নাতের উপর আমল করে না, সে আমার থেকে দূরে। চাই সে আমার রাওযার জালীর সাথে লেপ্টে থাকুক"।

৩৮. ট্রেনে নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত অংশ দখল করা জায়েয নেই

একবার আব্বাজান হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এই মাসআলা বয়ান করলেন যে, তোমরা ট্রেনে ভ্রমণ করে থাকো। তোমরা বগির মধ্যে এটা লেখা দেখবে যে, এই বগিতে ২২জন মুসাফিরের বসার অবকাশ আছে। এখন আপনি প্রথমেই গিয়ে তিন চারটি আসন দখল করে বসলেন। আর এর উপর বিছানা লাগিয়ে শুয়ে পড়লেন। যার ফলাফল হল এই যে, অন্য আরোহীদের বসার আসন মিলল না। এখন তারা দাঁড়িয়ে আছে। আর আপনি শুয়ে আছেন। এটাও নাজায়েয। এর কারণ হল, আপনার হক তো ছিল শ্রেফ ১টি আসনে বসে পড়া। কিন্তু যখন আপনি কয়েকটি আসন দখল করলেন এবং অন্যদের হক নষ্ট করলেন তো এ আমলের মাধ্যমে আপনি

দুটি গুনাহ করলেন। একটি হল যেহেতু আপনি শ্রেফ একটি আসনের টিকেট ক্রয় করেছিলেন, অতঃপর যখন আপনি এর চেয়ে বেশি আসন দখল করলেন তাহলে এর অর্থ হল এটাই যে, আপনি আপনার ন্যায্য হকের চেয়েও অধিক অংশ কব্জা করলেন। আর দ্বিতীয় গুনাহটি এই করলেন যে, অন্য মুসলমান ভাইয়ের আসন দখল করলেন এবং তার হক নষ্ট করলেন। এভাবে এ আমলের মাধ্যমে দুটি গুনাহে লিপ্ত হলেন। প্রথম গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহর হক নষ্ট হল, আর দ্বিতীয় গুনাহের মাধ্যমে বান্দার হক পদদলিত হল।

৩৯. যমযম এবং উযুর বেঁচে যাওয়া পানি বসে পান করাই উত্তম

আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর তাহকীক এটাই ছিল যে, যমযমের পানি বসে পান করাই উত্তম। অনুরূপভাবে উযু করার পর রয়ে যাওয়া পানিও বসে পান করা উত্তম।

অবশ্য ওযর বা অপারগতা থাকলে যেমনিভাবে সাধারণ পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয, যমযম বা উযুর অবশিষ্ট পানিও দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয। এজন্য এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে দাঁড়িয়ে পান করার প্রয়োজন নেই। বরং বসে পান করা উচিত। এটাই উত্তম।

৪০. ডাল এবং শুকনো চাউলের নূরানিয়ত

আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. থেকে একাধিকবার এই ঘটনাটি শুনেছি যে, দেওবন্দে একজন 'ঘাসিয়ারে' ছিলেন। অর্থাৎ ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করতেন। এবং এর মাধ্যমে নিজ জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রতি সপ্তাহে তাঁর আমদানী ছিল ছয় পয়সা। একা মানুষ ছিলেন। এই আমদানীকে তিনি এভাবে বন্টন করতেন যে, এর মধ্য হতে দুই পয়সা নিজ খানা ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যয় করতেন। আর দুই পয়সা আল্লাহর পথে খরচ করতেন। আর দুই পয়সা জমা করতেন। আর এক দুই মাস পর যখন কিছু পয়সা জমা হয়ে যেত, তো ঐ সময় দারুল উলূম দেওবন্দের যারা শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক ছিলেন তাঁদেরকে দাওয়াত করতেন। আর দাওয়াতে শুকনো চাউল ডাল রান্না করতেন। উস্তাযদেরকে খাওয়াতেন।

আমার আব্বাজান রহ. বলতেন: তদানীন্তন সময়ে দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুদাররিস বা প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ

ইয়াকূব নানূতভী রহ. বলতেন যে, "আমরা পুরো মাস ঐ লোকটির দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। কেননা তাঁর শুকনো চাউল ও ডালের দাওয়াতে যে নূরানিয়াত অনুভূত হত, সেই নূরানিয়াত পোলাও এবং বিরিয়ানীর বড় বড় দাওয়াতেও অনুভূত হয় না।"

৪১. মেযবানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: কোন মুসলমানকে নিজ কথা বা কাজের দ্বারা কষ্ট পৌঁছানো কবীরা গোনাহ। যেমন মদ পান করা, চুরি করা, ব্যভিচার করা কবীরা গুনাহ। এজন্য যদি তুমি তোমার কোন আমল দ্বারা মেযবানকে কষ্ট দাও, তাহলে এটা কবীরা গুনাহ হবে।

৪২. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এবং বিনয়

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. এঘটনা শুনিয়েছেন যে, আমি একবার রাবসান রোডের চিকিৎসালয়ে বসা ছিলাম। ঐ সময় হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. চিকিৎসালয়ের সামনে দিয়ে এমনভাবে হেঁটে গেলেন যে, না তাঁর ডান পাশে কোন মানুষ ছিল, না বাম পাশে। ব্যস, একা একা যাচ্ছিলেন। আর হাতে কোন পাত্র ধরা ছিলেন। হযরত ডা: ছাহেব রহ. বলেন: ঐ সময় কিছু মানুষ আমার পাশে বসা ছিলেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনারা কি জানেন এই ব্যক্তিটি কে? অতঃপর নিজেই উত্তর দিলেন: আপনারা কি ধারণা করতে পারছেন যে, ইনি পাকিস্তানের "মুফতীয়ে আযম"? যিনি হাতের মধ্যে পাত্র নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ চলা-ফেরা দ্বারা কেউ আন্দাজও করতে পারবে না যে, তিনি এত বড় আলেম!!

৪৩. হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এবং সুসংবাদ প্রদানকারী স্বপ্নসমূহ

আমার আব্বাজানের ব্যাপারে অনেক মানুষ স্বপ্নে দেখেছেন। উদাহরণ স্বরূপ: স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার আব্বার আকৃতিতে দেখেছেন। এটা এবং এ জাতীয় অন্য স্বপ্ন অসংখ্য মানুষ দেখেছেন। ফলশ্রুতিতে যখন মানুষ এ জাতীয় স্বপ্ন লিখে পাঠাত, তখন আব্বাজান

এগুলো নিজের নিকট সংরক্ষণ করতেন। এবং একটি রেজিস্টার যার উপর শিরোনাম দেয়া ছিল مُبَشِّرَات অর্থাৎ সুসংবাদ প্রদানকারী স্বপ্নসমূহ। এই রেজিস্টারে লিপি করে রাখতেন। কিন্তু এ রেজিস্টারের প্রথম পৃষ্ঠায় নিজ কলমে এই নোট লিখেছিলেন: "এই রেজিস্টারে ঐ সব স্বপ্ন নকল বা প্রতিলিপি করছি যা আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ আমার ব্যাপারে দেখেছেন। এ উদ্দেশ্যে প্রতিলিপি করছি যে, যাই হোক, যেহেতু এগুলো সুন্দর স্বপ্ন, শুভলক্ষণ। আল্লাহ তাআলা এর বরকতে আমার সংশোধন নসীব করুন। কিন্তু আমি সমস্ত পাঠককে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, সামনে যেসব স্বপ্ন বৃত্তান্ত আসছে, এগুলো কখনোই শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড নয়। এর ভিত্তিতে আমার ব্যাপারে কেউ ফয়সালা করবেন না, বরং আসল মানদন্ড হল জাগ্রত অবস্থার কথা ও কাজ। সুতরাং এর দ্বারা যেন কোন মানুষ ধোঁকায় না পড়ে"।

আব্বাজান রহ. এ নোট এজন্যই লিখেছিলেন যাতে কেউ এগুলো পাঠ করে ধোঁকা না খায়। ব্যস এই হল স্বপ্নের হাকীকত। সুতরাং মানুষ ভাল স্বপ্ন দেখলে মহান আল্লাহর শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এবং দু'আ করবে যে, আল্লাহ তাআলা এই স্বপ্নকে আমার জন্য বরকতের উপলক্ষ বানিয়ে দিন। কিন্তু এ কারণে ধোঁকায় পড়বে না। অন্যের ব্যাপারেও না। নিজের ব্যাপারেও না। স্বপ্নের বাস্তবতা এতটুকুই।

এই স্বপ্নের ব্যাপারেই আরো দু তিনটি হাদীস আছে। যেগুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের জানা নেই। যদ্দরুণ বিভ্রমের শিকার হন।

৪৪. জোর করে কানের মধ্যে কথা ঢেলে দিয়েছেন

আমি আজকে চিন্তা করি যে, হযরত আব্বাজান রহ. হযরত ডাক্তার ছাহেব রহ. এবং হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. এই তিন বুযুর্গের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। আমার অবস্থা তো খারাপই ছিল। তবে আল্লাহ তাআলা এই সব বুযুর্গানে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিতির তাউফীক দিয়েছেন। এটা তাঁদের অনুগ্রহ-অনুকম্পা ছিল। এখন সারাজীবনও এর উপর শোকর আদায় করা হলে শোকর আদায় হবে না।

এই সব বুযুর্গ কিছু দ্বীনী কথাবার্তা জোর করে কানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন। নিজের পক্ষ থেকে যেগুলোর তলব বা অনুসন্ধিৎসা কিছুই ছিল না। এখন যদি আমি ঐ সব কথা যা বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে শুনেছিলাম। ধারাবাহিকভাবে লিখতে যাই, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সবগুলো মনে আসা

মুশকিল। কিন্তু কোন না কোন সুযোগে কথাগুলো মনে পড়ে। বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্কের এটাই হল উপকারিতা। আর যেমনিভাবে বুযুর্গানে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিতি নেয়ামত। তাঁদের কথা শোনা নেয়ামত। এমনিভাবে এইসব বুযুর্গের মালফূযাত-হালাত-জীবনী পাঠ করাও এর স্থলাভিষিক্ত। আজ তাঁরা উপস্থিত নেই। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সব কথা লিখিত অবস্থায় রেখে গেছেন। সেগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। এ কথাগুলো অনেক কাজে আসে।

৪৫. হযরত মুফতী শফী ছাহেব রহ. এবং মালিকানার বিশ্লেষণ

আমি আমার আব্বাজান (রহ.)কেও এমনিভাবেই দেখেছি যে, প্রতিটি বস্তুর মালিকানা সুস্পষ্ট করে দেয়ার অভ্যাস ছিল। শেষ বয়সে আব্বাজান রহ. নিজের কামরায় একটি চারপায়ী বিছিয়ে ছিলেন। রাত-দিন ওখানেই থাকতেন। আমরা সবসময় উপস্থিত থাকতাম। আমি লক্ষ্য করেছি যখনই আমি প্রয়োজনীয় কোন বস্তু অন্য কামরা থেকে তাঁর কামরায় আনতাম, তখন প্রয়োজন পূরণ হওয়া মাত্রই বলতেন যে, এ জিনিসটাকে নিয়ে যাও। যদি কখনো ফেরত নিতে বিলম্ব হত, তাহলে অসন্তুষ্ট হতেন যে, আমি তোমাকে বলেছিলাম ফেরত নিয়ে যাও অথচ এখনো পর্যন্ত ফেরত নিলে না?

কখনো কখনো আমাদের মনে এই খেয়াল আসত যে, এত দ্রুত ফিরিয়ে নেয়ার কী প্রয়োজন? একদিন আব্বাজান রহ. নিজেই বললেন: "আসল ব্যাপার হল আমি আমার অসিয়তনামায় লিখে দিয়েছি। আমার কামরায় যেসব জিনিস আছে, সেগুলো সব আমার মালিকানাধীন। আর আমার স্ত্রীর কামরায় যেসব জিনিস আছে, সেগুলো তাঁর মালিকানাধীন। এজন্য যখন আমার কামরায় অন্য কারো জিনিস এসে পড়ে, তখন আমার খেয়াল হয় যে, এমনটি যেন না হয় যে, আমার ইন্তিকাল এমন অবস্থায় হল যে, ঐ বস্তুটি আমার কামরায় আছে। কেননা অসিয়তনামা অনুসারে ঐ বস্তুটি আমার মালিকানাধীন মনে করা হবে। অথচ বাস্তবে ঐ জিনিসটি আমার মালিকানাধীন নয়। এজন্যই আমি বিচলিত হয়ে পড়ি এবং তোমাদেরকে বলি: তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিতে"।

এসব কথা দ্বীনের অংশ। আজ আমরা এসব ব্যাপারগুলোকে দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছি। বড়দের থেকে এগুলোই হল শেখার জিনিস।

৪৬. যৌথ সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতি

আমার আব্বাজান রহ. বলতেন: বাসায় কিছু যৌথ সম্পদ ব্যবহৃত হয়। বাসার প্রত্যেক সদস্যই সেটা ব্যবহার করে। এগুলোর কোন স্থান নির্ধারিত আছে যে, অমুক জিনিস অমুক স্থানে রাখা হবে। উদাহরণ স্বরূপ: অমুক স্থানে গ্লাস রাখা হবে। পেয়ালা অমুক স্থানে রাখা হবে। সাবান অমুক স্থানে রাখা হবে।

আব্বাজান রহ. আমাদেরকে বলতেন: "তোমরা এসব জিনিস ব্যবহার করে অন্য স্থানে রেখে থাকো। তোমাদের জানা নেই যে, তোমাদের এই আমল কবীরা গুনাহ। কেননা ঐ জিনিসটি যৌথ সম্পত্তি। যখন অন্য মানুষের সেটা ব্যবহারের প্রয়োজন হবে, তখন সে ঐ জিনিসটাকে নির্ধারিত স্থানে তালাশ করবে। আর যখন নির্দিষ্ট স্থানে সে ঐ জিনিসটি পাবে না, তখন তার কষ্ট হবে। অথচ কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।"

আমাদের মন কখনো এদিকে নিবদ্ধই হয়নি যে, এটাও কবীরা গুনাহ হতে পারে। আমরা তো মনে করতাম যে, এটা দুনিয়াদারীর কাজ। ঘরের ব্যবস্থাপনাগত ব্যাপার। মনে রাখবেন জীবনের এমন কোন দিক নেই যে ব্যাপারে দ্বীনের কোন দিকনির্দেশনা নেই। আমাদের সকলের উচিত নিজ নিজ অবস্থার সমীক্ষা নেয়া যে, যৌথ বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা অন্যের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখি কি? যাতে অন্যের কষ্ট না হয়।

যদিও এটা সামান্য একটি ব্যাপার। কিন্তু অমনোযোগীতার কারণে আমরা গুনাহে লিপ্ত হই। কেননা আমাদের দ্বীনের ফিকির নেই, খেয়াল নেই। মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিতির অনুভূতি নেই। দ্বিতীয়ত: বর্তমানে এসব মাসআলার ক্ষেত্রে অজ্ঞতাও বেশি।

৪৭. অমুসলিমগণ ইসলামী নীতিমালা অবলম্বন করেছে

একবার আমি আমার আব্বাজানের সাথে ঢাকা সফরে যাই। বিমানে সফর ছিল। পথে আমার গোসলখানায় যাওয়ার প্রয়োজন হল। আপনারা দেখে থাকবেন যে, বিমানের গোসলখানার ওয়াশবেসিনের উপর এ কথাটা লেখা থাকে যে, "যখন আপনি ওয়াশবেসিন ব্যবহার করবেন তো এরপর কাপড় দ্বারা এটাকে পরিস্কার ও শুকনো করে ফেলুন। যাতে করে পরবর্তীতে যিনি ব্যবহার করবেন তার কষ্ট না হয়।"

যখন আমি গোসলখানা থেকে ফিরে আসলাম, তখন হযরত আব্বাজান রহ. বললেন: গোসলখানার ওয়াশবেসিনে যে কথাটা লেখা থাকে, এটাই সেই কথা যা আমি তোমাদেরকে বারবার বলে থাকি যে, অন্যকে কষ্ট থেকে বাঁচানো দ্বীনের অংশ। বর্তমানে অমুসলিমরা যেটাকে অবলম্বন করেছে। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় উন্নতি দান করেছেন। অথচ আমরা এই সব ব্যাপারগুলোকে দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছি। আর দ্বীনকে শ্রেফ নামায-রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। সামাজিকতার এই সব আদব পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি। যদ্দরুন আমরা আজ অধঃপতনের দিকে ধাবমান। এর কারণ হল, আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়াকে উপকরণের জগত বানিয়েছেন। এখানে যেমন আমল অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ তাকে সে রকম ফলাফলই দান করবেন।

৪৮. হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এর অভিরুচি

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর খেদমতে এক ব্যক্তি আসলেন এবং বললেন: "হযরত! আমাকে এমন কোন ওযীফা বাতলে দিন যার বরকতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত বা স্বপ্নযোগে সাক্ষাত নসীব হয়।"

এই প্রেক্ষিতে আব্বাজান রহ. বললেন: ভাই! তুমি তো দারূণ হিম্মতওয়ালা মানুষ। কেননা তুমি আকাংখা করছ যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত হয়ে যায়। আমার তো সাহসই হয় না যে, এ হিম্মত করব। কেননা কোথায় আমরা আর কোথায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত? আর যদি যিয়ারত হয়েও যায়, তাহলে এর আদব, হকসমূহ এবং তাকাযা কিভাবে পুরা করব? এজন্য আমি এটা হাসিল হওয়ার জন্য না তো চেষ্টা করেছি। আর না কখনো এ জাতীয় আমল শেখার সুযোগ হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত নসীব হবে। অবশ্য যদি আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যিয়ারত করিয়ে দেন, তাহলে সেটা হবে তাঁর অনুগ্রহ। আর যখন নিজে করাবেন, তখন এর আদবসমূহ রক্ষা করার তাউফীকও তিনিই দান করবেন।

৪৯. হযরত মুফতী ছাহেব রহ.-এর অসামান্য ত্যাগ

আমরা আমাদের সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর পুরো যিন্দেগীতে এ হাদীসের উপর আমল করা নিজ চোখে

দেখেছি। ঝগড়া খতম করার জন্য বড় থেকে বড় হক ছেড়ে পৃথক হয়ে গেছেন। তাঁর একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। যার উপর আজ মানুষের বিশ্বাস স্থাপন কঠিন মনে হয়। এই দারুল উলূম করাচী যা এ মুহূর্তে কৌরঙ্গীতে আছে, প্রথমে নানকওয়াড়া নামক স্থানে একটি ছোট্ট বিল্ডিংয়ে ছিল। যখন কাজ বেশি হল, তখন ঐ স্থান সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। এবং প্রশস্ত স্থানের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন সাহায্য হল যে, একদম শহরের মাঝখানে সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশাল ও প্রশস্ত স্থান পাওয়া গেল, যেখানে বর্তমানে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত। যেখানে হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর মাযারও আছে। এই বিশাল স্থান দারুল উলূমের নামে এলাট হয়ে গেল। এ জমির কাজগপত্রও পাওয়া গেল, দখল পাওয়া গেল। আর একটি কামরাও বানিয়ে দেয়া হল। টেলিফোনও লেগে গেল। এরপর দারুল উলূমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এর দিন একটি উদ্বোধনী জলসা অনুষ্ঠিত হল। সেখানে পুরো পাকিস্তানের বড় বড় আলেমগণ তাশরীফ আনলেন। এই জলসার সময় কোন কোন হযরত ঝগড়া দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, এই স্থানটি দারুল উলূমের পাওয়া ঠিক হবে না, বরং অমুকের পাওয়া উচিত ছিল। ঘটনাক্রমে ঐ ঝগড়ার সময় তারা এমন কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করল, যাঁরা আমার আব্বাজান রহ. এরও অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। আব্বাজান প্রথমে চেষ্টা করেছেন কিভাবে এ ঝগড়ার নিরসন করা যায়। কিন্তু সেটার নিরসন হয়নি। আব্বাজান রহ. চিন্তা করলেন। যে মাদরাসার সূচনাই হচ্ছে ঝগড়া দ্বারা, তো ঐ মাদরাসায় কী বরকত হবে? ফলশ্রুতিতে আব্বাজান মরহুম তাঁর এ ফয়সালা শুনিয়ে দিলেন যে, "আমি এ জমি ছেড়ে দিচ্ছি।"

৫০. আমার এর মধ্যে বরকত চোখে পড়ে না

দারুল উলূম করাচীর ব্যবস্থাপনা পরিষদ যখন এই ফয়সালা শুনল, তখন তারা আমার আব্বাজান রহ. কে বললেন: হযরত! এটা আপনি কেমন ফয়সালা করছেন? এত বড় জমি। তাও শহরের মধ্যে। এমন জমি পাওয়া মুশকিল। এখন যেহেতু এই জমি আপনি পেয়ে গেছেন। এর উপর আপনার কব্জাও আছে। আপনি এখন জমি ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যাচ্ছেন?

উত্তরে আব্বাজান রহ. বললেন: আমি ব্যবস্থাপনা পরিষদকে এ জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করছি না। কেননা ব্যবস্থাপনা পরিষদ বাস্তবিকপক্ষে এ জমির মালিক হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে এখানে মাদরাসা বানাতে

পারেন। কিন্তু আমি তাতে শরীক থাকব না। কেননা যে মাদরাসার ভিত্তি রাখা হচ্ছে ঝগড়ার উপর। ঐ মাদরাসায় আমার কোন বরকত নজরে আসছে না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি হকের উপর থাকা অবস্থায় ঝগড়া ছেড়ে দিল, আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যে ঘর দেয়ানোর যিম্মাদার।"

আপনারা বলছেন: শহরের মধ্যে এমন জমি কোথায় পাওয়া যাবে? অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন : "আমি তার জন্য জান্নাতে ঘর দেয়ার দায়িত্ব নিলাম।"

এটা বলে আব্বাজান ঐ জমি ছেড়ে দিলেন। বর্তমান যুগে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ঝগড়ার কারণে কেউ এত বড় জমি ছেড়ে দেয়!

কিন্তু যে ব্যক্তির প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার উপর আছে পূর্ণ আস্থা। তিনিই এ কাজ করতে পারেন।

এরপর মহান আল্লাহর এমন অনুগ্রহ হল যে, কয়েক মাসের মধ্যেই ঐ জমির চেয়ে কয়েক গুণ বড় জমি তিনি দান করলেন। যেখানে বর্তমানে দারুল উলূম করাচী দাঁড়িয়ে আছে। এটা তো আমি আপনাদের সামনে একটি উদাহরণ দিলাম মাত্র। নতুবা আব্বাজান রহ. কে আমরা সারাজীবন এ হাদীসের উপর আমল করতে দেখেছি। তবে হ্যাঁ যে স্থানে কোন ব্যক্তি ঝগড়ার মধ্যে ফেঁসে গেছে, প্রতিরোধ ব্যতীত তার সামনে আর কোন পথ নেই সেটা ভিন্ন কথা।

আমরা ছোট ছোট কথাকে কেন্দ্র করে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ি যে, অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি এ কথা বলেছিলেন। অমুক এমনটি করেছিলেন। এখন সব সময়ের জন্য সেটাকে অন্তরে বসিয়ে নেই এবং ঝগড়া দাঁড়িয়ে যায়। এই জিনিস আজ আমাদের পুরো সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এ ঝগড়া মানুষের দ্বীনকে মুণ্ডন করে ফেলে। এবং মানুষের ভিতরকে ধ্বংস করে ফেলে। এজন্য আল্লাহর জন্য আসুন আমরা সমস্ত ঝগড়া খতম করে দেই। আর দুই জন মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া দেখলে তাদের মধ্যে সন্ধি করানোর পূর্ণ চেষ্টা করি।

৫১. জনৈক বুযুর্গের শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. একজন বুযুর্গের ঘটনা শুনিয়েছেন। একজন আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন।

কিছু মানুষ তাঁর সাথে ঠাট্টা মশকরা করল। যেমন বর্তমানে সূফী এবং সহজ সরল মৌলভী ছাহেবদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়।

যাই হোক, ঠাট্টা করে এক ব্যক্তি ঐ বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করল: হুযূর! আচ্ছা বলুন তো আপনি ভাল নাকি আমার কুকুর ভাল? এ প্রশ্ন শুনে বুযুর্গ রাগও করেননি এবং তাঁর মন মানসিকতায় কোন পরিবর্তন বা বিষণ্নতার ভাবও আসেনি। উত্তরে বুযুর্গ বললেন: এখন তো আমি বলতে পারছি না আমি ভাল নাকি তোমার কুকুর ভাল। কেননা জানা নেই যে, কোন্ অবস্থায় আমার ইন্তিকাল হবে? যদি ঈমান ও আমলে সালিহ এর উপর আমার ইন্তিকাল হয়, তাহলে এমতাবস্থায় আমি নিশ্চিতভাবে তোমার কুকুর অপেক্ষা ভাল বিবেচিত হব। আর আল্লাহ না করুন যদি আমার শেষ পরিণতি মন্দ হয়ে যায়, তাহলে তোমার কুকুর অবশ্যই অবশ্যই আমার থেকে ভাল। কেননা সে তো জাহান্নামে যাবে না। এবং তাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না।

আল্লাহর নেক বান্দাদের অবস্থা এমনই হয়। তাঁরা শেষ পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। এজন্যই বলা হয়েছে যে, কোন খারাপ থেকে খারাপ মানুষের সত্তাকে নিকৃষ্ট মনে করো না। তাকে মন্দ বলো না। তার কার্যকলাপকে অবশ্যই মন্দ বলতে পারবে যদি সে মদ্যপান করে। কুফরী কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু ব্যক্তিকে মন্দ বলা জায়েয নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা জানা না যায় যে, পরিণাম কেমন হবে?

৫২. নরমভাবে বুঝানো উচিত

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা এবং হযরত হারূন (আ:)কে ফিরআউনের সংশোধন এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। আর ফিরআউন কে ছিল? খোদায়ী দাবীদার ছিল। যে এ কথা বলত:

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

অর্থাৎ "আমি তোমাদের বড় প্রভু।" (সূরা নাযিআত : ২৪)

কেমন যেন ঐ ফিরআউন ছিল নিকৃষ্টতম কাফের। কিন্তু যখন এই উভয় নবী ফিরআউনের নিকট যেতে লাগলেন, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

অর্থাৎ "তোমরা উভয়ে ফিরআউনের নিকট গিয়ে নরমভাবে কথা বলবে। হতে পারে যে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।" (সূরা ত্বাহা : ৪৪)

এ ঘটনা শোনার পর আব্বাজান রহ. বললেন: আজ তোমরা হযরত মূসা (আ:) অপেক্ষা বড় সংশোধনকারী হতে পারবে না, আর তোমাদের প্রতিপক্ষ ফিরআউন অপেক্ষা বেশি পথভ্রষ্ট হতে পারে না, চাই সে যত বড় ফাসেক ফাজের আর মুশরিক হোক না কেন। কেননা সে তো খোদায়ী দাবীদার ছিল। এরপরও হযরত মূসা এবং হযরত হারূন উভয়কে বলা হচ্ছে: তোমরা ফিরআউনের নিকট যাও এবং নরমভাবে তাকে বুঝাও। শক্তভাবে কথা বলো না।

এর মাধ্যমে আমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত নবীসুলভ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, যখনই কারো সাথে দ্বীনী কথাবার্তা বলবে, তো নরমভাবে বলবে, শক্তভাবে বলবে না।

৫৩. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এবং কুরআনে কারীমের তাফসীর

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. জীবনের সত্তর-পঁচাত্তর বছর দ্বীনী উলূম পড়া ও পড়ানোর মধ্যে কাটিয়েছেন। শেষ বয়সে গিয়ে 'মাআরিফুল কুরআন' নামে তাফসীর রচনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে বারবার বলতেন: জানি না, আমি কি এর যোগ্য ছিলাম যে, তাফসীর বিষয়ে কলম ধরব! আমি তো বাস্তবিকপক্ষে তাফসীর করার যোগ্যতা রাখি না। কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর তাফসীরকে আমি সহজ ভাষায় ব্যক্ত করে দিয়েছি। সারাজীবন এই কথা বলতেন: বড় বড় আলেমগণ তাফসীরের ব্যাপারে কথা বলতে ভয় পান।

৫৪. আয় এখতিয়ারভুক্ত নয় ব্যয় এখতিয়ারভুক্ত

আব্বাজান রহ. বলতেন: আয় বাড়ানো মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। অতএব খরচ কমিয়ে অল্পেতুষ্টি অবলম্বন কর। ইনশাআল্লাহ কোন পেরেশানী হবে না। পেরেশানী এজন্য হয় যে, তুমি পূর্ব থেকে স্বীয় মনের মধ্যে এই পরিকল্পনা করে থাক যে, এ পরিমাণ আয় হওয়া উচিত। যখন ঐ পরিমাণ আয় হয় না, তখন পেরেশানী শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যদি তুমি নিজের খরচ কমিয়ে সহজ সরল জীবন-যাপন করতে আর এটা চিন্তা করতে যে, আল্লাহ তাআলা যখন সম্পদ কম দিয়েছেন, তখন কমের উপরই থাকব।

আর যদি বেশি দেন তাহলে সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করব। ফলশ্রুতিতে নিজ আয়ের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে, তাহলে দেখবে যে, শুধু শান্তি আর শান্তি। সুখ আর সুখ। এরই নাম "কানাআত" বা অল্পেতুষ্টি।

৫৫. টেলিফোনে লম্বা কথা বলা

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: বর্তমানে কষ্ট দেয়ার একটি যন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে। সেটা হল "টেলিফোন"। এটা এমন এক যন্ত্র যার মাধ্যমে অন্যকে যত ইচ্ছা কষ্ট পৌঁছাতে পারবে। মনে করুন আপনি কাউকে টেলিফোন করলেন এবং তার সাথে লম্বা কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন। এটা খেয়াল করলেন না যে, এ মানুষটা এই সময় কোন একটা কাজে ব্যস্ত। তার হাতে সময় আছে কি নেই?

আমার আব্বা "মাআরিফুল কুরআনে" এ কথা লিখেছেন যে, টেলিফোন করার আদাবের মধ্যে এটাও অন্তর্ভূক্ত যে, যদি কারো সাথে লম্বা কথাবার্তা বলতে হয়, তাহলে প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করো যে, আমার কথা কিছু লম্বা হবে চার পাঁচ মিনিট লাগবে। আপনি এখন অবসর থাকলে এখনই কথা বলব আর যদি অবসর না থাকেন, তাহলে উপযুক্ত কোন সময় বলে দিন, ঐ সময় আমি আপনার সাথে কথা বলব। সূরা নূরের তাফসীরে এই সব আদব লিখেছেন। দেখে নেয়া হোক। আর স্বয়ং আব্বাজানও এর উপর আমল করতেন।

৫৬. এটা কবীরা গুনাহ

একদিন আব্বাজান রহ. আমাদেরকে বললেন: তোমরা এই যে একটি কাজ করো যে, একটি জিনিস উঠিয়ে অন্যস্থানে রেখে দাও। এটা বদস্বভাব তো বটেই। এর পাশাপাশি এটা কবীরা গুনাহও বটে। কেননা এ আমলের মাধ্যমে মুসলমানকে কষ্ট পৌঁছানো হচ্ছে। এটা হারাম।

সেদিন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এটাও দ্বীনের হুকুম। এবং এটাও গুনাহে কবীরা। নতুবা এর পূর্বে এর অনুভূতিও ছিল না।

৫৭. আমার অন্তরে আমার আব্বার বড়ত্ব

আমার আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. সারাজীবনে এক দুইবার ব্যতীত আমাকে কখনো মারেননি। এক দুইবার তাঁর হাতে

থাপ্পড় খাওয়ার কথা মনে পড়ে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বড়ত্বের অবস্থা এই ছিল যে, তাঁর কামরার পাশ দিয়ে যেতে আমাদের পা কাঁপত যে, আমরা কার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছি? এমনটি কেন হত? কেননা অন্তরে এই খেয়াল ছিল যে, তাঁর চোখের সামনে যেন আমাদের এমন কোন আমল এসে না যায় যা তাঁর শান, বড়ত্ব এবং তাঁর আদবের বিপরীত। যদি একজন মাখলূকের জন্য অন্তরে এই বড়ত্ব থাকতে পারে, তাহলে সমস্ত সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও মালিক মহান আল্লাহর জন্য অন্তরে কী পরিমাণ বড়ত্ব থাকা দরকার? মানুষের এ কথা ভেবে ভয় পাওয়া উচিত যে, আমি এই গুনাহও অপকর্ম করে কিভাবে দাঁড়িয়ে থাকব? কিভাবে আল্লাহকে মুখ দেখাব?

৫৮. এ কাজ কার জন্য ছিল?

আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন যে, যারা দাওয়াত ও তাবলীগ এবং আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কাজ কর্ম করেন তাঁদের উচিত নিজ কাজে লেগে থাকা। মানুষ কথা না মানার কারণে যেন হতাশ হয়ে না পড়ে। রাগ না করে যে, আমি এত বুঝালাম অথচ তারা আমার কথা মানল না। কাজেই এখন থেকে আমি কিছুই বলব না।

এমনটি করবে না। বরং চিন্তা করবে যে, আমি এ কাজ কার জন্য করে ছিলাম? আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছিলাম। আগামীতেও যত কাজ করব। আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করব। ফলে প্রত্যেকবার আমি বলার সাওয়াব পাব।

৫৯. একটি উপদেশমূলক ঘটনা

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. নিজের এ ঘটনাটি শুনিয়েছেন যে, একবার আমার আব্বা (অর্থাৎ আমার দাদা) মাওলানা ইয়াসীন ছাহেব রহ. অসুস্থ ছিলেন। দেওবন্দে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় দিল্লীতে একজন অন্ধ হাকীম খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। এবং অত্যন্ত পারদর্শী হাকীম ছিলেন। তাঁর অধীনে চিকিৎসা চলছিল। আমি দেওবন্দ থেকে দিল্লী গেলাম যাতে করে আব্বাজান এর অবস্থা বলে ঔষধ আনতে পারি।

ফলে আমি যখন ঐ হাকীমের ঔষধ খানায় পৌঁছলাম এবং আব্বাজানের অবস্থা বললাম এবং বললাম যে, তাঁর ঔষধ দিন। হাকীম ছাহেব অন্ধ

ছিলেন, যখন তিনি আমার আওয়ায শুনলেন তখন বললেনঃ আমি তোমার আব্বার ঔষধ তো পরে দিব। প্রথমে তুমি তোমার ঔষধ নাও। আমি বললামঃ আমি তো সুস্থ আছি। কোন ব্যাধি নেই। হাকীম ছাহেব বললেনঃ না, এই নাও তোমার ঔষধ। সকাল-দুপুর ও সন্ধ্যা তিনবেলা এটা সেবন করবে। আর এক সপ্তাহ পর যখন আবার আসবে তখন তোমার অবস্থা বর্ণনা করবে। ফলশ্রুতিতে তিনি প্রথমে আমার ঔষধ দিলেন। অতঃপর আব্বাজানের ঔষধ দিলেন। আমি ঘরে ফেরার পর আব্বাজানকে বললাম যে, হাকীম ছাহেব যেভাবে বলেছেন ঐভাবেই কাজ কর। এবং তাঁর ঔষধ ব্যবহার কর।

এক সপ্তাহ পর যখন পুনরায় হাকীম ছাহেবের কাছে গেলাম, তখন আমি আরয করলাম যে, হাকীম ছাহেব! এখনো পর্যন্ত এ রহস্য বুঝে আসেনি। আর কোন অসুস্থতাও বুঝে আসেনি। হাকীম ছাহেব বললেনঃ গত সপ্তাহে যখন তুমি এসেছিলে, তোমার আওয়ায শুনে আমার অনুমান হল যে, তোমার ফুসফুসে প্রদাহ হয়েছে। আর আশংকা আছে যে, পরবর্তীতে এটা টি, বি বা যক্ষ্মার আকৃতি অবলম্বন করে কিনা! এজন্য আমি তোমাকে ঔষধ দিয়েছি। এখন তুমি আলহামদুলিল্লাহ এ রোগ থেকে বেঁচে গেছ।

দেখুন! রোগী নিজেও জানে না তার কী রোগ, আর চিকিৎসকের এ কথা বলা যে, তোমার মধ্যে এ রোগ আছে। এটা তাঁর অনুগ্রহ। কাজেই এটা বলা হবে না যে, ডাক্তার ছাহেব রোগী বানিয়ে দিয়েছেন। বরং তিনি বলে দিয়েছেন যে, তোমার মধ্যে এ ব্যাধি সৃষ্টি হচ্ছে যাতে করে তুমি চিকিৎসা করে নাও। এখন এই বলার কারণে ডাক্তারের উপর রাগ করা বা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই।

৬০. হোটেলে জমিনের উপর খানা খাওয়া

হযরত আব্বাজান রহ. একদিন সবকে আমাদেরকে একটি ঘটনা শোনালেন যে, একদিন আমি ও আমার কিছু বন্ধু দেওবন্দ থেকে দিল্লী গেলাম। দিল্লী পৌঁছার পর সেখানে খানা খাওয়ার প্রয়োজন সামনে আসল। খানা খাওয়ার কোন স্থান না পেয়ে একটি হোটেলে চলে গেলাম খানা খাওয়ার জন্য। এখন জানা কথাই যে, হোটেলে চেয়ার টেবিলে খানার ব্যবস্থা হয়। এজন্য আমাদের দুই সাথী বললেনঃ আমরা তো চেয়ার টেবিলে বসে খানা খাব না। কেননা মাটিতে বসে খানা খাওয়া সুন্নাত। ফলে তারা এটাই চাইলেন যে, হোটেলের মধ্যে মাটির উপর স্বীয় রুমাল বিছিয়ে খানা

পরিবেশনকারীর মাধ্যমে খানা আনাবেন। হযরত আব্বাজান রহ. বলেন: আমি তাদেরকে নিষেধ করে বললাম যে, এমনটি করবেন না। বরং চেয়ার টেবিলে বসেই খানা খেয়ে নিন। তারা বললেন: আমরা চেয়ার টেবিলে খানা খাব কেন? যখন মাটিতে বসে খানা খাওয়া সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী, তাহলে মাটিতে বসে খানা খেতে আমরা ভয় পাব কেন? এবং কেন লজ্জা করব? আব্বাজান রহ. বললেন: শরম বা ভয়ের কথা নয়। আসল কথা হল, যখন তোমরা মাটিতে এভাবে নিজেদের রুমাল বিছিয়ে বসবে, তখন তোমরা মানুষের সামনে এ সুন্নাতকে উপহাসের পাত্র বানাবে। আর মানুষেরা এ সুন্নাতের অবমাননার গুনাহে লিপ্ত হবে। আর সুন্নাতের অবমাননায় লিপ্ত হওয়া শুধু গুনাহই নয় বরং অনেক সময় মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআলা রক্ষা করুন।

৬১. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর একটি ঘটনা

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. যখন পাকিস্তান আগমন করেন, তখন সরকার সংসদীয় গঠনতন্ত্রের সাথে একটি "ইসলামী শিক্ষা বোর্ড" বানিয়েছিল। আব্বাজান (রহ.)কেও এর মেম্বর বা সদস্য বানানো হয়েছিল। এই বোর্ড সরকারেরই একটি শাখা ছিল। একবার সরকার কোন একটা কাজ গড়বড় করে ফেললে আব্বাজান রহ. পত্রিকায় সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে দিলেন যে, সরকার এ কাজ ভুল করেছে।

পরবর্তীতে সরকারের কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত হলে তারা আব্বাজানকে বলল: হযরত! আপনি তো সরকারের অংশ। আপনি সরকারের বিরুদ্ধে এ বিবৃতি দিলেন? অথচ আপনি "ইসলামী শিক্ষা বোর্ড" এর সদস্য। আর এই বোর্ড সংসদীয় গঠনতন্ত্রের অংশ। সরকারের বিরুদ্ধে আপনার এ বিবৃতি সমীচীন নয়।

উত্তরে আব্বাজান রহ. বললেন: আমি এ সদস্যপদ অন্য কোন উদ্দেশ্যে কবূল করিনি। শুধুমাত্র দ্বীনের খাতিরে কবূল করেছি। আর দ্বীনের একজন খাদেম হিসেবে যে কথাটা হক মনে করব সেটা বলা আমার জন্য ফরয। চাই সেই কথাটা সরকারের পক্ষে যাক অথবা বিপক্ষে। আমার এতে কিছু আসে যায় না। ব্যস আল্লাহর নিকট যেটা হক সেটা সুস্পষ্ট করে দিব। বাকি থাকল সদস্যপদের কথা। এই সদস্যপদ আমার কোন চাকুরী নয়। আপনি সরকার এর বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান। যেহেতু আপনি সরকারের অধীনস্ত

একজন চাকুরীজীবি। আপনার বেতন কয়েকহাজার টাকা। যদি এই চাকুরী ছুটে যায়, তাহলে আপনি জীবন-যাপনের যে ব্যবস্থাপনা বানিয়ে রেখেছেন সেটা চলবে না। আমার অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, যেদিন আমি সদস্যপদ কবূল করেছিলাম ঐ দিনই অব্যাহতিকামনা পত্র লিখে পকেটে রেখে দিয়েছি এই নিয়্যতে যে, যখনই সুযোগ আসবে পেশ করে দিব।

আর চাকুরীর ক্ষেত্রে আমার ও আপনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যিন্দেগীর যে খরচ আছে সেটা দু টাকার চেয়ে বেশি নয়। কেননা মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে আমি এই বেতন-ভাতার মুখাপেক্ষী নই। পক্ষান্তরে আপনি তো আপনার যিন্দেগী এমন বানিয়ে নিয়েছেন যে, দুইশত টাকার কমে (আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর পূর্বের কথা-অনুবাদক) আপনার স্যুট তৈরী হয় না। এজন্য আপনি সরকারকে ভয় করেন যে, না জানি চাকুরী ছুটে যায় কিনা। আমার আলহামদুলিল্লাহ এর কোন ভয় নেই।

৬২. যবানের দংশনের একটি কিচ্ছা

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা যবান দিয়ে অন্যকে দংশন করে। এ জাতীয় মানুষ যখনই কারো সাথে কথা বলবে দংশন করবে। খোঁচা মেরে কথা বলবে। অথচ এভাবে কথা বলার দ্বারা অন্তরে দাগ পড়ে যায়।

অতঃপর আব্বাজান রহ. একটি কিচ্ছা শোনালেন। জনৈক ব্যক্তি তার বন্ধুর বাসায় গেলেন। দেখলেন যে, তার স্ত্রী খুব রাগের অবস্থায় আছে। আর যবান দ্বারা স্বীয় শাশুড়ীকে গালমন্দ করছে। আর শাশুড়ীও পাশে বসা। ঐ ব্যক্তি শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলেন: কী ব্যাপার? বউ এর এত গোস্বা আসছে কেন? উত্তরে শাশুড়ী বলল: ব্যাপার কিছুই না। আমি শুধু দুইটা কথা বলেছিলাম। এটাই আমার অপরাধ। এ কারণেই সে এত চেচামেচি করছে ও রাগ দেখাচ্ছে।

ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: আচ্ছা সেই দুইটা কথা কী ছিল? শাশুড়ী বলল: আমি শুধু এতটুকু বলেছিলাম যে, "তোমার বাপ গোলাম আর তোমার মা হল বাঁদী"!! ব্যস এরপর থেকেই এই নাচানাচি চলছে।

এখন দেখুন! ঐ মাত্র দুইটা কথা কেমন ছিল? কথা দুটো তো এমন যা মানুষের মনের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এবং সব সময় সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে।

৬৩. “হাদিয়া” হালাল পবিত্র সম্পদ

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: কোন মুসলমানের ঐ হাদিয়া যা আন্তরিকভাবে মহব্বতের সাথে দেয়া হয়, সুনাম সুখ্যাতি বা নাম যশের জন্য দেয়া হয়নি। ঐ হাদিয়া জগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হালাল ও পবিত্র মাল। কেননা যে পয়সা তুমি নিজে উপার্জন করেছ, এর মধ্যে এ আশংকা আছে যে, ঐ সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে তোমার দ্বারা কোন বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যদ্দরুন সেটা হালাল ও পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কমতি রয়ে গেছে। কিন্তু যদি একজন মুসলমান তোমার কাছে ইখলাস ও মহব্বত এর সাথে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর খাতিরে কোন হাদিয়া নিয়ে আসে। সেটা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

তাইতো আব্বাজান (রহ.)কে হাদিয়া দেয়ার মূলনীতি নির্ধারিত ছিল। এবং হাদিয়ার তিনি খুব কদর করতেন। এবং নিয়মতান্ত্রিক গুরুত্বের সাথে সেটাকে নিজের কোন খাতে ব্যয় করার চেষ্টা করতেন যে, এটা মুসলমানের হালাল পবিত্র মাল। যেটা সে আল্লাহর খাতিরে দিয়েছে। এজন্য এ মাল বড় বরকতওয়ালা।

যাই হোক। যে হাদিয়া আল্লাহর জন্য দেয়া হয় সেটা প্রদানকারীর জন্যও বরকতময়। গ্রহণকারীর জন্যও বরকতময়। আর যে হাদিয়ার উদ্দেশ্য লোভ, নাম, যশ ইত্যাদি সেটার মধ্যে প্রদানকারী ও গ্রহণকারী কারো জন্যই বরকত নেই।

৬৪. বকাঝকার সময় লক্ষ্য রাখবে

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন: বাস্তবে আমরা হযরত থানভী রহ. এর ওখানে স্নেহ ও ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। অবশ্য মাঝে মধ্যে মানুষের ইসলাহ বা সংশোধনের জন্য বকাঝকার প্রয়োজন হত। সেটাও খুব সতর্কতার সাথে করতেন।

যাই হোক যদি কেউ ছোট হয় এবং তাকে শাসন করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ: সর্বপ্রথম এটার খেয়াল রাখবে যে, এই বকাঝকার দ্বারা স্বীয় গোস্বা বের করা উদ্দেশ্য নয় বরং আসল উদ্দেশ্য হল ঐ ব্যক্তির সংশোধন। যার পদ্ধতি হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এটা বাতলিয়েছেন যে, প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহূর্তে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। বরং উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে আসলে চিন্তা-

ভাবনা করে যতটুকু গোস্বা করা প্রয়োজন, কৃত্রিম গোস্বা সৃষ্টি করে অতটুকু গোস্বাই করবে। এর থেকে কমও হবে না। এর থেকে বেশিও হবে না। কিন্তু যদি রাগের মাথায় গোস্বার উপর আমল করে, তাহলে গোস্বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং তোমাদের দ্বারা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

৬৫. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একদিন আব্বাজান রহ. একটি কিচ্ছা শোনালেন। “সুলাইমান আমাশ” নামে একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ছিলেন। ইনি ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর উস্তাদও ছিলেন। সমস্ত হাদীসের কিতাবগুলো তাঁর বর্ণনায় ভরপুর। আরবী ভাষায় ‘আমাশ’ বলা হয় আলোর তীব্রতার দরূন দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে। এদিকে তাঁর একজন শিষ্য ছিলেন যাঁর উপাধি ছিল “আ‘রাজ” বা ল্যাংড়া। পায়ে সমস্যা ছিল।

শিষ্যও এমন ছিল যে সব সময় উস্তাদের সাথে আঠার মত লেগে থাকত। যেমনটি কোন কোন শিষ্যের অভ্যাস হয়ে থাকে। যেখানেই উস্তাদ যায় সেখানেই সাথে সাথে শিষ্যও যায়। তিনিও এমনই ছিলেন। ফলশ্রুতিতে ইমাম আ'মাশ রহ. যখন বাজারে যেতেন তখন এই আ'রাজ শিষ্যও তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতেন।

বাজারে লোকজন উভয়কে দেখলে রসিকতা করে বলত: উস্তাদ আন্ধা, ছাত্র ল্যাংড়া! ফলশ্রুতিতে ইমাম আ'মাশ রহ. নিজ শিষ্যকে বললেন: যখন আমি বাজারে যাই তখন তুমি আমার সাথে যেও না। শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন: হযরত! কেন? আমি আপনার সঙ্গ কেন পরিত্যাগ করব? ইমাম আ'মাশ রহ. বললেন: যখন আমরা বাজারে যাই, তখন লোকেরা আমাদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে যে, উস্তাদ আন্ধা শিষ্য ল্যাংড়া। শিষ্য বললেন : مَالَنَا نُؤْجَرُ وَ يَأْثَمُوْنَ হযরত! যারা আমাদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করে ওদেরকে বিদ্রূপ করতে দিন। কেননা এই বিদ্রূপের ফলে আমাদেরকে সাওয়াব দেয়া হবে। আর তাদের হবে গুনাহ। এতে আমাদের তো কোন ক্ষতি নেই বরং উপকার। প্রতিউত্তরে ইমাম আ'মাশ রহ. বললেন :

نَسْلَمُ وَيَسْلَمُوْنَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ نُّؤْجَرَ وَيَأْثَمُوْنَ

অর্থাৎ “আমরাও গুনাহ থেকে বেঁচে যাব আর তারাও গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে এটা উত্তম ঐ অবস্থা থেকে যে, আমাদের সাওয়াব হবে আর তাদের গুনাহ হবে।”

আমার সাথে যাওয়া তো আর ফরয-ওয়াজিব কিছু নয়। আর না গেলে কোন ক্ষতিও নেই। কিন্তু না গেলে উপকার হবে এই যে, লোকেরা ঐ গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। এজন্য আগামীতে আমার সাথে আর বাজারে যাবে না। এই হল দ্বীনের বুঝ। এখন যদিও বাহ্যত: শিষ্যের কথা সঠিক মনে হচ্ছিল যে, লোকেরা বিদ্রূপ করলে করুক! কিন্তু যে ব্যক্তির আল্লাহর মাখলূকের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি থাকে, তিনি মাখলূকের ভুলের প্রতি অতটা দৃষ্টি দেন না। বরং তারা এটা চিন্তা করেন যে, যথাসম্ভব আমি মাখলূককে গুনাহ থেকে বাঁচাব। এটাই উত্তম পথ।

৬৬. ফাতাওয়া লেখার পূর্বে

হযরত আব্বাজান রহ. বলতেন: যেমনিভাবে কোন মাসআলার হুকুম জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তদ্রূপ ফাতাওয়া লেখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র। যার জন্য মুফতী ছাহেবকে অনেক বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ: সর্বপ্রথম মুফতীকে এটা দেখতে হয় যে, মুস্তাফতী বা প্রশ্নকারীর প্রশ্ন উত্তরযোগ্য কিনা? আবার অনেক সময় প্রশ্নের ধরন থেকে এটা বুঝে আসে যে, তার উদ্দেশ্য আমল করা বা ইলমের মধ্যে বৃদ্ধি সাধন নয় বরং নিজ কোন বিরোধী পক্ষকে হেয় করা উদ্দেশ্য। অথবা অবস্থা এমন যে, এ প্রশ্নের উত্তর দিলে ফিত্না সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ ইসতিফতার উত্তর না দেয়াই বাঞ্ছণীয়।

উদাহরণ স্বরূপ: একবার প্রশ্ন আসল, আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব অমুক অমুক আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। তাঁর জন্য এমনটি করা উচিত নাকি অনুচিত? এ প্রশ্ন কোন মুক্তাদীর পক্ষ থেকে ছিল। আর এ প্রশ্নের ঢং দ্বারা হযরত আব্বাজান রহ. এর প্রবল ধারণা হয়ে গেছে যে, এই ইস্তিফতার উদ্দেশ্য ইমাম ছাহেবকে হকের দাওয়াত দেয়া বা বুঝানো নয় বরং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাঁর কিছু অসতর্কতা মূলক ব্যাপারগুলো প্রসিদ্ধ করা উদ্দেশ্য। ফলশ্রুতিতে আব্বাজান রহ. এর উত্তরে লিখলেন: এ প্রশ্ন তো স্বয়ং ইমাম ছাহেবের জিজ্ঞেস করার কথা। তাঁকে বলুন লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে উত্তর জেনে নিতে।

এভাবেই সম্ভাব্য একটি ফিত্না নির্মূল হয়ে গেল।

৬৭. ফাতাওয়ার যোগ্যতা

হযরত আব্বাজান রহ. বলতেন: শুধুমাত্র ফিকহী মাসায়িল মুখস্ত করা বা ফিক্হ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে যোগ্যতা অর্জন করার দ্বারা ফাতাওয়া প্রদানের

যোগ্যতা হাসিল হয় না। বরং এটা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। যার জন্য পারদর্শী মুফতীর সান্নিধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দীক্ষা নেয়া জরূরী। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এভাবে ফাতাওয়ার প্রশিক্ষণ না নিবে অতক্ষণ পর্যন্ত তিনি চাই বহুবার "হেদায়া" ইত্যাদি কিতাবের দরস দিয়ে থাকুন না কেন ফাতাওয়া প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

আব্বাজান রহ. বলেছেন: এই যে দার্শনিকগণ অনেক জিনিসকে 'লাযেমে যাত' বা 'লাযেমে মাহিয়াত' আখ্যা দেন। এটা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তবে মাখলূকাতের কোন গুণ লাযেমে যাতও হয় না, লাযেমে মাহিয়াতও হয় না। আর যে জিনিসকে দার্শনিকগণ লাযেমে যাত বা লাযেমে মাহিয়াত আখ্যায়িত করেন, সেগুলো বাস্তবে ঐ যাত বা মাহিয়াতের অস্থায়ী গুণ হয়ে থাকে। যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা ঐ যাত (সত্তা) বা মাহিয়াত (বাস্তবতা) এর সাথে অধিকাংশ সময় সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের ক্ষেত্রে না সেই যাত বা মাহিয়াতের কোন ভূমিকা থাকে আর না তো সে ওগুলোর জন্য এমন অপরিহার্য হয় যে, সেটার পৃথক হওয়া ঐ যাত বা মাহিয়াত থেকে সম্ভব নয়।

তাইতো এ কথা বলা তো সঠিক যে, মহান আল্লাহ আগুনের মধ্যে জ্বালানোর বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কিন্তু এই إحراق বা জ্বালানোটাকে আগুনের لازم ماہیت (লাযেমে মাহিয়াত) আখ্যায়িত করা সঠিক নয়। অতএব কোন আগুনের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলা জ্বালানোর যোগ্যতা সৃষ্টি না করেন, তাহলে আগুনের জ্বালানো ছাড়া পাওয়া যাওয়া সম্ভব। যেমনটি হযরত ইবরাহীম (আ:) এর ঘটনায় হয়েছে।

এ কথাটা মনে থাকলে 'মুজিযাত' বা অলৌকিক ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধিগত জড়তা দৃশ্যমান হয়, সেটা সব সময়ের জন্য দূর হয়ে যাবে।

(বি: দ্র: লাযেমে যাত, লাযেমে মাহিয়াত ইত্যাদি নিরেট মানতিক বা যুক্তিবিদ্যার পরিভাষা, এগুলো বুঝতে হলে এই শাস্ত্রে পারদর্শী কোন আলেম থেকে মেহেরবানী করে বুঝে নিন। –অনুবাদক)

৬৮. পরামর্শের মূলনীতিসমূহ

হযরত আব্বাজান রহ. 'খোদরাঈ' বা "নিজের মতকেই পসন্দ করা" এ ব্যাপারটাকে ঘৃণা করতেন। তিনি হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর এই

মূল্যবান নসীহত বারবার শোনাতেন যে, “যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিয়মের বড় বিদ্যমান আছেন (এর সাথেই হযরত আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. হযরত থানভী রহ. এর এই বাণী নকল করতেন যে, আমি ‘নিয়মের বড়’ এজন্য বলেছি যেহেতু এ ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই ভাল জানবে যে, তার নিকট কে বড়। আর কে ছোট?) তাঁর মতামত না নিয়ে কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করো না। আর যদি নিয়মের বড় না থাকে, তাহলে সমবয়স্কদের সাথে পরামর্শ করো। সেটাও না থাকলে নিজেদের ছোটদের সাথেই পরামর্শ করো।”

আমার আব্বাজান রহ. এর আমল সারাজীবন এমনই ছিল। আর আমরা তো আমাদের আব্বাজানের ঐ যমানাই পেয়েছি যখন তাঁর মুরব্বীরা অধিকাংশই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সমবয়স্কও কম ছিলেন। ছোটরাই বেশি ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে ছোট বড় যাদেরকেই পেতেন, তাঁদের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করতেন।

হযরত আব্বাজান রহ. বলতেন: অন্য কোন ইমামের মত অবলম্বন করতে হলে কয়েকটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া জরুরী। সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, বাস্তবেই এটা মুসলমানদের সম্মিলিত প্রয়োজন কিনা? এমনটি যেন না হয় যে, শুধুমাত্র স্বার্থের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে এই ফয়সালা করা হল। আর হযরত আব্বাজান রহ. এর নিকট এই নিশ্চিন্ত হওয়ার পন্থা হল এই যে, কোন মুফতী নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে এ ফয়সালা করবে না বরং অন্যান্য মুফতীদের সাথে পরামর্শ করবে। যদি তাঁরাও সম্মত হন, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এই ফাতাওয়া দেয়া হবে। দ্বিতীয় কথা হল, যে ইমামের মত গ্রহণ করা হচ্ছে, তার পূর্ণ বিবরণী সরাসরি ঐ মাযহাবের মুফতী আলেমদের কাছ থেকে জেনে নিবে। শুধু কিতাব দেখার উপর ক্ষান্ত করবে না। কেননা অনেক সময় ঐ কথার কিছু জরুরী বিবরণী সাধারণ কিতাবসমূহে উল্লেখ থাকে না। আর সেটা উপেক্ষা করা হলে ‘তালফীক’ বা উভয় মাযহাব হতে সুবিধাগ্রহণের আশংকা থাকে।

৬৯. সুন্নাতের অনুসরণই আসল জিনিস

হযরত আব্বাজান রহ. যখন মদীনা তায়্যিবায় যেতেন এবং রওযায়ে আকদাসে সালাম আরয করার জন্য হাযিরীর সৌভাগ্য হত, তখন সাধারণ অভ্যাস এটাই ছিল যে, মুওয়াজাহা শরীফের জালী থেকে বেশ দূরে একটি পিলারের কাছাকাছি আদবের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এর থেকে আগে বাড়তেন না।

হযরত আব্বাজান রহ. বলেন: একদিন আমি ঐ পিলারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দিলের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হল যে, সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ পবিত্র জালীর কাছাকাছি পৌঁছে যাব। কিন্তু হিম্মত হয়নি। এর উপর অনুশোচনা হচ্ছিল যে, লোকেরা একদম কাছাকাছি চলে যায়, আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ইতোমধ্যে এই অনুভূতি হল যে, রাওযায়ে আকদাস থেকে এ আওয়ায আসছে: “বলে দাও যে ব্যক্তি আমাদের সুন্নাতের অনুসরণ করে সেই আমার নিকটবর্তী। চাই বাহ্যিকভাবে যত দূরই হোক। আর যে আমার সুন্নাতের অনুকরণ করে না, সে আমার থেকে দূরে। চাই সে আমার রাওযার জালী জাপটে দাঁড়িয়ে থাক।”

হযরত আব্বাজান রহ. বলতেন: যারা শুধুমাত্র কোন মুসতাহাব বর্জনের কারণে আম মজমায় বকাঝকা বা অসন্তোষ প্রকাশ আরম্ভ করে দেন, তাদের এ কর্ম পন্থায় দুটি ভুল হয়। একটি হল যে কাজটি মুনকার নয় সেটার বিরোধিতা করা। অপরটি হল, যার বিরুদ্ধে শাসন করা হচ্ছে, তাকে আম মজমায় অপদস্থ করার কৌশল অবলম্বন করা।

আল্লাহ পাক রক্ষা করুন। অনেক সময় এই সমস্ত বকাঝকার অন্তরালে মনের রোগও কাজ করে থাকে যা একটি স্বতন্ত্র গুনাহ। হযরত বলতেন: যারা এ কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করেন, সাধারণত দেখা যায় যে, দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাপারে তারা উদাসীন থাকেন। আদাব ও মুসতাহাব্বাত বড় প্রিয় আমল। যথাসম্ভব এর উপর আমল করা চাই। অন্যদেরকে সোহাগ স্নেহের সাথে এ ব্যাপারে উৎসাহও দেয়া উচিত। কিন্তু সেগুলো বর্জনের কারণে বকাঝকা ও তিরস্কারের পথ অবলম্বন করা সঠিক নয়।

৭০. হাদীস বুঝার একটি মূলনীতি

হযরত আব্বাজান রহ. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর নিকট থেকে শোনা একটি সোনালী মূলনীতিও বলতেন। যা দ্বারা এ অধমের বহু সংখ্যক মাসআলায় বহু ফায়েদা হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন আমলের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেটা দু প্রকার। কিছু কিছু আমল তো এমন যেগুলোর ব্যাপারে বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়

যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে মামূল বা নিজ পবিত্র অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছিলেন। অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঐ সব আমল প্রচুর পরিমাণে প্রমাণিত। অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কিছু কিছু আমল এমনও আছে, যেগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাঝে মধ্যে প্রমাণিত। কিন্তু সেগুলোকে মা'মূল বানিয়ে নেয়া বা সেগুলো নিয়মিতভাবে করা অথবা অন্যকে সেগুলোর ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া প্রমাণিত নয়। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটিকে আপন স্থানে রাখা উচিত।

প্রথম প্রকারের আমলের পাবন্দীর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া সঠিক ও সুন্নাত অনুযায়ী কাজ। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আমলগুলোকে তার স্থানে রাখার দাবী হল, সেগুলোকে ঐভাবেই মাঝে মধ্যে করবে। যেমনটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদাচিৎ করেছেন। কিন্তু এগুলোকে স্বতন্ত্র অভ্যাস বানিয়ে নেয়া আকাংখিত নয়। হযরত বলেন: মহল্লা কোটলার বাইরে একটি মাঠে কিছু ছোট ছোট মেয়ে পরস্পরে লড়াই ঝগড়া করছিল। আমরা নিকটবর্তী হওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে, এই ছোট বালিকাগুলো মাঠ থেকে গোবর সংগ্রহ করে এনেছে। এবং একটি স্থানে স্তূপীকৃত করেছে। এখন এর বন্টনের ব্যাপারে পরস্পরে ঝগড়া হচ্ছে। অংশের কম ও বেশির ব্যাপারে বনিবনা না হওয়ায় একে অপরের উপর তেতে আছে।

প্রথম দৃষ্টিপাতে আমার হাসি আসল যে, এরা কেমন দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসের ব্যাপারে লড়াই করছে! আমরা এদের স্বল্প বুদ্ধির উপর হাসতে হাসতে এদের লড়াই বন্ধ করানোর চেষ্টায় লেগে ছিলাম। ইত্যবসরে কুদরত আমাদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, এদের নির্বুদ্ধিতার উপর যারা হাসাহাসি করছে, অথচ দুনিয়ার মাল আসবাব ও যশ খ্যাতির জন্য তারা লড়ছে, যদি এদের বাস্তবতাদর্শনকারী চোখ নসীব হত, তাহলে তারা বিশ্বাস করত যে, যুগের ঐসব বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানী গুণীদের সমস্ত লড়াই ঝগড়াও মূলত ঐ শিশুদের লড়াই ঝগড়ারই অনুরূপ। ধ্বংসশীল এবং কয়েকদিনের মধ্যে নিজ নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে যাওয়ার এই বস্তুগুলোও আখেরাতের নেয়ামতের তুলনায় সামান্য গোবর থেকে বেশি মর্যাদা রাখে না।

তৃতীয় অধ্যায়

আরেফবিল্লাহ হযরত ডাক্তার মুহাম্মাদ আব্দুল হাই আরেফী রহ. এর ইরশাদাত

১. শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ

যখন অধমের সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন হযরত আরেফী রহ. কয়েকদিন পর্যন্ত আমাদের সান্ত্বনার জন্য দারুল উলূম করাচীতে তাশরীফ আনয়ন করছিলেন। একদিন হযরতের চেহারায় ক্লান্তি ও দুর্বলতার ছাপ দৃশ্যমান ছিল। আমার সম্মানিত বড় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী মুদ্দাযিল্লুহুম অধমকে বললেন যে, "হযরতের জন্য বাসা থেকে হালুয়া আন"।

অধম হালুয়া নিয়ে হযরতের খেদমতে পেশ করলাম। হযরত হাতে নিয়ে বললেন: "এই হালুয়া কি হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এর ছিল? অধম হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে হযরত বললেন: এতে তো সমস্ত ওয়ারিসদের হক আছে। শুধু তোমার জন্য অন্য কাউকে এটা হেবা করা জায়েয নেই। যখন অধম হযরতকে নিশ্চিন্ত করল যে, আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত ওয়ারিস প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সবাই এখানেই বিদ্যমান আছেন। সকলের ঐকান্তিক কামনা এই যে, হযরতওয়ালা এই হালুয়া খাবেন। তখন হযরত রহ. ঐ হালুয়া থেকে একটু খান।

এখন এটাই হল ঐ মাসআলা যার উপর আমলের সময় আজকাল বড় বড় আলেম ও মুফতীদের দৃষ্টিও কমই যায়। কিন্তু যেহেতু শরীয়তের উপর আমল হযরত আরেফী রহ. এর দ্বিতীয় তবিয়ত বনে গিয়েছিল, এজন্য

আমলী জরুরতের সমস্ত বিধি-বিধান স্রেফ ইলমের মধ্যে নয় বরং আমলের মধ্যে সব সময় উপস্থিত থাকত।

সুন্নাত অনুসরণের প্রবল ঝোঁক ছিল। এবং প্রতিটি কাজে এ ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা ছিল যে, এ ব্যাপারে সুন্নাত তরীকা জানতে হবে। এ অনুসন্ধানের ফলেই তিনি "উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" নামক ঐ গ্রন্থ রচনা করেন যা জীবনের প্রতিটি শাখায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তম আদর্শের বিবরণ সম্বলিত অনবদ্য একটি গ্রন্থ। এবং যা উর্দূ ছাড়া, ফার্সী, ইংরেজী, সিন্ধী, পশতু, বাংলা ইত্যাদি না জানি কত ভাষায় সম্ভবত: লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা এটাকে অদ্ভূত কবূলিয়্যত দান করেছেন।

একবার হযরতওয়ালা আরেফী রহ. মাগরিবের পূর্বে নিজ বাসা থেকে দারুল উলূম নানকওয়াড়ায় মজলিসে মুনতাযিমার জলসায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করলেন। আমি অধম ও আমার বড় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেব মুদ্দাযিল্লুহুমও উপস্থিত ছিলাম। জলসাটি মাগরিব নামাযের পরপরই হওয়ার কথা ছিল। এদিকে মাগরিব এর সময় রাস্তার মধ্যেই হয়ে গেছে। ফলে রাস্তার একটি মসজিদে নামায পড়ে নিলাম। যেহেতু নানকওয়াড়ায় দ্রুত পৌঁছার তাড়া ছিল, এজন্য শুধুমাত্র সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়লাম। আর সালাতুল আউয়াবীন না পড়ে নানকওয়াড়ায় পৌঁছে গেলাম।

মজলিসে শেষে সেখানেই ইশার নামায পড়লাম। নামাযের পর যখন হযরতওয়ালা বাইরে আসলেন এবং গাড়ীতে উঠতে লাগলেন, তখন অধমকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "তাকী মিয়াঁ! আজ আউয়াবীনের কী হল?" অধম আরয করল: হযরত! আজ তো তাড়াহুড়ার দরূন সেটা পড়তে পারিনি। হযরত বললেন: কেন থেকে গেল? ঐ সময় পড়তে পারনি, তাহলে ইশার পর পড়তে। অতঃপর বললেন যে, যদিও ফিকহী দৃষ্টিকোণে নফল নামাযের কাযা নেই কিন্তু একজন সালেক বা আল্লাহর পথের পথিকের জন্য ক্ষতি পূরণের জন্য যখন সুযোগ পাবে মা'মূলের নফল নামাযসমূহ অবশ্যই পড়ে নেয়া উচিত। চাই তার মূল সময় গত হয়ে গেছে। আজকে আমিও সময়মত আউয়াবীন আদায় করতে পারিনি, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি ইশার নামাযের পর ইশার সুন্নাত-নাওয়াফেল ইত্যাদির সাথে অতিরিক্ত ছয় রাকাত

ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করেছি। আমার মামূলের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে আমি এভাবেই আদায় করি।

অতঃপর বললেন যে, তোমরা হাদীসের মধ্যে পড়েছ যে, যদি কোন ব্যক্তি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহলে খাওয়ার মাঝেও যখনই মনে পড়বে بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ পড়ে নেয়া চাই। ব্যস, এর উপরই অন্যান্য নফলসমূহকে তুলনা করুন।

২. নফসকে ধোঁকা দিয়ে তার দ্বারা কাজ নাও

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, নফসকে একটু ধোঁকা দিয়ে তার দ্বারা কাজ নাও। তিনি নিজের ঘটনা বয়ান করেন যে, দৈনিক তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ছিল। শেষ বয়সে এবং দুর্বলতার যুগে একদিন আল্লাহ পাকের তাওফীকে তাহাজ্জুদের সময় যখন চোখ খুলল, তখন তবিয়তে খুব অলসতা কাজ করছিল। দিলের মধ্যে খেয়াল আসল যে, আজ তো তবিয়তও পুরোপুরি ঠিক নেই। আলস্যও আছে। আর তোমার বয়সও বেশি। আর তাহাজ্জুদ নামায কোন ফরয বা ওয়াজিব তো আর নয়। মাঝে মধ্যেই পড়ে থাক। আজকে একদিন তাহাজ্জুদ ছুটলে কী অসুবিধা?

হযরত আরেফী রহ. বলেন : আমি চিন্তা করলাম যে, কথা তো ঠিক। তাহাজ্জুদ নামায ফরযও নয়। ওয়াজিবও নয়। আর তবিয়তও ঠিক নাই। তবে এই সময়টা তো মহান আল্লাহর নিকট কবূলিয়্যত এর সময়। হাদীসে পাকে এসেছে: যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায়, তখন মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত পৃথিবীবাসীর প্রতি নিবদ্ধ হয়। আর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষক ঘোষণা দিতে থাকে যে, আছে কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থনাকারী? তাকে ক্ষমা করা হবে। এমন সময়কে অনর্থক নষ্ট করা অনুচিত। নফসকে এভাবে প্রবোধ দেয়া হল যে, আচ্ছা এমনটি কর যে, উঠে বসে যাও। আর বসে একটু দু'আ করে নাও। এরপর দু'আ করে ঘুমিয়ে পড়। ফলে উঠে বসে পড়লেন আর দু'আ আরম্ভ করলেন। দু'আ করতে করতে আমি নফসকে বললাম: মিঞাঁ! যখন তুমি উঠে বসে গেছ, তখন তোমার নিদ্রা চলে গেছে। এখন গোসলখানায় যাও আর ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি থেকে ফারেগ হয়ে যাও। এরপর আরাম করে এসে শুয়ে পড়বে। অতঃপর যখন গোসলখানায় গেলাম এবং ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি প্রয়োজন সারলাম তখন চিন্তা করলাম যে, আচ্ছা উযু করে নেই, কেননা উযু করে দু'আ করলে কবূল

হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে আমি উযু করে নিলাম এবং বিছানায় এসে বসে দু'আ শুরু করে দিলাম। এরপর নফসকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করলাম যে, বিছানায় বসে এটা কী দু'আ হচ্ছে? তোমার দু'আ করার যে স্থান আছে সেখানে গিয়ে দু'আ কর। এটা বলে নফসকে জায়নামায পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলাম এবং গিয়ে দু রাকাত তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়্যত বাঁধলাম।

অতঃপর আমাদের হযরত রহ. বলেন: নফসকে কিছুটা ধোঁকা দিয়েও বশে আনতে হয়। যেমনিভাবে এই নফস তোমাদের সাথে নেক কাজকে টলানোর ধান্ধা করে, এমনিভাবে তোমরাও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবে। এবং তাকে টেনে টেনে নিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে মহান আল্লাহ ঐ আমলের তাওফীক দান করবেন।

৩. রামাযানের দিন ফিরে আসবে

আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই আরেফী ছাহেব রহ. হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর কথা নকল করতেন যে, এক ব্যক্তি রামাযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর অসুস্থতার কারণে রোযা ছেড়ে দিল। এখন তার মনে কষ্ট যে, আহারে রোযা ছুটে গেল!

হযরত রহ. বললেন: দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি এটা চিন্তা কর যে, এই রোযা কার জন্য রাখছ? যদি এই রোযা নিজের সত্তার জন্য রাখছ, তাহলে নিঃসন্দেহে এর উপর দুঃখ কর যে, অসুস্থতা এসে গেল আর রোযা ছুটে গেল। কিন্তু যদি আল্লাহ তাআলার জন্য রোযা রাখছ। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ অথবা সফরে আছে, তারা অন্য দিনগুলোতে রোযা রাখবে।" (সূরা বাকারা : ১৮৪)

বুঝা গেল যে, মাকসূদ এখনো হাসিল আছে। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

অর্থাৎ সফরে রোযা রাখা কোন নেকীর কাজ নয়।"

(সহীহ বুখারী, রোযা অধ্যায় হাদীস নং : ১৯৪৬)

পরবর্তী সময়ে কাযা করলে ঐ সমস্ত নূর ও বারাকাত হাসিল হবে, যা রামাযান মাসে হাসিল হত। কেমন যেন তার ক্ষেত্রে রামাযানের দিন ফিরে আসবে। আর রামাযান এর দিনগুলোতে রোযা রাখার দ্বারা যে ফায়েদা হাসিল হত, ঐ ফায়েদা পরবর্তী সময়ে কাযার দ্বারাও হাসিল হবে। সুতরাং যদি শরয়ী অপারগতার দরুন রোযা কাযা হয়ে যায়, তো এতে মনক্ষুন্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। ঐ সময়ে রোযা ছেড়ে দেয়া এবং পানাহার করাই আল্লাহর পসন্দ। অন্য মানুষেরা রোযা রেখে যে সাওয়াব পাচ্ছে তোমরা খানা খেয়ে ঐ সাওয়াব পাচ্ছ। আর আল্লাহ তাআলা সেই নূর ও বরকতই দান করবেন যা সাধারণ রোযাদারদেরকে দান করছেন। ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

৪. সময়ের চাহিদা দেখুন

বাস্তবতা হল এই যে, বুযুর্গদের ছোট ছোট কথার দ্বারা মানুষের যিন্দেগী পরিশুদ্ধ করার দ্বার উম্মুক্ত হয়ে যায়। আমাদের হযরত আরেফী রহ. বলতেন: মিঞাঁ! সবসময় সময়ের তাকাযা বা দাবী কী সেটা দেখবে। এই সময় আমার নিকট কী তলব করছে? এটা চিন্তা কর না যে, এই সময় আমার কোন্ কাজ করতে মনে চাচ্ছে? মনের চাওয়ার ব্যাপার নয়। বরং এটা দেখ যে, এই সময় তাকাযা কোন্ কাজের? ঐ তাকাযা পুরা কর। এটাই আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায়। তুমি তো মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছ যে, প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ব। প্রতি রাতে বা দিনে এত পারা তিলাওয়াত করব। দৈনিক এত এত তাসবীহাত পাঠ করব। এখন যখন এই কাজগুলোর সময় হল, তো মন চাচ্ছে যে, আমি এই কাজটি পুরো করব আর মনের মধ্যে রয়েছে ঐ কাজের চাপ। এখন ঠিক ঐ মুহূর্তে হয়ত বাসার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফলশ্রুতিতে তার সেবা শুশ্রুষা, ঔষধপত্র আনার ব্যস্ততা, যদ্দরুন নির্ধারিত মা'মূল ছুটে যাচ্ছে। এই সময় তো আমি বসে তিলাওয়াত করতাম, যিকির-আযকার করতাম। কিন্তু ছুটাছুটি করছি, কখনো ডাক্তারের নিকট, কখনো হাকীমের নিকট, কখনো দাওয়াখানায়। এটা আমি কোন্ চক্করে ফেঁসে গেলাম। আরে আল্লাহ তাআলা যখন যে চক্করে ফেলেন, ঐ সময়ের তাকাযা হল ঐটা কর। যদি ঐ সময় ঐ কাজ বাদ দিয়ে তিলাওয়াতে বসে যাও, তাহলে এটা আল্লাহ তাআলার পসন্দ নয়। এখন সময়ের তাকাযা হল এই কাজ কর। এখন এই কাজেই ঐ সাওয়াব পাওয়া যাবে যা তিলাওয়াত করলে পাওয়া যেত। এটা হল প্রকৃত দ্বীন।

৫. "ইহসান" সব সময় কাম্য

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. একদিন বলছিলেনঃ জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট এসে খুব অহংকারের ভাব নিয়ে খুশীর সাথে চলতে লাগলেনঃ আল্লাহর শোকর যে, আমার "ইহসান" এর মর্তবা হাসিল হয়ে গেছে।

"ইহসান" একটি বড় মর্যাদা, যার ব্যাপারে হাদীসে পাকে এসেছেঃ

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

অর্থাৎ "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর কেমন যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে এই খেয়ালের সাথে ইবাদত কর যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে দেখছেন।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান হাদীস নং : ৫০)

এটাকে ইহসানের মর্তবা বলা হয়। ঐ ব্যক্তি হযরতওয়ালাকে বললেনঃ আমার "ইহসান" এর মর্তবা হাসিল হয়ে গেছে। হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলেনঃ আমি তাকে মুবারকবাদ দিলাম যে, আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন। এটা তো অনেক বড় নেয়ামত। অবশ্য আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি সেটা হচ্ছে এই যে, আপনার "ইহসান" এর এই অবস্থা কি শুধু নামাযের মধ্যেই হাসিল হয়? যখন স্ত্রী-সন্তানদের সাথে উঠাবসা করে তখনও কি আপনার মনে এই খেয়াল থাকে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন? নাকি এই খেয়াল ঐ সময় আসে না? ঐ ব্যক্তি উত্তরে বললেন : হাদীসের মধ্যে তো ইবাদত সম্পর্কে এসেছে। আমরা তো এটাই মনে করি যে, "ইহসান" এর সম্পর্ক শুধুমাত্র নামাযের সাথে। অন্য জিনিসের সাথে "ইহসান" এর কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলেন : আমি এ জন্যই আপনাকে প্রশ্ন করেছি। কেননা বর্তমানে ব্যাপক আকারে এই ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে যে, "ইহসান" শুধুমাত্র নামাযের মধ্যেই কাম্য। অথবা যিকির ও তিলাওয়াতের মধ্যেই কাম্য! অথচ "ইহসান" সব সময় কাম্য। জীবনের প্রতিটি ধাপে ও প্রতিটি শাখায় কাম্য। দোকানে বসে ব্যবসা করছ, সেখানেও "ইহসান" কাম্য। অর্থাৎ অন্তরে এ কথা হাযির থাকা চাই যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন। নিজ অধীনস্তদের সাথে লেনদেনের সময়ও "ইহসান" কাম্য। স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রেও

"ইহসান" কাম্য যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন। বাস্তবে ইহসানের মর্তবা স্রেফ নামায পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

৬. হযরত ডাক্তার ছাহেব রহ. এর কারামত

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. মাঝে মধ্যে আমাদেরকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বলতেন : আজ আমার বিবাহের ৫৫ (পঞ্চান্ন) বছর হয়ে গেছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত কখনো স্ত্রীর সাথে স্বর পরিবর্তন করে কথা বলিনি।

আমি বলে থাকি : লোকেরা পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া আর বাতাসে উড়তে পারাকে কারামত মনে করে। আসল কারামত তো হচ্ছে এই যে, পঞ্চান্ন বছর স্ত্রীর সাথে জীবন কাটিয়েছে। আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাই এমন, যেখানে নিশ্চিতভাবে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। মনোমালিন্য হবে না এটা হতেই পারে না। অথচ হযরত বলছেন : আমি স্বর পরিবর্তন করে কথা বলিনি।

এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে ডাঃ ছাহেব রহ. এর স্ত্রী বলছেন : সারা জীবন কখনো আমাকে একথা বলেননি যে, "আমাকে পানি পান করাও"। অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে কোন কাজের নির্দেশ দিয়ে বলেননি যে, এ কাজ কর। আমি আমার শখ ও আগ্রহে সৌভাগ্য মনে করে তাঁর ব্যাপারে খেয়াল রাখতাম এবং তাঁর কাজ করে দিতাম। কিন্তু সারা জীবন তিনি আমাকে মুখের দ্বারা কোন কাজের নির্দেশ দেননি।

৭. মানবসেবা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন : আমি তো নিজেকে এটাই মনে করে নিয়েছি যে, এটাই আমার বিশ্বাস এবং এ অবস্থাতেই আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার আশা রাখি যে, আমি একজন খাদেম। আমাকে তো আল্লাহ তাআলা খেদমতের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমার সাথে সম্পৃক্ত যত মানুষ আছে, সকলের খেদমত করা আমার দায়িত্ব। আমাকে মাখদূম বানিয়ে পাঠানো হয়নি যে, অন্য মানুষেরা আমার খেদমত করবে। বরং আমি খাদেম। নিজ স্ত্রীরও খাদেম। সন্তানদেরও খাদেম। মুরীদদেরও খাদেম এবং আমার সাথে সম্পৃক্ত সকলেরই খাদেম। কেননা বান্দার জন্য খাদেম হওয়ার মাকামই ভাল। এজন্য আমি খাদেম।

কবি বলেন :

زتسبیح وسجادہ ودلق نیست + طریقت بجز خدمت خلق نیست

শুধু তাসবীহ, জায়নামায আর দরবেশী পোষাক এর নাম তরীকত নয়। তরীকত মানবসেবা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

হযরত রহ. বলতেন : যখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি খাদেম, মাখদূম নই তো খাদেম অন্যের উপর কিভাবে এ হুকুম দিতে পারে যে, এ কাজ করো।

সারা জীবন এভাবে অতিবাহিত করেছেন যে, যখন প্রয়োজন সামনে আসত নিজেই কাজ করতেন। কাউকে বলতেন না।

এই হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ। বাহ্যিক ব্যাপারগুলোতে তো আমরা সুন্নাতের অনুসরণ করি। কিন্তু এর পাশাপাশি আখলাক, মুআমালাত বা লেনদেন মুআশারাত বা সামাজিকতা বরং জীবন যাপনের সমস্ত পথেই সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যক।

৮. একটি অদ্ভূত ঘটনা

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. একদিন দারুণ অদ্ভূত একটি ঘটনা শোনালেন যে, আমার একজন মুরীদ ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উভয়ে আমার মজলিসে আসা যাওয়া করতেন। আর কিছু ইসলাহী সম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একবার উভয়ে তাদের বাসায় আমাকে দাওয়াত করেন। আমি তাদের বাসায় গিয়ে খানা খেলাম। অত্যন্ত সুস্বাদু রান্না হয়েছিল। যখন আমি খানা থেকে ফারেগ হলাম তখন ঐ মহিলা মুরীদ পর্দার পেছনে আসলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। আমি বললাম : তুমি দারুণ সুস্বাদু খানা রান্না করেছ। খেতে খুব মজা লেগেছে। আমি এ কথা বলার পর পর্দার ওপাশ থেকে ঐ মহিলার কান্না এবং হেঁচকির আওয়ায আসছিল। আমি হয়রান হয়ে গেলাম যে, না জানি আমার কোন্ কথায় সে মনে কষ্ট পেয়েছে আর তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, কী ব্যাপার কাঁদছ কেন? ঐ মহিলা অনেক কষ্টে নিজের কান্না সংবরণ করে বললেন : হযরত! আমার স্বামীর সাথে আমি আজ চল্লিশ বছর ধরে সংসার করছি। কিন্তু এই পুরো সময়ে আমি আমার স্বামীর মুখে একবারও একথা শুনিনি যে, "আজ রান্না মজাদার হয়েছে"। আপনার মুখে আজ আমার রান্নার প্রশংসা শুনে আমার কান্না চলে এসেছে।

৯. এমন ব্যক্তি খানার প্রশংসা করবে না

হযরতওয়ালা রহ. এ ঘটনা খুব বেশি বেশি শুনিয়ে বলতেন যে, ঐ ব্যক্তি কখনো এমন কাজ করতে পারে না, যার অন্তরের অনুভূতি এই যে, আমার স্ত্রী আমার যে খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে, এটা তাঁর সুন্দর ব্যবহার ও অমায়িক আচরণ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে দাসী-বাঁদী মনে করে সে তো এটা মনে করবেই যে, খানা রান্না করা স্ত্রীর ফরয দায়িত্ব। খানা ভাল রান্না করলে এতে আবার তার প্রশংসা করার কীবা আছে? এমন ব্যক্তি কখনো স্বীয় স্ত্রীর প্রশংসা করবে না।

১০. আল্লাহ তাআলার রহমত বাহানা তালাশ করে

হযরত ডা: আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : আল্লাহ তাআলার রহমত বাহানা তালাশ করে। যখন তিনিই আমাদেরকে হাজী ছাহেবদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে এর অর্থ হল এই যে, হাজী ছাহেবদের উপর মহান আল্লাহর যে পরিমাণ রহমত নাযিল করা উদ্দেশ্যে, সেটার কিছু অংশ তিনি আমাদেরকেও দিতে চান। যাতে করে যখন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ পাকের বান্দাগণের উপর রহমত এর বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ঐ মেঘমালার কোন একটা টুকরো যেন আমাদের উপরও রহমত বর্ষণ করে।

তো এই সাদৃশ্য সৃষ্টি করাও নেয়ামত। আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ. খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব রহ. এর এই কবিতাগুলো খুব বেশি বেশি পড়তেন।

تیرے محبوب کی یارب شباہت لیکے آیا ہوں

حقیقت اسکو تو کردے میں صورت لیکے آیا ہوں

(কাব্যানুবাদ) হয়েছি হাযির প্রভু আমি তোমার হাবীবের সাদৃশ্য লয়ে,

হাকীকত তুমি দাও গো তাতে এসেছি আমি সূরত নিয়ে।

এটা তো আশ্চর্যের কিছুই নয় যে, আল্লাহ তাআলা ঐ বাহ্যিক সাদৃশ্য অবলম্বনের বরকতে হাকীকতও আমাদেরকে দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

১১. আল্লাহর মাহবুব বনে যাও

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, বাইতুল খালা বা গোসলখানায় প্রবেশ করছ, তাহলে প্রথমে বাম পা ঢুকাও, আর প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়ে নাও :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুষ্ট পুরুষ ও নারী জ্বিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। আর এই নিয়্যত কর যে, এ কাজটি আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণে করছি।

ব্যস, অতঃপর যখনই এই কাজ করবে, মহান আল্লাহর মাহবূবিয়্যত হাসিল হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেনঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, "আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মাহবূব বানিয়ে নিবেন।" (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

এ জন্য যদি ছোট ছোট কাজ সুন্নাতের প্রতি যত্নবান থেকে করা হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রিয় হওয়া যাবে। আর যদি মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমরা সুন্নাতের অনুসরণকারী হতে পারি, তবে আমরা পরিপূর্ণ মাহবূব হতে পারব।

হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী রহ. বলেন : আমি অনেক দিন এই রিয়াযত ও মশক করেছি যে, ঘরে প্রবেশ করেছি, খানা সামনে রাখা আছে, প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে, খেতেও মন চাচ্ছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য থেমে গেছি যে, খানা খাব না। এর পরবর্তী মুহূর্তে অন্তরে এই খেয়াল এনেছি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত তো ছিল এই যে, যখন তাঁর সামনে ভাল খানা আসত, তখন তিনি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করে খানা খেতেন।

এখন আমরাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণে খানা খাব। সুতরাং এখন যে খানা খেলাম সেটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণে খেলাম। এর উপর আল্লাহ তাআলার মাহবূবিয়্যতও হাসিল হয়ে গেছে। আর মনও পরিতৃপ্ত হয়েছে।

১২. যদি এ মুহূর্তে বাদশাহর পয়গাম এসে পড়ে

হযরত ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : যদি তোমাদের নামাযে যেতে অলসতা আসে। উদাহরণস্বরূপ ফজরের নামায বা তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতে অলসতা অনুভূত হচ্ছে, চোখ খুলে গেছে। কিন্তু ঘুমের প্রাবল্য আছে। বিছানা ছাড়তে মনে চায়না। তাহলে ঐ সময় সামান্য একটু চিন্তা করো যে, এই নিদ্রার প্রাবল্যের সময় যদি তোমার নিকট এই পয়গাম আসে যে, রাষ্ট্রপ্রধান তোমাকে অনেক বড় সম্মান দিতে চান আর ঐ সম্মান তোমাকে ঐ সময়েই দেয়া হবে, তাহলে বল ঐ নিদ্রা বা অলসতা কি আর থাকবে? জানা কথাই যে, ঐ নিদ্রা এবং অলসতা সব গায়েব হয়ে যাবে। কেন? এ জন্য যে তোমার অন্তরে এই সম্মানের মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। যে কারণে তুমি তোমার স্বভাবের বিপরীত কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছ। আর তুমি চিন্তা করবে যে, কিসের উদাসীনতা? কিসের নিদ্রা? এই সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করার জন্য তুমি দৌড়ে যাবে। যদি এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় আর হাতে আসবে না। ফলে তুমি ঐ সম্মানের টানে নিদ্রা-আরাম সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে পড়বে।

কাজেই দুনিয়ার একজন বাদশার পক্ষ থেকে সম্মান লাভের জন্য যদি তুমি নিদ্রা ত্যাগ করতে পার, নিজের আরাম বাদ দিতে পার, তাহলে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এবং আহকামুল হাকিমীনকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিদ্রা ও আরাম ছাড়তে পারবে না? যখন কোন না কোন কারণে আরাম-নিদ্রা ছাড়তে হয়, তাহলে কেন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সামান্য আরাম ও শান্তিকে ত্যাগ করা হবে না?

১৩. নিজের শখ পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়

হযরত ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে ভাই! নিজের শখ পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ এর নাম হল দ্বীন। তুমি এটা দেখ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এ সময় তাকাযা কিসের? ব্যস ঐ তাকাযা পূর্ণ কর। এর নাম দ্বীন। এর নাম দ্বীন নয় যে, আমার ঐ জিনিসের শখ হয়েছে। ঐ শখ আমি পূর্ণ করব। উদাহরণস্বরূপ : কারো এই শখ পয়দা হল যে,

আমি সব সময় প্রথম কাতারে নামায পড়ব। কারো এ কথার শখ হল যে, আমি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বের হব। যদিও এ সবই দ্বীনের কাজ এবং নেকী ও পুণ্যের কাজ। কিন্তু তুমি দেখ সময়ের তাকাযা কি? উদাহরণস্বরূপ ঘরে-পিতা মাতা অসুস্থ আর তাঁদের তোমার খেদমত প্রয়োজন। কিন্তু তোমার তো এ শখ জেগেছে যে, প্রথম কাতারে গিয়ে জামাআত এর সাথে নামায আদায় করব অথচ পিতা মাতা এত বেশি অসুস্থ যে, নড়াচড়া করতে পারেন না।

এখন এ পরিস্থিতিতে তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকাযা এই যে, প্রথম কাতারের নামায ছেড়ে দাও এবং পিতা মাতার খেদমত আঞ্জাম দাও। তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। আর নামায বাসায় একাকী পড়ে নাও। এখন যদি তুমি পিতা মাতাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে আস যে, তাঁরা নড়াচড়ার যোগ্যও নন অথচ তুমি নিজ আগ্রহ পূর্ণ করার জন্য মসজিদে চলে গেলে এবং কাতারে গিয়ে শামিল হয়ে গেলে, তাহলে এটা দ্বীনের অনুসরণ হল না বরং স্বীয় শখ পূর্ণ করা হল।

এই বিধান হল ঐ সময় যখন মসজিদ দূরে হবে। মসজিদে আসতে বা যেতে সময় লাগবে, এদিকে পিতা-মাতার অবস্থা এমন যে, তাঁদের কষ্ট হবে। কিন্তু যদি মসজিদ একেবারেই ঘর সংলগ্ন হয় আর পিতা-মাতার অবস্থাও এমন যে, তাঁদের ছেলের সামান্য সময় দূরে থাকার দরুন কষ্ট হবে না। অথবা বাসায় অন্য কোন খেদমতকারী আছেন, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথেই নামায আদায় করা উচিত।

১৪. শরীয়ত, সুন্নাত, তরীকত

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন : "হুকূক" বা হকসমূহ পুরোটাই শরীয়ত। অর্থাৎ শরীয়ত হল হকসমূহ আদায়ের নাম। আল্লাহ তাআলার হক। বান্দার হক এবং 'হুদূদ' বা সীমারেখাসমূহ পুরোটাই সুন্নাত। অর্থাৎ সুন্নাত দ্বারা এটার সন্ধান পাওয়া যায় যে, কোন্ হকের কী হদ বা সীমারেখা? আল্লাহ তাআলার হকসমূহের সীমারেখা কতটুকু? আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতসমূহ এটা বর্ণনা করে যে, কোন্ হকের উপর কোন্ সীমারেখা পর্যন্ত আমল করা হবে? আর হুদূদের হেফাযত পুরোটাই "তরীকত"। অর্থাৎ তরীকত যাকে তাসাওউফ এবং সুলূক বলা হয় ঐ সব সীমারেখার হেফাযতেরই অপর নাম। অর্থাৎ ঐ সব

সীমারেখা যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলোর হেফাযত তাসাওউফ এবং সুলূকের উপলক্ষ হয়ে থাকে।

সারকথা এটাই যে, "শরীয়ত" হল পুরোটাই হুকূক "সুন্নাত" পুরোটাই হুদূদ এবং "তরীকত" পুরোটাই হুদূদের হেফাযত এর নাম। অতএব এ তিনটি জিনিস যদি হাসিল হয়ে যায়, তাহলে আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধারণত এই জিনিসগুলো ঐ সময় পর্যন্ত হাসিল হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সামনে নিজেকে না মিটায়। কবি বলেন :

قال را بگزار صاحب حال شو + پیش مرد کامل پامال شو

চাপাবাজী ছাড় হালওয়ালা হও,

কামেল ব্যক্তির সামনে নিজেকে মিটিয়ে দাও।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোন কামেল ব্যক্তির সামনে নিজেকে মিটিয়ে না দিবে অতক্ষণ পর্যন্ত এটা হাসিল হবে না। বরং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িতেই লিপ্ত হবে। কখনো এদিকে ঝুঁকবে কখনো ওদিকে ঝুঁকবে।

সমস্ত তাসাওউফের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে বাঁচানো। এবং তাকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে আসা। এবং তাকে এটা বলা যে, কখন দ্বীনের কী তাকাযা আছে?

১৫. সোজা জান্নাতে যাবে

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : রাত্রে শোয়ার সময় কয়েকটি কাজ কর। একটা হল, সারা দিনের গুনাহ থেকে তাওবা করা। বরং অতীতের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা কর। উযু করে এই দুআ পড় :

اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْٓ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْٓ اَرْسَلْتَ

অর্থাৎ "আমি ঈমান আনলাম আপনার কিতাবের উপর যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার নবীর উপর যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন।" অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

এই দুআর মাধ্যমে ঈমানেরও নবায়ন হয়ে গেল। এরপর ডান পার্শ্বে শুয়ে পড়। এর ফলাফল এই হবে যে, সারা রাতের নিদ্রা ইবাদত হয়ে যাবে।

আর যদি এই অবস্থায় রাত্রে তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। তাহলে ইনশাআল্লাহ সোজা জান্নাতে চলে যাবে। আল্লাহ পাক চাইল কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না।

১৬. প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে

হযরত ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাযের পর কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও মামূলাত থেকে ফারেগ হয়ে একবার আল্লাহ পাকের সাথে এই অঙ্গীকার কর যে, ইয়া আল্লাহ! আজ সারা দিন আমি যা কিছু করব আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করব। ঘরে যাব তো আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। এ সব কাজ আমি এ জন্য করব যেহেতু এ সব হক আপনি আমার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আর যখন একবার এই নিয়্যত করে নিল, তখন এটা আর দুনিয়ার কাজ থাকল না। বরং এ সব দ্বীনের কাজ। এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ। এ সব কাজের কারণে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় না বরং ঐ সম্পর্ক আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়।

১৭. যা করার এখনই করে নাও

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. আমাদেরকে সতর্ক করতঃ বলতেন: আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যৌবন দান করেছেন, সুস্থতা দিয়েছেন, অবসর দিয়েছেন। এগুলো কাজে লাগাও। আর যা কিছু করার এখনই করে নাও। এখনই ইবাদত কর। আল্লাহর যিকির কর। গুনাহসমূহ থেকে বাঁচ। পরবর্তীতে যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে বা দুর্বল হয়ে যাবে, তখন কিছুই করতে পারবে না। আর এই কবিতা পাঠ করতেন :

ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں
وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکاں میں

অর্থাৎ, এখনো তো তার পদশব্দে আমি নয়নযুগল দেই খুলে,
সেটা কেমন মুহূর্ত হবে যখন থাকবে না এটাও সম্ভবে?

তখন যদি মনেও চায় যে, আখেরাতের কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে নেই। করতে পারবে না। সম্ভব হবে না।

১৮. এরপরও কি নফস অলসতা করবে?

হযরত ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : দেখ সময়কে কাজে লাগানোর পদ্ধতি শুনে নাও। উদাহারণস্বরূপ : মনে মনে তোমার ইচ্ছা এই যে, ঐ সময় কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করব অথবা নফল নামায পড়ব। কিন্তু যখন ঐ ওয়াক্ত আসল, তখন মনের মধ্যে অলসতার ভাব অনুভূত হচ্ছে, উঠতে মনে চাচ্ছে না। কিন্তু তুমিই বল যদি ঐ সময় রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এই পয়গাম আসে যে, আমি তোমাকে অনেক বড় পদমর্যাদা বা বিরাট বড় পুরস্কার অথবা দারুণ আকর্ষণীয় চাকুরী দিব। এ জন্য তুমি এখনই আমার কাছে চলে আস! বল তখনও কি তোমার মধ্যে অলসতা থাকবে? আর তুমি কি এই উত্তর দিবে যে, আমি এখন আসতে পারছিনা, আমার ঘুম আসছে।

কোন মানুষ যার মধ্যে সামান্য বুদ্ধি ও বিবেক আছে, বাদশাহের এ পয়গাম শুনে তার সমস্ত অলসতা, নিদ্রা দূর হয়ে যাবে। আর আনন্দের আতিশয্যে সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুরস্কার নেয়ার জন্য দৌড় দিবে যে, আমি এত বড় পুরস্কার পেতে চলেছি।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বাস্তবিকপক্ষে উঠতে কোন সমস্যা নেই। যদি বাস্তবেই উঠতে কোন সমস্যা হত, তাহলে সে ঐ সময় যেত না বরং বিছানায় পড়ে থাকত। এ জন্য এটা চিন্তা করুন যে, দুনিয়ার একজন সামান্য বাদশাহ যিনি সম্পূর্ণ অক্ষম অক্ষম অক্ষম, তিনি যদি আপনাকে কোন পদ বা পুরস্কারের জন্য ডাকেন, তাহলে তার জন্য আপনি দৌড়ে যান, কিন্তু আহকামুল হাকিমীন যাঁর নিয়ন্ত্রণে পুরো বিশ্ব, যিনি দিতেও পারেন ছিনিয়েও নিতে পারেন, তার পক্ষ থেকে ডাক আসছে। এরপরও আমরা কেন অলসতা করি?

এভাবে চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ হিম্মত সৃষ্টি হবে। আর যে সময়টি অনর্থক নষ্ট হচ্ছে, সেটা ইনশাআল্লাহ কাজে লাগবে।

১৯. গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

একবার হযরত ডাক্তার ছাহেব রহ. বলছিলেন : এই যে গুনাহের চাহিদা সৃষ্টি হয়, এটার চিকিৎসা এভাবে কর যে, যখন অন্তরে এই প্রচন্ড তাকাযা পয়দা হয় যে, এই দৃষ্টিকে অপাত্রে ব্যবহার করে স্বাদ হাসিল করব, তখন ঐ সময় একটু একথা চিন্তা করো যে, যদি আমার আব্বা আমাকে এ অবস্থায়

দেখে ফেলেন তারপরও কি আমি এ কাজ অব্যাহত রাখব? অথবা যদি আমি জানতে পারি যে, আমার শাইখ আমাকে এ অবস্থায় দেখছেন, তাহলে কি আমি এরপরও এ কাজ জারী রাখব? অথবা আমার জানা থাকে যে, আমার সন্তানগণ আমার এ কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করছে তাহলে কি আমি সেই কাজ করতে থাকব? বলাবাহুল্য যে, যদি এদের মধ্যে কেউ আমার ঐ কাজটি দেখতে থাকে, তাহলে আমি আমার দৃষ্টি নত করে ফেলব এবং ঐ কাজটি করব না। চাই দিলের মধ্যে যত প্রচণ্ড তাকাযাই সৃষ্টি হোক না কেন। অতঃপর এটা চিন্তা কর যে, এদের দেখা বা না দেখারা দ্বারা আমার দুনিয়া-আখেরাতে কোন পার্থক্য হবে না। কিন্তু আমার এই অবস্থা যে আহকামুল হাকিমীন দেখছেন, সেটার পরোয়া আমার হবে না কেন? কেননা তিনি আমাকে এ অবস্থার উপর শাস্তিও দিতে পারেন।

এই খেয়াল ও চিন্তার বরকতে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা ঐ গুনাহ থেকে হেফাযত করবেন।

২০. যদি তোমার যিন্দেগীর ফিল্ম চালিয়ে দেয়া হয় তাহলে?

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন যে, তোমরা একথাটা একটু ভাব যে, যদি আল্লাহ তাআলা আখেরাতে তোমাদেরকে এ কথা বলেন যে, আচ্ছা যদি জাহান্নামকে তোমাদের ভয় লাগে, তাহলে চলো তোমাদেরকে আমি জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দিব। কিন্তু সেটার জন্য একটি শর্ত আছে আর তা হচ্ছে এই যে, তোমার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তের ফিল্ম আমি চালিয়ে দিব। আর ঐ ফিল্ম যারা দেখবে তাদের মধ্যে তোমার আব্বা আম্মা ভাই বোন সন্তান শিষ্য উস্তাদ বন্ধু বান্ধব সবাই থাকবে, এই ফিল্মের মধ্যে তোমার পুরো যিন্দেগীর নকশা মানুষের সামনে উন্মোচন করে দেয়া হবে। যদি তুমি এ কথার উপর সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তোমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে।

অতঃপর হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন : এ জাতীয় ক্ষেত্রে সম্ভবত: মানুষ আগুনের শাস্তিকে গ্রহণ করে নিবে কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে না যে, এ সমস্ত মানুষের সামনে আমার যিন্দেগীর নকশা এসে যাক।

অতএব যখন স্বীয় পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এবং অন্য মাখলূকের সমানে নিজ জীবনের গোপন অধ্যায় ফাঁস হয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারে না, তাহলে এই সমস্ত হালত আল্লাহর সামনে আসা কিভাবে মেনে নিবে? এটা একটু চিন্তা করো।

২১. ইখলাস কাম্য

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. দারুণ আবেগ নিয়ে বলতেন : যখন তোমরা সেজদায় যাও, তখন সেজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى কতবার বলো? মেশিনের মত যবানের উপর এই তাসবীহ জারী হয়ে যায়। কিন্তু যদি কোন একদিন এই কালিমায়ে "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" একবার ইখলাস এর সাথে অন্তর থেকে বের হয়ে পড়ে তাহলে বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ তাআলা ঐ একবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى এর বদৌলতে বেড়া পার করে দিবেন।

এজন্য এটা খেয়াল করবে না যে, একা একা ঘরে থেকে ইবাদত করলে নিদ্রা এসে পড়বে। এ জন্য নিদ্রা চলে আসলে ঘুমিয়ে পড়। কিন্তু অল্প কিছু মুহূর্ত যা ইবাদত এর মধ্যে কাটাও সেটা সুন্নাত অনুযায়ী কাটাও।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত হচ্ছে এই যে, যদি কুরআন শরীফ পড়তে পড়তে ঘুম চলে আসে, তাহলে ঘুমিয়ে পড়। শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুম পুরো করে উঠে যাও। যাতে এমন না হয় যে, নিদ্রার প্রাবল্যের কারণে তোমার মুখ থেকে ভুল কিছু বের হয়ে গেল!

অতএব মনে করুন একজন মানুষ সারা রাত সুন্নাতের বরখেলাপ জাগ্রত থাকল আর আরেকজন মানুষ মাত্র এক ঘণ্টা জাগ্রত থেকেছে। কিন্তু সুন্নাত অনুযায়ী জাগ্রত থেকেছে। তাহলেই এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা কয়েকগুণ শ্রেষ্ঠ।

২২. একটি চমৎকার উদাহরণ

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন : একদিন কোন মানুষের নিকট গিয়ে তার প্রশংসা কর এবং তার ব্যাপারে ভাল ভাল কথা বল। পরের দিন পুনরায় গিয়ে তার প্রশংসা কর। তৃতীয় দিন পুনরায় গিয়ে প্রশংসামূলক কথা বল।

এখন তোমার এই আমলটি যদি তার কাছে পসন্দ হয়, তাহলে সে তোমার কথা শুনবে, নিষেধ করবে না। কিন্তু যদি তোমার এই আমল তার পসন্দ না হয়, তাহলে একবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার সে তোমাকে বের করে দিবে। এবং তোমাকে প্রশংসা করতে দিবে না।

এমনিভাবে যখন তুমি মহান আল্লাহর যিকির করেছ এবং আল্লাহ তাআলা সেটা জারী রেখেছেন এবং তোমাকে পুনরায় তাওফীক দিয়েছেন। আবার তাউফীক দিয়েছেন, তো এটা একথারই আলামত যে, তোমার এই

আমলটি মহান আল্লাহর পসন্দীয়। এই ভাঙ্গা চোড়া আমলই তাঁর নিকট পসন্দনীয়। এ জন্য এটাকে অবজ্ঞা কর না। বরং এর উপর আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় কর।

২৩. সমস্ত কথার সারনির্যাস

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : সোজা-সাপ্টা কথা এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে থাক আর প্রত্যেক আমলের উপর আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে থাক যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি নিজ অনুগ্রহে তাউফীক দান করেছেন। আপনার শোকর। আমার তো কোন শক্তিই ছিল না। আর স্বীয় ত্রুটি বিচ্যুতির কথা মনে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা ও ইসতিগফার কর যে, ইয়া আল্লাহ! আমার দ্বারা অন্যায় হয়ে গেছে। আমাকে মাফ করে দিন। এমনটি করলে আল্লাহ পাক চাহেন তো তাওয়াযু বা বিনয়ের হকও আদায় হয়ে যাবে। শোকরের হকও আদায় হবে। আর অহংকারও কাছে আসতে পারবে না।

২৪. বেশি বেশি শোকর আদায় করুন

আমাদের হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বারবার বলতেন : আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি। এখন হয়ত তোমরা কথাটার কদর করতে পারবে না। যদি কখনো আল্লাহ তাআলা বুঝার তাউফীক দান করেন, তখন তোমাদের কদর বুঝে আসবে। সেটা হল এই যে, বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে। এ জন্য যত বেশি শোকর আদায় করবে আভ্যন্তরীণ ব্যাধিগুলোর গোড়া কেটে যাবে।

বাস্তব কথা এই যে, ঐ সময় এ কথাগুলো এতটা বুঝে আসত না। এখন তো কিছু কিছু বুঝে আসছে যে, এই শোকর এমন দৌলত যা অনেক আভ্যন্তরীণ রোগ ব্যাধির মূলোৎপাটনকারী। হযরত রহ. বলতেন : মিঞা! ঐ রিযাযত আর মুজাহাদা তোমরা কোথায় করবে? যা পূর্বের যুগের লোকেরা আপন আপন শাইখের নিকট গিয়ে করত। ঘষামাজা খেতেন। মেহনত করতেন, কষ্ট উঠাতেন, ক্ষুধার্ত থাকতেন। তোমাদের নিকট এত সময় কোথায়? আর এত সুযোগই বা কোথায়? ব্যস একটা কাজ কর, আর সেটা হল বেশি বেশি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর। যত বেশি শোকর বা

কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, ইনশাআল্লাহ বিনয় সৃষ্টি হবে। আল্লাহর রহমতে তাকাব্বুর বা অহংকার দূর হবে। আত্মার ব্যাধিসমূহ দূরীভূত হবে।

২৫. এ তিক্ত ঢোক পান করতে হবে

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, নযরের ভুল ব্যবহার অন্তরের জন্য হত্যাকারী বিষতুল্য। যদি দিল বা অন্তরের সংশোধন কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে সর্বপ্রথম ঐ নযর বা দৃষ্টির হেফাযত করতে হবে। এ কাজটি খুব কঠিন মনে হয়। বর্তমানে নযরের হেফাযত অত্যন্ত কঠিন কাজ। চতুর্দিকে বেপর্দেগী, পর্দাহীনতা। উলঙ্গপনা আর অশ্লীলতার বাজার গরম। এমন পরিস্থিতিতে স্বীয় দৃষ্টির হেফাযত খুব মুশকিল মনে হয়। কিন্তু যদি ঈমানের স্বাদ হাসিল করা উদ্দেশ্য হয় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে সম্পর্ক ও মহব্বত কাম্য হয়, নিজ ভেতরগত অবস্থার পরিচ্ছন্নতা তথা আত্মশুদ্ধি মাকসূদ হয়, তাহলে এই তিক্ত ঢোক পান করতেই হবে। এই তিক্ত ঢোক পান করতেই হবে। এই তিক্ত ঢোক পান করা ব্যতীত সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না। কিন্তু এই তিক্ত ঢোকটি এমন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তো খুব তিক্ত। কিন্তু যদি এর একটু অভ্যাস করতে পার, তাহলে এই ঢোকই এমন মিষ্টি হয়ে যায় যে, অতঃপর এটা ছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না।

২৬. দুআর পরে যদি গুনাহ হয়ে যায়?

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন : যখন তুমি এই দু'আ করলে ইয়া আল্লাহ! আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচান। কিন্তু এ দু'আর পর তুমি আবার গুনাহে লিপ্ত হলে, এর অর্থ হল দু'আ কবূল হয়নি। দুনিয়ার ব্যাপারে তো এই উত্তর দেয়া হয়েছিল যে, বান্দা যে জিনিসটা চেয়েছিল যেহেতু সেটা বান্দার জন্য সমীচীন ছিল না, এ জন্য আল্লাহ তাআলা ঐ জিনিসটা দেননি। বরং অন্য কোন ভাল জিনিস দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এক ব্যক্তি এই দু'আ করছে : ইয়া আল্লাহ! আমি গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই। আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচার তাউফীক দান করুন তাহলে কি এ ক্ষেত্রেও এই উত্তর দেয়া হবে যে, গুনাহ থেকে বাঁচা ভাল ছিল না। এর থেকে ভাল কোন জিনিস ছিল যা আল্লাহ তাআলা ঐ দুআ প্রার্থনাকারীকে দিয়েছেন?

আসল কথা হল : গুনাহ থেকে বাঁচার এই দু'আ কবূল তো হয়েছে। তবে এই দু'আর প্রতিক্রিয়া এই হবে যে, প্রথমতঃ ইনশাআল্লাহ গুনাহ

সংঘটিত হবে না। আর যদি কোন কারণে গুনাহ হয়েও যায়, তাহলে তাওবার তাউফীক অবশ্যই নসীব হবে। এজন্য দ্বীনের ব্যাপারে এ দু'আ কখনো বৃথা যাবে না।

২৭. অতঃপর আমি তোমাদেরকে উচ্চ মাকামে পৌঁছাব

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : এই দু'আ করা সত্ত্বেও যদি পদস্খলন হয়ে যায় আর গুনাহ সংঘটিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কুধারণা করা যে, আল্লাহ তাআলা আমার দু'আ কবূল করেননি। আরে অজ্ঞ মানুষ! তুমি কি জান আমি তোমাকে কোন্ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে চাই? এ জন্য যখন গুনাহ হয়ে যাবে, তখন আমি তোমাকে তাওবা করার তাউফীক দিব। এরপর আমি তোমাকে আমার সাত্তারী, গাফফারী, দোষ গোপন করা এবং আমার রহমতসমূহের অবতরণস্থল বানাব।

এ জন্য এই দু'আকে কখনো বেকার বা অনর্থক মনে করবে না। ব্যস, হিম্মত এর সাথে কাজ করতে থাকুন আর দু'আ করতে থাকুন। অতঃপর দেখুন কিসের থেকে কী হয় ইনশাআল্লাহ।

২৮. খানা... একটি নেয়ামত

একবার হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. এর সাথে এক দাওয়াতে গিয়েছিলাম। যখন দস্তরখানে খানা আসল এবং খানা আরম্ভ করা হল, তখন হযরতওয়ালা বললেন যে, তোমরা একটু চিন্তা করো যে, এই এক খানার মধ্যে যা তোমরা এ সময় খাচ্ছো আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন প্রকারের কত নেয়ামত শামিল আছে। সর্বপ্রথম হল : খানা একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। এ জন্য যদি মানুষ খুব বেশি ক্ষুধার্ত হয় আর ক্ষুধার যন্ত্রণায় মরে যাওয়ার উপক্রম হয় আর খাওয়ার মত কোন কিছু পাওয়া না যায়, তাহলে ঐ সময় যত খারাপ থেকে খারাপ খানাই তার সামনে আনা হোক না কেন, সে এটাকেই গনীমত মনে করে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং ঐটাকেও আল্লাহ তাআলার এক নেয়ামত মনে করবে।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, খানা ভাল হোক বা মন্দ সুস্বাদু হোক বা স্বাদহীন, ঐ খানা নিজেই একটি নেয়ামত। কেননা সে ক্ষুধার কষ্টকে দূর করছে।

২৯. মুসলমান এবং কাফেরের খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, দ্বীন হল আসলে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের নাম। সামান্য একটু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন। তাহলে এই দুনিয়াই দ্বীন বনে যাবে। উদাহরণস্বরূপ : এই খানা যদি "বিসমিল্লাহ" বলা ব্যতীত খেয়ে নাও এবং এটা মহান আল্লাহর নেয়ামত সে কথা মনের মধ্যে উপস্থিত না করে খেয়ে নাও, তাহলে তো এই খানার ক্ষেত্রে তোমার আর কাফেরের মধ্যে কোন পার্থক্য হল না। কেননা খানা কাফেরও খাচ্ছে। তোমরা মুসলমানরাও খাচ্ছ। ঐ খানার মাধ্যমে তোমাদের ক্ষুধা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ খানা হল তোমাদের দুনিয়া। দ্বীনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আর যেমিনভাবে গরু মহিষ বকরী এবং অন্যান্য প্রাণী খাচ্ছে, অনুরূপভাবে তোমরাও খাচ্ছ। উভয়টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৩০. একটি আমলের মধ্যে কয়েকটি সুন্নাতের সাওয়াব

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন : সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যত করা গনীমতের মালতুল্য। উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি আমলের মধ্যে যত সুন্নাতের নিয়্যত করবে, অত সুন্নাতের সাওয়াব হাসিল হবে। উদাহরণ স্বরূপ : পানি পান করার সময় এই নিয়্যত কর যে, আমি তিন শ্বাসে পানি এ জন্য পান করছি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র অভ্যাস ছিল তিন শ্বাসে পানি পান করা। এই সুন্নাতের সাওয়াব হাসিল হয়ে গেল।

এমনিভাবে এই নিয়্যত করল যে, আমি শ্বাস নেয়ার সময় পাত্রটাকে এ জন্য মুখ থেকে সরিয়ে নিচ্ছি যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। এখন দ্বিতীয় সুন্নাতের উপর আমলের সাওয়াবও হাসিল হয়ে গেল।

এ জন্য সুন্নাতের ইলম হাসিল করা জরুরী। যাতে করে মানুষ যখন কোন আমল করে, তো এক আমলের মধ্যেই যত সুন্নাত আছে ঐ সবের ধ্যান ও খেয়াল রাখবে এবং সেগুলোর নিয়্যত করবে। তাহলে প্রত্যেক নিয়্যতের সাথে ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্র সুন্নাতের সাওয়াব হাসিল হবে।

৩১. মহিলারা এ অঙ্গগুলো ঢেকে রাখবে

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, এই ফেতনা যা বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যেভাবেই হোক এটাকে নির্মূল কর।

মহিলারা এমনভাবে আম মজমায় যাতায়াত করছে যে, মাথা খোলা, বাহু খোলা, বক্ষ খোলা, পেট খোলা, অথচ "সতর" এর হুকুম হচ্ছে এই যে, পুরুষের জন্য পুরুষের সামনেও সতর খোলা জায়েয নেই। আর মহিলার জন্য মহিলার সামনেও সতর খোলা জায়েয নেই।

উদাহরণস্বরূপ : যদি কোন মহিলা এমন পোষাক পরিধান করে যাতে বক্ষ খোলা থাকে, পেট খোলা থাকে, বাহু খোলা থাকে, তাহলে এই মহিলার জন্য এমতাবস্থায় অন্য মহিলাদের সামনে আসাও জায়েয নেই। পুরুষদের সামনে আসার তো প্রশ্নই আসে না। কেননা এ অঙ্গগুলো তার সতরের অংশ।

৩২. নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করুন

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, এখানে তো ব্যাপার হল আবদিয়্যত-বন্দেগী বা দাসত্বের। নিজেকে যত মিটাতে পারবেন, নিজের দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ যত ঘটাতে পারবেন ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহর কাছে মাকবূল হবেন।

৩৩. এখনো এ চাউল কাঁচা

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ.-এর যবানে আল্লাহ তাআলা বড় অদ্ভূত তত্ত্বকথা জারী করে দিতেন। একদিন তিনি বললেন : যখন পোলাও রান্না করা হয়, তখন প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ চাউলগুলোর মধ্যে জোশ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে আওয়ায আসতে থাকে এবং এই চাউলগুলো নড়াচড়া করতে থাকে। এই চাউলগুলোর টগবগ করে ফুটতে থাকা, নড়াচড়া করতে থাকা এ কথার আলামত যে, চাউল এখনো কাঁচা, পাকেনি, এখনো এগুলো খাওয়ার যোগ্য হয়নি। এখন এর মধ্যে না আছে স্বাদ না আছে সুঘ্রাণ। কিন্তু যখন চাউল সিদ্ধ হওয়ার একদম কাছাকাছি চলে আসে তখন ওর দম বের করা হয়। দম বের করার সময় এ চাউলগুলোর মধ্যে না থাকে জোশ, না থাকে নড়াচড়া, না থাকে আওয়ায। ঐ সময় এ চাউলগুলো একদম চুপচাপ পড়ে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন পাতিলের ঢাকনা সরিয়ে দেয়া হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এ চাউলের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। এখন এর মধ্যে স্বাদও সৃষ্টি হয় এবং খাওয়ার যোগ্যও হয়।

صباح جو ملنا تو کہنا یہ میرے یوسف سے

چھوٹ نکلی ہے تیرے پیراہن سے بو تیری

সকালে যখন মিলন হবে বল তখন এটা আমার ইউসুফকে,

তোমার কাপড় থেকে তোমারই সুঘ্রাণ যে ছড়িয়ে পড়েছে।

এমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এই দাবী থাকে যে, আমি এমন! আমি বড় আল্লামা! বড় পরহেযগার! বড় নামাযী! চাই এই দাবী মুখে হোক বা অন্তরে। ঐ সময় পর্যন্ত ঐ মানুষের মধ্যে কোন সুঘ্রাণ নেই, স্বাদ নেই। সে তো কাঁচা চাউল। আর যে দিন সে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজের এই দাবীগুলোকে বিলুপ্ত করে এটা বলে দিবে যে, আমার তো কোন হাকীকত নেই। আমি কিছুই না। ঐ দিন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাক তাঁর ফয়েয ছড়িয়ে দেন।

এ জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের ডাঃ ছাহেব রহ. কত সুন্দর কবিতা পাঠ করতেন :

میں عارفی، آوارہ صحراء فنا ہوں

ایک عالم بے نام ونشاں میرے لئے ہے

আমি আরেফী, মিটিয়ে দেওয়ার ময়াদানের আওয়ারা যে আমি ভাই। নাম নিশানাহীন এক জগত তো আমারই জন্য।

৩৪. হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. এবং বিনয়

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, আমি বাসার মধ্যে কখনো কখনো খালী পায়েও চলি। কেননা কোন একটি হাদীসে পড়েছি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো খালী পায়েও হেঁটেছেন। আমিও এ জন্য এভাবে হাঁটছি যাতে করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সুন্নাতের উপরও আমল হয়ে যায়। হযরত রহ. আরো বলতেন : আমি নগ্নপদে চলার সময় নিজেকে সম্বোধন করে বলি : দেখ তোমার প্রকৃত বাস্তবতা তো এটাই যে, না তোমার পায়ে জুতা। না মাথায় টুপি। আর না শরীরে পোষাক। আর সর্বশেষে তো তুমি মাটির সাথেই মিশে যাবে।

৩৫. যদি রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে ডাক আসে

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব আরেফী রহ. বলতেন যে, যদি তোমরা এমন মা'মূল বা অভ্যাস বানিয়ে রাখো যে, অমুক সময়ে তিলাওয়াত করব অথবা অমুক সময়ে নফল নামায পড়ব কিন্তু যখন ঐ সময় আসল তখন তবিয়ত এর মধ্যে অলসতা কাজ করছে। উঠতে মন চাচ্ছে না। তো এ জাতীয় মুহূর্তে স্বীয় নফসকে একটু তারবিয়্যত করো আর ঐ নফসকে বলো যে, আচ্ছা এখন তো তোমার অলসতা লাগছে। বিছানা থেকে উঠতে মনে চাচ্ছে না। কিন্তু তুমিই বল যদি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে এই মুহূর্তে এই পয়গাম আসে যে, আমি তোমাকে অনেক বড় পুরস্কার বা পদমর্যাদা দিতে চাই। এ জন্য তুমি এক্ষণি আমার কাছে চলে আস। বলো তখনো কি অলসতা থাকবে? আর তখন কি তুমি বার্তাবাহককে এ কথা বলবে যে, আমি এখন আসতে পারছি না। কেননা এখন আমার ঘুম আসছে। কোন মানুষ যার মধ্যে সামান্য আকল ও বুঝবুদ্ধি আছে, রাষ্ট্রপ্রধানের এই পয়গাম শোনার পর তার সমস্ত অলসতা, ক্লান্তি ও নিদ্রা উঠে যাবে। বরং আনন্দের আতিশয্যে সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার লাভের জন্য দৌড়ে যাবে।

এজন্য যদি ঐ সময় নফস পুরস্কার লাভের জন্য দৌড়ে যায়, তাহলে বুঝা যাবে যে, বাস্তবে উঠতে কোন ওযর ছিল না। যদি বাস্তবেই উঠতে কোন ওযর থাকত, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের পয়গাম শুনে উঠত না। বরং বিছানায় পড়ে থাকত।

এখন এটা চিন্তা করো, দুনিয়ার একজন সামান্য রাষ্ট্রপতি যিনি একেবারেই অক্ষম, সম্পূর্ণ অসহায়, সে যদি তোমাকে সামান্য পুরস্কার বা পদমর্যাদার জন্য ডাকে, তাহলে তার জন্য তুমি কত দৌড়ঝাঁপ কর অথচ আহকামুল হাকিমীন যাঁর কুদরত ও নিয়ন্ত্রণে পুরো বিশ্বজগত। তিনিই দাতা, তিনিই ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতাওয়ালা। তাঁর পক্ষ থেকে ডাক আসছে। তাহলে তাঁর মহান দরবারে উপস্থিত হতে কেন তুমি অলসতা করছ?

এ কথাগুলো চিন্তা করলে ইনশআল্লাহ এ কাজের হিম্মত পয়দা হবে। অলসতা দূর হয়ে যাবে।

৩৬. এ রোযা কার জন্য রাখছিলে?

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর এ কথা নকল করতেন যে, জনৈক ব্যক্তি রামাযান

মাসে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থতার কারণে রোযা ছুটে গেল। এখন এ বেচারার মনে অনেক কষ্ট যে, আহা! রামাযানের রোযা ছুটে গেল। হযরত বলেন : মন খারাপের কোন কারণ নেই। কেননা তুমি এটা চিন্তা কর যে, তুমি এ রোযা কার জন্য রেখেছিলে? যদি তুমি নিজের জন্য নিজের মন খুশী করার জন্য এবং নিজের শখ পুরো করার জন্য রোযা রাখছ তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি এর উপর দুঃখ কর যে, অসুখ এসে গেছে। রোযা ছুটে গেছে। কিন্তু যদি তুমি এই রোযা আল্লাহর জন্য রেখে থাক, তাহলে বিষণ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন : অসুস্থ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দাও। এ জন্য যদি শরীয়তসম্মত কোন ওযরের কারণে রোযা কাযা হয়ে যায় অথবা মামূলাত ছুটে যায়। উদাহরণস্বরূপ : অসুস্থতা। সফর। অথবা মহিলাদের প্রকৃতিগত অপারগতা অথবা কোন অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার কারণে যা দ্বীনেরই তাকাযা ছিল, মা'মূল ছুটে গেল। উদাহরণস্বরূপ পিতা-মাতা অসুস্থ। তাঁদের খেদমতে লেগে আছে। আর এই খেদমতের কারণে মা'মূল ছুটে গেল। তাহলে এতে বিষণ্ন হওয়া একেবারেই ঠিক নয়। কিন্তু অলসতার কারণে মা'মূল ছেড়ে দেয়া অনুচিত। অপারগতার কারণে ছুটলে এর উপর মনক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়।

৩৭. হযরত ইউনুস (আ.) এর পন্থা অবলম্বন করুন

আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই ছাহেবও রহ. দারুণ অদ্ভূদ অদ্ভূত কথা বলতেন। একদিন তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস আ.-কে মাছের পেটে তিন দিন রেখেছেন। এখন সেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ ছিল না। চতুর্দিকে অন্ধকার আর অন্ধকার আচ্ছাদিত। ব্যাপারটা নিজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। ব্যস সেই অন্ধকারে তিনি আল্লাহ তাআলাকে ডাকলেন এবং এই কালিমা পাঠ করলেন :

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

"হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। আপনি পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি যালিমদের মধ্যে ছিলাম"। (সূরা আম্বিয়া : ৮৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন : যখন তিনি অন্ধকারে আমাকে ডাকলেন, তখন আমি বললাম :

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ "আমি তাঁর ফরিয়াদে সাড়া দিয়েছি এবং এই দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছি। আর আমি এভাবেই ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি"। (সূরা আম্বিয়া : ৮৮)

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন : তোমরা একটু চিন্তা করো তো, আল্লাহ তাআলা এখানে কী শব্দ ব্যবহার করেছেন যে, "আমি ঈমানদারদেরকে এভাবেই নাজাত দিব"। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি কি প্রথমে মাছের পেটে যাবে? অতঃপর সেখানে গিয়ে আল্লাহকে ডাকবে আর আল্লাহ তাআলা তাকে নাজাত দিবেন?।

এ আয়াতের মর্ম কি এটাই? আয়াতের মর্ম এমন নয়। বরং আয়াত এর মর্ম হল : যেমনিভাবে হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে অন্ধকারে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তেমনিভাবে তোমরা অন্য কোন অন্ধকারে গ্রেফতার হতে পার কিন্তু সেখানেও তোমাদের মুক্তির উপায় ঐটাই যেটা হযরত ইউনুস (আ.) অবলম্বন করেছিলেন। অর্থাৎ এই কালিমা পাঠ করে আল্লাহ পাককে ডাকতে হবে।

৩৮. নফল কাজের ক্ষতিপূরণ

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. ঐ হাদীসের ভিত্তিতে যার মধ্যে দু'আ ভুলে যাওয়ার আলোচনা আছে, বলেন : যখনই কোন মানুষ কোন নফল ইবাদত সময়মতো আদায় করতে ভুলে গেল অথবা কোন ওযরের কারণে ঐ নফল ইবাদত করতে পারল না। তাহলে এটা মনে করবে না যে, ব্যস এখন এই নফল ইবাদতের সময় চলে গেছে। এখন ছুটি। বরং পরবর্তীতে যখন সময় পাবে, ঐ নফল ইবাদতটা আদায় করবে।

একবার আমরা হযরতওয়ালা আরেফী রহ. এর সাথে কোন একটি ইজতিমায় শরীক হওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। মাগরিবের সময় সেখানে পৌঁছার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের বের হতে বিলম্ব হয়ে গেছে। যদ্দরুন মাগরিবের নামায রাস্তাতেই একটি মসজিদে পড়লাম। যেহেতু আমাদের মনে হচ্ছিল যে, সেখানে লোকেরা আমাদের জন্য অপেক্ষমান। এজন্য হযরতওয়ালা স্রেফ তিন রাকাত ফরয এবং দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন। আর আমরাও তিন রাকাত ফরয ও দুই রাকাত সুন্নাত পড়ে নিলাম এবং সেখান থেকে দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলাম। যাতে করে অপেক্ষমান মানুষের অপেক্ষা বেশি লম্বা না হয়। যাইহোক, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছে

গেলাম। ইজতিমা হল। অতঃপর ইশার নামাযও সেখানে পড়লাম। রাত দশটা পর্যন্ত ইজতিমা হল।

অতঃপর যখন হযরতওয়ালা সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন আমাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ভাই! আজকের মাগরিব নামাযের পর আউয়াবীন কোথায় গেল? আমরা বললাম : হযরত সেটা তো আজ রয়ে গেছে। যেহেতু রাস্তায় তাড়াহুড়া ছিল, এজন্য পড়তে পারিনি। হযরত বললেন : রয়ে গেছে? তাও আবার বিনিময় ছাড়া। আমরা বললাম : হযরত! যেহেতু লোকেরা অপেক্ষায় ছিল। দ্রুত পৌঁছার প্রয়োজন ছিল। এই ওযরের কারণে আউওয়াবীনের নামায রয়ে গেছে।

হযরত বললেন : আলহামদুলিল্লাহ, যখন আমি ইশার নামায পড়লাম, তো ইশার নামাযের সাথে যে সব নফল নামায পড়ি সেগুলো ছাড়া অতিরিক্ত ছয় রাকাত পড়ে নিয়েছি। যদিও সে নাওয়াফিল আউয়াবীন নয়। কেননা আউয়াবীনের সময় হল মাগরিবের পর। তাই আমি চিন্তা করলাম যে, যে ছয় রাকাত ছুটে গেছে যে কোনভাবে সেটার ক্ষতিপূরণ করা হোক। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন ছয় রাকাত পড়ে আউয়াবীনের ক্ষতি পূরণ করেছি। এখন তোমরা বুঝ তোমাদের কাজ কি।

অতঃপর বললেন : তোমরা মৌলভী মানুষ। তোমরা হয়ত বলবে নফলের কাযা হয় না। শুধু ফরয আর ওয়াজিবের কাযা হয়। আপনি আউয়াবীনের কাযা কিভাবে করলেন? তো ভাই তোমরা ঐ হাদীস পড়েছ। যার মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি তোমরা খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে যাও, তাহলে যখন মাঝখানে মনে পড়বে তখনই পড়ে নিবে। শেষে মনে পড়লে তখনই পড়বে। এখন দুআ পড়া তো কোন ফরয ওয়াযিব আমল নয়, তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা কেন বললেন যে, শেষে পড়ে নাও।

আসল কথা হল একটি নফলও মুসতাহাব কাজ যা একটি ভাল কাজ এবং যার মাধ্যমে আমলনামায় প্রবৃদ্ধি হতে পারত। সেটা যদি কোন কারণে ছুটে যায়, তাহলে সেটাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করো না। অন্য সময় করে নাও। এখন চাই এটাকে 'কাযা' বল বা না বল। কিন্তু এর দ্বারা ঐ নফলের ক্ষতিপূরণের কাজ হয়ে যাবে।

এই জিনিসগুলোই বুযুর্গানে দ্বীন হতে শেখার মত। ঐ দিন হযরতওয়ালা আরেফী রহ. আমাদের সামনে এক বিশাল দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন।

আমরা তো বাস্তবে এমনটিই মনে করতাম। আর ফিকহের কিতাবসমূহেও লিখেছে : নাওয়াফিলের কাযা হয় না। কিন্তু এখন বুঝে এসেছে। ঠিক আছে, কাযা তো হতে পারে না কিন্তু ক্ষতিপূরণ তো হতে পারে। কেননা ঐ নফল ছুটে যাওয়ার কারণে লোকসান হয়ে গেছে। নেকী উপার্জন করা যায়নি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাআলা অবসরের নেয়ামত দান করেন, তখন ঐ নফলকে আদায় করে নাও।

আল্লাহ তাআলা হযরতওয়ালার দারাজাত বুলন্দ করে দিন। আমীন।

৩৯. রান্নাকারীর প্রশংসা করা উচিত

আমাদের হযরত ডা: ছাহেব একবার নিজের এ ঘটনা শুনালেন যে, এক ব্যক্তি আমার নিকট আসতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উভয়েই ইসলাহী সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। একদিন তারা উভয়ে নিজেদের বাসায় আমাকে দাওয়াত করল। আমি গেলাম। গিয়ে খানা খেলাম। খানা খুবই সুস্বাদু ছিল।

হযরতওয়ালা আরেফী রহ. এর অভ্যাস ছিল এই যে, খানা শেষে ঐ খানা এবং খানা রান্নাকারী মহিলার অবশ্যই প্রশংসা করতেন। যাতে করে আল্লাহ পাকের শোকরও আদায় হয় এবং ঐ মহিলার মনোতুষ্টিও হয়।

ফলশ্রুতিতে খানা থেকে ফারেগ হওয়ার পর ঐ মহিলা পর্দার আড়ালে আসলেন। এসে হযরতকে সালাম দিলেন।

হযরত বললেন : তুমি তো খুব মজাদার খানা রান্না করেছ। খেতে খুব স্বাদ লাগল। হযরত বলেন : আমি এই কথা বলা মাত্রই পর্দার পিছন থেকে এই মহিলার হেচকিসহ কান্নার আওয়ায শুনতে পেলাম। আমি হতবাক হয়ে গেলাম, না জানি আমার কোন্ কথায় সে মনে কষ্ট পেয়েছে। আমি বললাম : ব্যাপার কি? কাঁদছ কেন? ঐ মহিলা অতিকষ্টে নিজ কান্না সংবরণ করে বলল : "হযরত! আমার স্বামীর সাথে আমার চল্লিশ বছরের সংসারজীবন। কিন্তু এই পুরো সময়ের মধ্যে তার মুখে আমি কখনো এই কথা শুনিনি যে, "আজকে রান্না খুব ভাল হয়েছে।" আজকে আপনার মুখে এই কথা শোনার পর আমার কান্না চলে এসেছে।"

যেহেতু ঐ ব্যক্তি হযরতওয়ালার তারবিয়াতের অধীনে ছিল। এ জন্য হযরতওয়ালা তাকে বললেন যে, আল্লাহর বান্দা! কারো প্রশংসায় দু একটা কথা বলতে কী সমস্যা? এমন কৃপণতাও মানুষ করে?

এজন্য খাওয়ার পর ঐ খানা এবং রান্নাকারীর প্রশংসা করা উচিত। যাতে ঐ খানার উপর আল্লাহ তাআলার শোকরও আদায় হয় এবং খানা বানানেওয়ালার দিল খুশী হয়ে যায়।

৪০. নিজ ভুলের উপর অনড় থাকা জায়েয নেই

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, যদি কোন মানুষ কোন গুনাহে লিপ্ত থাকে অতঃপর কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের নিকট ঐ অবস্থায় চলে যায়, তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি মিথ্যা কথা বলে অথবা নিজ ভুলের উপর অনড় থাকে, তাহলে এটা বড় অন্যায় কাজ। আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর ওয়ারিসদের উপরও আল্লাহ তাআলা এ অনুগ্রহ করেন যে, তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে দেন।

তাইতো হযরত ডাঃ ছাহেবই রহ. হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এর এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একবার হযরতওয়ালার মজলিস হচ্ছিল। হযরতওয়ালা ওয়ায করছিলেন। এক ব্যক্তি ঐ মজলিসেই দেয়াল বা বালিশে হেলান দিয়ে অহংকারী ভাব নিয়ে বসে গেল। এভাবে টেক লাগিয়ে পা ছড়িয়ে বসা মজলিসের আদব পরিপন্থী কাজ। আর যে ব্যক্তিই হযরতের মজলিসে আসত নিজ সংশোধন এর উদ্দেশ্যেই আসত। এজন্য কোন ভুল করলে হযরতওয়ালা থানভী রহ. এর দায়িত্ব ছিল তাকে সাবধান করা। ফলশ্রুতিতে হযরত থানভী রহ. এ ব্যক্তিকে সতর্ক করলেন এবং বললেন যে, "এভাবে বসা মজলিসের আদবের বিপরীত কাজ। আপনি ঠিকভাবে আদবের সাথে বসুন"। ঐ লোকটি ঠিকভাবে বসার পরিবর্তে ওযর বয়ান করে বলল: হযরত! আমার কোমরে ব্যথা। এজন্য আমি এভাবে বসেছি। বাহ্যত: তিনি এটা বলতে চাচ্ছিলেন যে, আপনার এই সতর্ক করাটা ভুল। কেননা আপনার কী জানা আছে যে, আমি কোন্ অবস্থাতে আছি? কোন কষ্টে জর্জরিত? আপনার আমাকে সতর্ক করা অনুচিত।

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. নিজে বয়ান করছেন যে, আমি হযরত থানভী রহ. কে দেখলাম, সামান্য সময়ের জন্য গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং চোখ বন্ধ করে ফেললেন। অতঃপর গর্দান উঠিয়ে ঐ ব্যক্তিকে বললেন: "আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনার কোমরে কোন ব্যথা নাই। আপনি মজলিস থেকে উঠে চলে যান।" এটা বলে ধমক দিয়ে উঠিয়ে দিলেন।

এখন স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, হযরতওয়ালা হাকীমুল উম্মত রহ. কিভাবে বুঝলেন যে. তার কোমরে কোন ব্যথা আছে কি নেই? আসলে অনেক সময় আল্লাহ পাক তাঁর নেক বান্দাদের মধ্যে কাউকে আসল অবস্থার ব্যাপারে অবহিত করে দেন। এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন এর সামনে মিথ্যা কথা বলা বা তাঁদেরকে ধোঁকা দেয়া অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। কোন অন্যায় বা ভুল হয়ে গেলে মানুষের উচিত তার উপর লজ্জিত হওয়া।

আর আল্লাহ তাআলা যদি তাকে তাওবার তাউফীক দান করেন, তাহলে আল্লাহ পাক চাহেন তো তার গুনাহ ও অন্যায় মাফ হয়ে যাবে। যাই হোক হযরতওয়ালা রহ. ঐ ব্যক্তিকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীতে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে সাফ সাফ বলে দিয়েছে যে, বাস্তবেই হযরতওয়ালা রহ. সঠিক কথাই বলেছেন। আমার কোমরে কোন ব্যথা ছিল না। আমি শুধুমাত্র নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য এ কথা বানিয়েছি।

৪১. দুঃখ-কষ্টের সময় দুরূদ শরীফ পড়ুন

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. একবার বললেন যে, যখন মানুষের কোন দুঃখ বা পেরেশানী হয় অথবা রোগ কিংবা প্রয়োজন সামনে আসে, তখন আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ তো অবশ্যই করবঃ ইয়া আল্লাহ! আমার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে দিন। আমার এ রোগ ও পেরেশানী দূর করে দিন।

কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন একটি পন্থা বাতলে দিচ্ছি যে, এর বরকতে আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন। সেটা হচ্ছে এই যে, কোন পেরেশানী থাকলে বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। ঐ দুরূদ শরীফের বরকতে আল্লাহ তাআলা তার পেরেশানী দূর করে দিবেন।

৪২. দ্বীন কোন্ জিনিসের নাম?

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. একটি দারুণ কাজের কথা বলতেন। অন্তরে খোদাই করার মত। "দ্বীন হল শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার নাম, সামান্য দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন কর। তাহলে এই দুনিয়াই দ্বীন বনে যাবে।"

এ সব কাজ যা তোমরা আঞ্জাম দাও এসব ইবাদত হয়ে যাবে। এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির কাজ হয়ে যাবে। শর্ত হল দুটি কাজ করতে হবে। ১. নিয়্যত পরিশুদ্ধ করতে হবে। ২. ঐ কাজটা সুন্নাত অনুযায়ী আঞ্জাম দিতে হবে।

ব্যস এতটুকু করলেই ঐ কাজটা দ্বীনের কাজ হয়ে যাবে।

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট গেলে এ ফায়েদাই হয় যে, ঐ মানুষটির দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। তাঁরা চিন্তার ধারা বদলে দেন। পরিণতি এই হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমাল ও কার্যকলাপের দিক শুদ্ধ হয়ে যায়।

৪৩. সুন্নাত অনুসরণের পুরস্কার ও সাওয়াব

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, যদি একটি কাজ তুমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী কর আর সেই কাজটিই যদি তুমি সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় আঞ্জাম দাও, তাহলে উভয়টির মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য অনুভব করবে। যে কাজটি তুমি নিজ ইচ্ছামত করবে বা নিজের পক্ষ থেকে করবে, সেটা তোমার নিজস্ব কাজ হবে। এর উপর কোন পুরস্কার বা সাওয়াব নেই। পক্ষান্তরে যে কাজটি তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণের নিয়্যতে করবে, তার মধ্যে সুন্নাত অনুসরণের পুরস্কার ও সাওয়াব এবং সুন্নাতের বরকত ও নূর শামিল হয়ে যায়।

৪৪. পৃথিবীর খলীফাকে প্রতিষেধক দিয়ে পাঠিয়েছেন

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. একবার বললেন যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা রেখেছেন। অতঃপর তাকে খলীফা বানিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর যেই মাখলূকের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা ছিল না অর্থাৎ ফেরেশতাবৃন্দ, তাঁদেরকে নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যও সাব্যস্ত করেননি। কেননা তাদের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতাই নাই। ফলে তারা খেলাফতেরও যোগ্য নয়। মানুষের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা রেখেছেন। আর দুনিয়াতে প্রেরণের পূর্বে নমুনা এবং মশক হিসেবে একটি ভুলও করানো হয়েছে। তাইতো হযরত আদম (আ:) কে যখন জান্নাতে পাঠানো হল, তখন তাঁকে বলে দেয়া হল যে, পুরো জান্নাতের যেখানে যেতে মনে চায় যাও। যখন ইচ্ছা খাও। কিন্তু ঐ গাছের ফল খাবে না।

অতঃপর শয়তান জান্নাতে পৌঁছে গেল এবং সে হযরত আদম (আ:) এর মনে কুমন্ত্রণা দিল। যদ্দরুণ তিনি ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেললেন। ভুল প্রকাশিত হয়ে গেল, এই ভুল তাঁর মাধ্যমে করানো হয়েছে।

কেননা কোন কাজ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া হয় না। কিন্তু ভুল করার পর হযরত আদম (আ:) এর মধ্যে পেরেশানীও লজ্জা পয়দা হল যে, ইয়া আল্লাহ! আমার দ্বারা এটা কেমন ভুল হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বললেন যে, এখন তুমি এগুলো বল:

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।" সূরা আরাফ : ২৩

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এটা বলেছেন যে, আমি এ কথাগুলো আদমকে শিখিয়েছি। এটাও তো আল্লাহ পাকের পক্ষে সম্ভব ছিল যে, তিনি এ কথাগুলো শেখানো ব্যতীত এবং তাঁর মাধ্যমে বলানো ছড়া এমনিতেই মাফ করে দিতেন। এবং হযরত আদম আ.-কে বলে দিতেন যে আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমনটি করেননি। কেন?

আমাদের হযরত ডা: ছাহেব রহ. বলতেন যে, আল্লাহ তাআলা এ সবকিছু করিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে দুনিয়ায় তোমরা যাচ্ছো, সেখানে এই সবকিছু হবে। সেখানেও শয়তান তোমাদের কাছে আসবে। নফসও তোমাদের সাথে লাগা থাকবে। তোমাদের দ্বারা কখনো এই গুনাহ করাবে। কখনো ঐ গুনাহ করাবে। আর তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক নিয়ে না যাবে, অতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দুনিয়াতে সহীহ যিন্দেগী যাপন করতে পারবে না। ঐ প্রতিষেধক হল "ইস্তিগফার" ও "তাওবা"।

এজন্য ভুল এবং ইস্তিগফার উভয় জিনিস হযরত আদম (আ:) কে শিখিয়ে অতঃপর বলেছেন যে, এখন দুনিয়াতে যাও। আর এই প্রতিষেধকও খুব সহজ। মুখের দ্বারা ইস্তিগফার করলে ইনশাআল্লাহ ঐ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

৪৫. অতীত গুনাহ ভুলিয়ে দিন

আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, যখন তুমি এই উভয় প্রকার তাওবা করলে, এখন এরপরে আর তোমার অতীতের ঐ গুনাহগুলোর কথা মনে করো না। বরং সেগুলো ভুলে যাও। কেননা যে গুনাহ থেকে তুমি তাওবা করেছ সেটাকে স্মরণ করা প্রকারান্তরে মহান আল্লাহর মাগফিরাতের অবমূল্যায়ন। কেননা আল্লাহ তাআলা এ ওয়াদা করেছেন যে, তোমরা তাওবা-ইস্তিগফার করলে আমি তোমাদের তাওবা কবূল করব এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিব। এবং তোমাদের আমলনামা থেকে মিটিয়ে দিব। এখন আল্লাহ পাক যেখানে তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন আর তুমি কিনা উল্টো ঐ গুনাহগুলোর কথা স্মরণ করে সেগুলোর ওয়াযীফা পড়ছ!! এটা মহান আল্লাহর রহমতের নাকদ্‌রী। কেননা এ সমস্ত গুনাহের স্মরণ অনেক সময় পর্দা ও প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। এজন্য এগুলো স্মরণ করবে না। বরং ভুলে যাও।

৪৬. গুনাহের কথা স্মরণ হলে ইস্তিগফার করবে

মুহাক্কিক আর গাইরে মুহাক্কিকের মধ্যে এটাই পার্থক্য। গাইরে মুহাক্কিক ব্যক্তি অনেক সময় উল্টো কাজ বলে দেয়। আমার একজন বন্ধু ছিলেন খুব ভাল মানুষ। সব সময় রোযা রাখতেন। তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। একজন পীর ছাহেবের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি বলতেন যে, আমার পীর ছাহেব আমাকে একথা বলেছেন যে, রাত্রে যখন তুমি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠবে, তখন তাহাজ্জুদের পর নিজের অতীতের সমস্ত গুনাহের কথা স্মরণ করবে। আর সেগুলো স্মরণ করে খুব কান্নাকাটি কর!!

কিন্তু আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন: এ পদ্ধতিটি সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তো তাওবার পর অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এবং আমাদের আমলনামা মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তুমি সেগুলো স্মরণ করে এটা প্রকাশ করতে চাও যে, এখনো ঐ গুনাহগুলো মিটানো হয়নি! আর আমি তো সেগুলো মিটতে দিব না। বরং এগুলো স্মরণ করব।

এ পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর শানে রহমতের অবমূল্যায়ন ও অকৃতজ্ঞতা হয়। কেননা যখন তিনি তোমার আমলনামা থেকে সেগুলো মিটিয়ে দিয়েছেন, অতএব এখন সেগুলো ভুলে যাও। সেগুলো স্মরণ কর না। আর যদি কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে ঐসব গুনাহের কথা মনে পড়ে, তাহলে ঐ সময় ইস্তিগফার পাঠ করে ঐ খেয়ালকে খতম করে দাও।

৪৭. বর্তমান অবস্থা সংশোধন করে নিন

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন। যা স্মরণ রাখার মত। হযরত বলেছেনঃ তাওবা করার পর তোমরা অতীতের চিন্তা বাদ দাও। কেননা যখন তাওবা করেছ, তখন এ আশাই রাখ যে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে আমার তাওবা অবশ্যই কবূল করবেন। আর ভবিষ্যতের চিন্তাও ছেড়ে দাও যে, আগামীতে কী হবে? কী হবে না? বর্তমান অবস্থার চিন্তা কর যেন সেটা সংশোধিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মধ্যে কেটে যায় এবং এর মধ্যে কোন গুনাহ সংঘটিত না হয়। বর্তমানে আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, হয়ত আমরা অতীত নিয়ে পড়ে থাকি যে, আহা! আমার দ্বারা এত গুনাহ হয়েছে। এখন আমার অবস্থা কী হবে? কিভাবে আমার ক্ষমা হবে? ফলশ্রুতিতে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়ে বর্তমানও খারাপ হয়ে যায়। অথবা আমরা ভবিষ্যতের ফিকিরে পড়ে থাকি যে, যদি এই মুহূর্তে তাওবা করি তাহলে ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে কিভাবে বাঁচব?

আরে তুমি এভাবে চিন্তা কর যে, যখন ভবিষ্যতের সময় আসবে তখন দেখা যাবে। এখন তুমি বর্তমান অবস্থা নিয়ে ভাব। কেননা এই বর্তমানই অতীত হয়ে যাচ্ছে। আর প্রত্যেক ভবিষ্যতকে বর্তমান হতে হবে। এজন্য ব্যস নিজের বর্তমান অবস্থা ঠিক করে নিন। আর অতীত স্মরণ করে হতাশ হবেন না। বাস্তবিকপক্ষে শয়তান আমাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। সে আমাদেরকে এ কথা বলে প্ররোচিত করে যে, তুমি তোমার অতীত দেখ। তুমি কত বড় বড় গুনাহ করেছ। আর নিজ ভবিষ্যতের কথাও তুমি ভাব যে, তোমার দ্বারা ভবিষ্যতে কী হবে?

এভাবে অতীত আর ভবিষ্যতের চক্করে ফেলে শয়তান আমাদের বর্তমানকে নষ্ট করতে থাকে। এজন্য শয়তানের ধোঁকায় পড়া যাবে না। আর নিজ বর্তমানকে সংশোধনের ফিকির কর। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই ফিকির দান করুন। আমীন।

৪৮. মুসাফাহার দ্বারা গুনাহ ঝরে পড়ে

একটি হাদীসের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যখন এক মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে মহব্বতের সাথে মুসাফাহা করে, তখন আল্লাহ তাআলা উভয় হাতের গুনাহসমূহ ঝেড়ে

দেন। এজন্য মুসাফাহা করার সময় এ নিয়্যত করা উচিত যে, এই মুসাফাহার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমার গুনাহগুলোও মাফ করে দিবেন। এবং অপর ভাইয়ের গুনাহগুলোও মাফ করে দিবেন।

আর সাথে সাথে এ নিয়্যতও করবে যে, আল্লাহর এই নেক বান্দা যে আমার সাথে মুসাফাহার জন্য এসেছেন, আল্লাহ তাআলা তার হাতের বরকত আমার দিকে স্থানান্তরিত করে দিবেন। বিশেষতঃ আমাদের মত মানুষের জন্য এ জাতীয় পরিস্থিতি খুব বেশি সামনে আসে যে, কোন স্থানে ওয়ায বা বয়ান করলে ওয়াযের পর লোকজন মুসাফাহার জন্য আসেন। এজাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, ভাই! অনেক মানুষ যখন আমার সাথে মুসাফাহা করার জন্য আসে তখন আমি খুব খুশী হই। এজন্য খুশী হই যে, এরা সব আল্লাহর নেক বান্দা। জানা নেই কোন্ বান্দা আল্লাহর নিকট মাকবূল। যখন ঐ মাকবূল বান্দার হাত আমার হাত স্পর্শ করবে, তখন হতে পারে এর বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকেও মাফ করে দিবেন।

এ ব্যাপারগুলোই বুযুর্গানে দ্বীন থেকে শেখার মত। এজন্য যখন প্রচুর মানুষ কারো সাথে মুসাফাহার জন্য আসবে, তখন তার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। এই খেয়াল আসতে পারে যে, যখন এত মানুষ আমার সাথে মুসাফাহা করার জন্য আসছে, আমার ভক্ত হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি! কিন্তু যখন মুসাফাহা করার সময় এ নিয়্যত করে নিল যে, সম্ভবতঃ তাঁদের বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। তো এখন পুরো দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল। আর এখন মুসাফাহা করার ফলে অহংকারের পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হবে। এজন্য মুসাফাহার সময় এ নিয়্যত করে নাও।

৪৯. একজন বুযুর্গের মাগফিরাতের ঘটনা

আমি আমার শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. থেকে এ ঘটনা শুনেছি যে, একজন বুযুর্গ যিনি অনেক বড় মুহাদ্দিসও ছিলেন। সারাজীবন হাদীসের খেদমতে কাটিয়েছেন। যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন কেউ একজন স্বপ্নে তাঁকে দেখলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত! আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ বড় অদ্ভূত আচরণ করেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে,আমি তো সারাজীবন ইলম ও হাদীসের খেদমতে কাটিয়েছি। দরস ও তাদরীস,

লিখনী, ওয়ায ও বয়ানের মধ্যে কাটিয়েছি। তো আমার খেয়াল এমনই ছিল যে, এসব আমলের উপর সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ হলাম, তখন আল্লাহ তাআলা কিছুটা অন্য ব্যবহারই করলেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে বললেন যে, তোমার একটি আমল আমার খুব পসন্দ হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, একদিন তুমি হাদীস শরীফ লিখছিলে, যখন তুমি স্বীয় কলম দোয়াতে ডুবিয়ে বের করলে, তো ঐ সময় একটি তৃষ্ণার্ত মাছি এসে ঐ কলমের ডগায় বসে গেল এবং কালি চুষতে লাগল। ঐ মাছির প্রতি তোমার দয়া হল। তুমি চিন্তা করলে যে, এ মাছি হল আল্লাহ পাকের মাখলূক এবং সে তৃষ্ণার্ত। সে এই কালি পান করলে পরে আমি কলম দ্বারা কাজ করব। ফলশ্রুতিতে অতটুকু সময়ের জন্য তুমি নিজ কলমকে আটকে রেখেছিলে এবং অতটুকু সময় কলম দ্বারা কিছু লিখনি, যতটুকু সময় ঐ মাছি সেই কলমের উপর বসে কালি চুষছিল। এই আমলটি তুমি একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছিলে, এজন্য এ আমলের বদৌলতে আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি এবং জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেছি।

দেখুন! আমরা তো এটা মনে করে বসে আছি যে, ওয়ায করা, ফতোয়া দেয়া, তাহাজ্জুদ পড়া, লেখালেখি করা ইত্যাদি বড় বড় আমল। অথচ সেখানে একটি তৃষ্ণার্ত মাছিকে কালি পান করানোর আমল কবূল করা হচ্ছে। অন্য বড় আমলগুলোর কোন আলোচনাই নেই।

অথচ যদি চিন্তা করা হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত কলমকে আটকে রেখেছেন। যদি ঐ সময় কলমকে আটকে না রাখতেন, তাহলে হাদীস শরীফের কোন শব্দই লিখতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার মাখলূকের উপর স্নেহের বেদৌলতে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। যদি তিনি এ আমলকে সামান্য মনে করে ছেড়ে দিতেন, তাহলে এই ফযীলতও হাসিল হত না।

আল্লাহ পাকের নিকট কোন্ আমল যে কবূল হবে তাতো বলা যায় না। কেননা মহান আল্লাহর নিকট আমলের সাইজ, পরিমাণ বা সংখ্যার কোন মূল্য নেই বরং সেখানে আমলের ওজনের মূল্য হবে। আর এই ওজন ইখলাসের দ্বারা সৃষ্টি হয়। যদি আপনি অনেক আমল করেন কিন্তু তার মধ্যে ইখলাস না থাকে,তাহলে গণনার দিক দিয়ে ঐ আমল যদিও বেশি কিন্তু উপকার কিছুই নেই। পক্ষান্তরে যদি আমল কমও হয় কিন্তু তার মধ্যে

ইখলাস থাকে, তাহলে ঐ আমল আল্লাহ পাকের নিকট বড় হয়ে যায়। এ জন্য যখন অন্তরে কোন নেক কাজের ইচ্ছা সৃষ্টি হবে, তখন ইখলাসও থাকতে হবে। তাহলেই আশা করা যায় যে, ঐ আমলটি কবূল হবে ইনশাআল্লাহ।

৫০. এখন তো এ দিলকে বানাতে হবে আপনার যোগ্য আমায়

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. এ কবিতাটি পাঠ করতেন।

آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اس دل کو ترے قابل بنانا ہے مجھے

অর্থাৎ অন্তরে যে সব আশা পয়দা হচ্ছে, চাই সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক, বরবাদ হয়ে যাক, এখন তো হে মাওলা আমি এ ইচ্ছা করছি যে, আমার দিলকে একমাত্র আপনার যোগ্য বানাতে হবে।

এখন এই দিলে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর আনওয়ারের অবতরণ হবে। এখন এই অন্তরে মহান আল্লাহর মহব্বত স্থান করে নিবে। এখন এখানে গুনাহ হবে না। এরপর দেখ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কিভাবে রহমত নাযিল হয়।

মনে রাখবেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তো এ কাজ করতে খুব কষ্ট হয়। মনে চায় এটা করি। কিন্তু আল্লাহর খাতিরে সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। এতে ভীষণ কষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ কষ্টের মধ্যেই স্বাদ লাগতে থাকে।

৫১. ইবাদতের স্বাদের সাথে পরিচিত করে দাও

হযরত ডা: আব্দুল হাই ছাহেব (রহ) একদিন খুব সুন্দর একটি কথা বললেন : হযরত বললেন যে, মানুষের এই নফসের স্বাদ আর মজা দরকার। তার খোরাক হল স্বাদ ও মজা। কিন্তু এর বিশেষ কোন আকৃতি নফস এর কাম্য নয় যে, অমুক ধরনের মজা চাই আর অমুক ধরনের মজা চাই না ব্যস। তার তো স্রেফ মজা চাই। এখন তুমি তাকে খারাপ প্রকৃতির মজায় অভ্যস্ত করে দিয়েছ। একবার তাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং ইবাদতের স্বাদের সাথে পরিচিত করে দাও। দেখবে নফস এর মধ্যেই স্বাদ ও মজা নিচ্ছে।

৫২. অঙ্গীকারের পর দু'আ

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. ইমাম গাযালী রহ. এর একটি কথার উপর সামান্য সংযোজন করে বলতেন : এই অঙ্গীকারের পর আল্লাহ তাআলাকে বল : ইয়া আল্লাহ! আমি এই অঙ্গীকার করছি যে, আজকের দিন গুনাহ করব না। এবং ফরয-ওয়াজিবসমূহ সবকিছু আদায় করব। শরীয়ত অনুযায়ী চলব। আল্লাহর হক ও বান্দার হকসূহ যথাযথভাবে আদায় করব। কিন্তু ইয়া আল্লাহ! আপনার তাওফীক ব্যতীত আমি এ অঙ্গীকারের উপর অটল থাকতে পারব না। এ জন্য যখন আমি এই অঙ্গীকার করে ফেলেছি তো আপনি আমার এই অঙ্গীকারের লাজ রক্ষা করুন। এবং আমাকে এই অঙ্গীকারের উপর দৃঢ়পদ থাকার তাউফীক দান করুন। এবং আমাকে অঙ্গীকারভঙ্গ করা থেকে হেফাযত করুন।

৫৩. এই কষ্টসমূহ হচ্ছে বাধ্যগত মুজাহাদা

আমাদের হযরত ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, পূর্বের যুগে যখন মানুষ নিজ ইসলাহ বা সংশোধনের জন্য কোন শাইখ বা বুযুর্গের নিকট যেতেন, তখন ঐ বুযুর্গ ও শাইখ সেই মুরীদের দ্বারা প্রচুর মুজাহাদা ও রিয়াযত করাতেন। সেই মুজাহাদাগুলো হত ইখতিয়ারভুক্ত মুজাহাদা। বর্তমান যুগে আর ঐ সব বড় বড় মুজাহাদা করানো হয় না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই বান্দাদেরকে মুজাহাদা থেকে বঞ্চিত করেননি। বরং অনেক সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই সব বান্দার দ্বারা ইযতিরারী বা জোরপূর্বক মুজাহাদা করানো হয়। আর এই ইযতিরারী মুজাহাদার দ্বারা মানুষের যে উন্নতি হয় সেটা ইখতিয়ারী বা ইখতিয়ারভুক্ত মুজাহাদার তুলনায় অনেক দ্রুত হয়।

তাইতো সাহাবায়ে কেরামের রাযি. যিন্দেগীতে ইখতিয়ারী মুজাহাদা এত বেশি ছিল না। উদাহরণস্বরূপ : তাঁদের মধ্যে এমন ছিল না যে, জেনে বুঝে অনাহারে থাকা হবে। অথবা ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু তাঁদের জীবনে জোরজবরদস্তীমূলক মুজাহাদা ছিল অসংখ্য।

ফলশ্রুতিতে কালিমায়ে তায়্যিবাহ পড়ার কারণে তাঁদেরকে উত্তপ্ত বালুতে শোয়ানো হত। বুকের উপর ভারী পাথর রাখা হত। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য অবলম্বনের শাস্তি হিসেবে তাঁদের উপর আরো কত ধরনের অত্যাচার যে হয়েছে। এই সব মুজাহাদা ছিল

জোরজবরদস্তীমূলক। আর এই সব মুজাহাদার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এত উঁচু হয়ে গেছে যে, বর্তমানে কোন গাইরে সাহাবী বা সাহাবী নন এমন ব্যক্তি তাঁদের মাকামে পৌঁছতে পারবেন না।

এ জন্য বলেছেন যে, ইযতিরারী মুজাহাদার দ্বারা দারাজাত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বুলন্দ হয় এবং মানুষ দ্রুততার সাথে উন্নতি করে।

অতএব যে সব দুঃখ কষ্ট পেরেশানী অসুখ বিসুখ ইত্যাদি আসছে এই সবের মাধ্যমে ইযতিয়ারী বা জোর জবরদস্তীমূলক মুজাহাদা করানো হচ্ছে।

আর যেটাকে আমরা কষ্ট মনে করি, বাস্তবিকপক্ষে সেটা হল মহান আল্লাহর রহমত ও মহব্বতের শিরোনাম। এ সব গূঢ়তত্ত্ব বুঝা মানুষের সাধ্যের বাইরের জিনিস। আমাদের কী জানা আছে যে, কোন্ সময়ে মহান আল্লাহর কী হেকমত আছে।

৫৪. আল্লাহ তাআলার সামনে কী উত্তর দিবে?

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, মুহাসাবা বা আত্মসমীক্ষার একটি পদ্ধতি এই যে, তুমি এটা চিন্তা করবে যে, আমি হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি। আমার হিসাব কিতাব হচ্ছে। আমলনামা পেশ করা হচ্ছে। আমার আমলনামার মধ্যে আমার মন্দ আমলসমূহের রেকর্ডও আছে। সেগুলো সব সামনে আসছে। আর আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে, তুমি এই সব মন্দ কাজ ও গুনাহ কেন করেছিলে? ঐ সময় কি তুমি আল্লাহ তাআলাকে সেই উত্তরই দিবে যা আজ তুমি মৌলভী ছাহেবকে দিচ্ছ? আজ যখন কোন সংশোধনকারী বা মৌলভী ছাহেব তোমাকে বলে যে, ঐ কাজ করো না, দৃষ্টির হেফাযত কর। সুদ থেকে বাঁচো। গীবত এবং মিথ্যা থেকে বাঁচো। টিভির মধ্যে যে সব অশ্লীলতা আর উলঙ্গপনা প্রদর্শিত হয় সেগুলো দেখো না। বিবাহ শাদীর অনুষ্ঠানে পর্দাহীনতা থেকে বাঁচো। তো এ সব নসীহতের প্রতিউত্তরে তুমি মৌলভী ছাহেবকে এই উত্তর দিয়ে থাক যে, আমরা কী করব? যমানাই তো এমন খারাপ! সারা দুনিয়া উন্নতি করছে। মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে। আমরা কি তাদের থেকে পিছিয়ে থাকব? আর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে পড়ব? আর বর্তমান যুগে এ সব কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এটাই সেই উত্তর যা আজ তুমি মৌলভী ছাহেবকে দিচ্ছ। আল্লাহ তাআলার সামনেও কি এ উত্তর দিতে পারবে? আল্লাহ তাআলার

সামনে কি এই উত্তর যথেষ্ট হবে? কিন্তু অন্তরে হাত রেখে চিন্তা করে বল। যদি এই উত্তর সেখানে না চলে, তাহলে আজ দুনিয়াতেও এ উত্তর যথেষ্ট হতে পারে না।

৫৫. গুনাহের চাহিদার সময় করণীয়

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার ধ্যান করতে চায়, তাহলে অনেক সময় আল্লাহ পাকের ধ্যান হয় না। কেননা আল্লাহ তাআলাকে তো সে কখনো দেখেনি। আর ধ্যান তো ঐ জিনিসের হয় যাকে মানুষ দেখেছে। এজন্য আল্লাহ পাকের ধ্যান করতে কষ্ট হয়। কিন্তু যখন গুনাহের চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হয়, তখন একটা জিনিসের ধ্যান করা আর সেটা হচ্ছে এই যে, আমি যে গুনাহ করার ইচ্ছা করছি যদি ঐ গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় আমার আব্বা আমাকে দেখে ফেলেন। অথবা আমার ছাত্র আমাকে দেখে ফেলে। অথবা আমার সন্তান কিংবা আমার শিক্ষক বা বন্ধু-বান্ধব আমাকে দেখে ফেলে, তাহলে কি আমি ঐ সময়েও এই গুনাহের কাজটি করব?

উদাহরণস্বরূপ : দৃষ্টিকে অপাত্রে ফেলার চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হল। ঐ সময় একটু চিন্তা করো যে, যদি এ মুহূর্তে তোমার শাইখ বা পিতা বা সন্তানাদি তোমাকে দেখতে থাকে, তাহলে কি ঐ সময় তুমি তোমার চোখকে ভুল স্থানে নিবদ্ধ করবে? বলা বাহুল্য যে, উঠবে না। কেননা এই ভয় আছে যে, যদি এদের মধ্যে কেউ আমাকে এ অবস্থায় দেখে ফেলে, তাহলে এরা আমাকে খারাপ মনে করবে।

অতএব যখন এ মামুলী পর্যায়ের মাখলূক এর সামনে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং দৃষ্টি নত করছে, তাহলে প্রত্যেক গুনাহের ক্ষেত্রে এটা ধ্যান করবে যে, আল্লাহ তাআলা যিনি মালিকুল মুলক তথা রাজাধিরাজ এবং এ সব কিছুর খালিক ও মালিক, তিনি আমাকে দেখছেন। এই ধ্যান করলে ইনশাআল্লাহ অন্তরে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

৫৬. হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. এর একটি ঘটনা

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, যখন আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি এবং তাঁর নিকট মহব্বতের দু'আ প্রার্থনা করি

যে হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার মহব্বত দান করুন। ঐ সময় আমার অনুভূতি এমন হয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে বলছেন তুমি আমাকে মহব্বত করতে চাও? অথচ তুমি তো আমাকে দেখোনি যে, সরাসরি আমাকে মহব্বত করবে এবং আমার সাথে ঐভাবে সম্পর্ক করবে যেভাবে দৃশ্যমান কোন বস্তুর সাথে সম্পর্ক করা যায়। কিন্তু যদি আমার সাথে তোমার সম্পর্ক স্থাপন করতে মনে চায়, তাহলে জেনে রাখ আমি দুনিয়াতে আমার মহব্বতের প্রকাশস্থল ঐ সব বান্দাকে বানিয়েছি। এ জন্য তুমি আমার বান্দাগণকে মহব্বত কর। তাদের প্রতি সদয় হও। তাদের সাথে বিনম্র আচরণ কর। এর দ্বারা আমার মহব্বত পয়দা হবে। আর আমার সাথে মহব্বতের পদ্ধতিও এটাই। কাজেই এটা বুঝতে হবে যে, আমরা তো আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করি।

এই বান্দা কী জিনিস? এই মাখলূক কী বস্তু? এরা তো তুচ্ছ। অতঃপর মাখলূকাতের দিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকানো, তাদেরকে খারাপ মনে করা এটা এ কথার আলামত যে, আমি আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বাতের যে দাবী করছি সেটা হল মিথ্যা মহব্বত। কেননা যে ব্যক্তির আল্লাহ পাকের সত্তার সাথে মহব্বত হবে, ঐ ব্যক্তির আল্লাহ পাকের মাখলূকের সাথে অবশ্যই মহব্বত হবে।

এ জন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন কাজে সহযোগিতা করে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে সহযোগিতা করেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পেরেশানী দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির পেরেশানী দূর করবেন"।

৫৭. একটি মাছির উপর স্নেহের আশ্চর্য ঘটনা

আমি আমার শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. থেকে এ ঘটনা শুনেছি যে, একজন বুযুর্গ ছিলেন যিনি অনেক বড় আলেম ফাযিল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন। সারা জীবন দারস ও তাদরীস, তাসনীফ ও লেখালেখির মধ্যে কাটিয়েছেন এবং ইলমের সমুদ্র বইয়ে দিয়েছেন। যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন কেউ একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল যে, হযরত! আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন যে, মহান আল্লাহর দয়া যে, আমার উপর তিনি অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু মুআমালা বড় আশ্চর্যজনক হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের মধ্যে এটা ছিল যে,

আমরা আলহামদুলিল্লাহ্ সারা জীবন দ্বীনের অনেক খেদমত করেছি। দারস ও তাদরীস তথা পঠন ও পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি। ওয়ায ও তাকরীর করেছি। রচনাবলী ও লেখালেখি করেছি। দ্বীনের তাবলীগ করেছি। হিসাব-কিতাবের সময় এই সব খেদমতের আলোচনা সামনে আসবে। এবং এই সব খেদমতের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা আপন ফযল ও করমে সিক্ত করবেন। কিন্তু হল এই যে, যখন মহান আল্লাহর সামনে আমাকে পেশ করা হল, তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি কি জান কেন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি? আমার মনের মধ্যে এটা এসেছিল যে, আমি দ্বীনের যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি, সম্ভবত সেটার বদৌলতে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বললেন : না, আমি তোমাকে অন্য একটি কারণে মাফ করে দিয়েছি। সেটা হচ্ছে এই যে, একদিন তুমি কিছু একটা লিখছিলে। ঐ যুগে বাঁশের কলম হত। ঐ কলমকে কালিতে ডুবিয়ে পুনরায় লেখা হত। তুমি লেখার জন্য নিজ কলমকে কালিতে ডুবিয়েছিলে। তখন একটি মাছি ঐ কলমের উপর বসে গেল। আর মাছিটি ঐ কলমের কালি চুষতে লাগল। তুমি ঐ মাছিটি দেখে কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিলে। আর এটা চিন্তা করেছিলে যে, এই মাছিটি হয়ত তৃষ্ণার্ত, একে কালি পান করার সুযোগ দেয়া হোক। আমি পরে লিখব, তুমি তখন তোমার কলমকে আটকে রেখেছিলে। সেটা একমাত্র আমার মহব্বতে আমার মাখলূকের মহব্বতে ইখলাসের সাথে আটকে রেখেছিলে। ঐ সময় তোমার অন্তরে অন্য কোন স্পৃহা ছিল না। যাও। এই আমলের প্রতিদানে আজ আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. যেভাবে হকসমূহ আদায় করে দেখিয়েছেন সেটার কোন তুলনা হয় না।

এ কথাটাকে কেউ অত্যুক্তি মনে করতে পারেন। কিন্তু এটাই বাস্তব যে, হযরতওয়ালা রহ. সারা জীবনে কখনো স্বীয় স্ত্রীর সাথে গলার স্বর পরিবর্তন করে কথা বলেননি। বরং কখনো এমন বলেননি যে, “অমুক কাজটি করে দাও”। তাঁর স্ত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হযরতর খেদমত করতেন। কিন্তু হযরত কখনো তাঁকে পানি পান করানোর কথাও বলেননি। এ কথাটা হযরত নিজেও আমাদের তারবিয়্যতের জন্য বলেছিলেন। আর হযরতের সম্মানিতা স্ত্রী অধমের স্ত্রীর নিকটও একাধিকবার এটা উল্লেখ করেছেন।

আপনি আন্দাজ করুন। প্রায় ষাট বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক। এটা এমন এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেখানে ঠান্ডা গরম হওয়ার অবস্থা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি সামনে আসে। অনাকাংখিত বিষয়াবলীও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সামনে আসতে থাকে। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে গোস্বার বহিঃপ্রকাশ তো পরের কথা কখনো স্বর পরিবর্তন করেও কথা বলেননি। সাধারণত স্ত্রীর কাছ থেকে খেদমত নেয়াটাকে স্বামীরা নিজেদের হক মনে করে থাকে। কিন্তু হযরত সারা জীবন কখনো কোন জিনিস উঠানো বা রাখার জন্য নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কোন কাজের জন্য বলেননি। আল্লাহু আকবার! মানুষেরা বাতাসে উড়া আর পানির উপর চলাকে কারামত মনে করে। অথচ এই চলমান জীবনে এর চেয়ে বড় কারামত আর কী হতে পারে? এ কাজ শুধু ঐ ব্যক্তিই আঞ্জাম দিতে পারেন যিনি নিজ সত্তাকে একদম মিটিয়ে দিয়ে সেটাকে শরীয়ত ও সুন্নাতের উপর কুরবান করে দিয়েছেন।

হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِيْ

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম।” (তিরমিযী শরীফ)

এই মহান সুন্নাতের উপর আমলের যে পন্থা হযরতওয়ালা রহ. অবলম্বন করেছেন, সেটা হযরতের পূর্বে আর কাউকে আমি দেখিনি। শুনিনি। যদি সরাসরি হযরতওয়ালা এবং তাঁর সম্মানিত স্ত্রীর কাছ থেকে এটা শোনা না হত, তাহলে এ যুগে এটা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল।

হযরত ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী রহ. এর বিবিধ মালফূযাত

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন : হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এই সুন্নাতের উপর আমলের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। যদিও তিনি বাহ্যিকভাবে নিজ বন্ধুবান্ধব ভক্ত ও মুরীদবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। ঘরে হাস্য রসিকতার কথাবার্তা বলতেন। শিশুদের সাথে দুষ্টুমিও করতেন। কিন্তু এ সবকিছুর পাশাপাশি অন্তর আল্লাহ পাকের দিকেই নিবদ্ধ থাকত।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. বলতেন : যখন কেউ কোন প্রশ্ন করে তখন আলহামদুলিল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নিকট মনে মনে দু‘আ করি যে, ইয়া

আল্লাহ! আমি কী উত্তর দিব? আপনার অনুগ্রহে সঠিক উত্তর আমার অন্তরে ঢেলে দিন। অতঃপর আমি উত্তর দেই।

এমনিভাবে হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. বলেছেন : যখন আমার ভক্তবৃন্দের মধ্যে কাউকে তার ভুলের উপর বকাঝকা করি, তখন যদিও রাগের ভঙ্গি অবলম্বন করি কিন্তু তখনও দুটো জিনিস আলহামদুলিল্লাহ মনের মধ্যে থাকে। একটি হল ঐ শাসন করার সময় আমি দিলে দিলে আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করি ইয়া আল্লাহ! আমার থেকে এভাবে পাকড়াও করবেন না। দ্বিতীয়ত ঐ গোস্বার প্রকাশ মুহূর্তেও নিজেকে সম্বোধিত ব্যক্তি থেকে উত্তম মনে করি না। বরং নিজেকে ঐ জল্লাদের মতে মনে করি যাকে বাদশাহ কোন শাহযাদাকে শাস্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ জল্লাদ বাদশাহর নির্দেশ পালনার্থে শাহযাদাকে শাস্তি তো দেয় ঠিক। কিন্তু যদি তার মধ্যে অণু পরিমাণ আকল থাকে তাহলে সে কখনো এটা মনে করবে না যে, আমি শাহযাদা থেকে শ্রেষ্ঠ। সে শাস্তি দেয়ার সময়ও অন্তর থেকে এটাই মনে করতে থাকে যে, শাহযাদাই শ্রেষ্ঠ। আর আমি তো বাস্তবিকপক্ষে বাদশাহর নির্দেশ পালন করার জন্য শাস্তির হাকীকত বিহীন এক যন্ত্র মাত্র।

আল্লাহু আকবার! যে সম্মানিত সত্তার আবদিয়্যত, কানাইয়্যত তথা দাসত্ব ও আত্মবিলোপ এবং রুজু ইলাল্লাহ এর এই মাকাম, তিনি তাঁর খাস মুরীদদেরকে রুজু ইলাল্লাহ এর কোন্ মানযিলে পৌঁছে দিয়েছেন?

তাইতো হযরত ডাঃ ছাহেব কুদ্দিসা সিররুহু এর পবিত্র হায়াতেও আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্কের অত্যাশ্চর্য ও দুর্লভ কাইফিয়ত আমাদের মত রুচিহীন খাদেমদেরও অনুভূত হওয়া ব্যতীত থাকত না।

সম্ভবত: এ কথা বলা হলে বাড়াবাড়ি হবে না যে, হযরতওয়ালা রহ. স্বীয় যিন্দেগীর প্রতিটি কাজে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করে তাঁর থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করায় অভ্যস্ত ছিলেন। ছোট থেকে ছোট কাজেও এর ব্যত্যয় হত না।

নিজের খাদেমবৃন্দকে বলতেন যে, প্রত্যেক কাজের পূর্বে اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ অর্থাৎ "আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করি" বলার অভ্যাস তৈরী কর।

বরং সব সময় দিলে দিলে এ গুঞ্জন লাগাও যে "ইয়া আল্লাহ! এখন কী করব?" অতঃপর দেখ কী থেকে কী হয়?

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলতেন যে, আমি বছরের পর বছর এ ব্যাপারটি মশ্‌ক করেছি যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি কাজ সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে করা হবে। আর মশ্‌ক এভাবে করেছি যে, সুস্বাদু খানা সামনে এসেছে। ক্ষুধা লেগেছে, দিল চাচ্ছে এটা খেতে। কিন্তু সামান্য কয়েকটি মুহূর্তের জন্য নফসকে খানা থেকে নিবৃত্ত রেখেছি। "নফসের চাহিদায় খানা খাব না"। অতঃপর চিন্তা করেছি যে, এটা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও তাঁর দান। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত ছিল এই যে, আল্লাহ পাকের নেয়ামতসমূহকে শোকর আদায় করে ব্যবহার করতেন। এখন এই সুন্নাতের অনুসরণে খাব। বাসায় ঢুকলাম। বাচ্চাদের দেখে খুব মায়া লাগল। মনে চাইল একে কোলে উঠিয়ে একটু আদর করি। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য নফসকে আটকে রাখলাম যে, নফসের চাহিদামত একে উঠাব না। কিছুক্ষণ মুরাকাবা বা ধ্যান করলাম যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাদেরকে মহব্বাত করতেন। তাদেরকে খাওয়াতেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সুন্নাতের অনুসরণে উঠাব।

ঠাণ্ডা পানি সামনে আসল, তৃষ্ণা আছে। মনে চাচ্ছে এটাকে দ্রুত পান করতে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে আটকে রাখলাম। আর বললাম যে, স্রেফ দিলের খাহেশের উপর পানি পান করব না। অতঃপর কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মনে হল যে, ঠাণ্ডা পানি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর খুব পসন্দীয় ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণে পান করব। এবং ঐ সব আদবের প্রতি লক্ষ রেখেই পান করব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোর ব্যাপারে লক্ষ রাখতেন।

আরেকটি অদ্ভূত ঘটনা হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. থেকে কয়েকবার শুনেছি। হযরত বলেন : একবার হযরত ডেপুটি আলী সাজ্জাদ ছাহেব রহ. যিনি হযরত ডাঃ ছাহেবের রহ. শশুরও ছিলেন আবার ফুফাও ছিলেন। এবং হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর মুজাযে সুহবাত ছিলেন, হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এর নিকট থানাভবনে গিয়েছিলেন। আমিও সেখানে উপস্থিতির ইচ্ছা করে ফেলি। এবং সফরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা

পরিপূর্ণ করে হযরত থানভী (রহ.)কে অবগতিও দিয়ে দেই যে, আমি উপস্থিত হচ্ছি।

ঘটনাক্রমে ঐ দিনগুলোতে হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. থানাভবন থেকে সম্ভবত কানপুর সফরের এরাদা করে ফেলেছিলেন।

এ প্রেক্ষাপটে হযরত ডেপুটি আলী সাজ্জাদ ছাহেব রহ. হযরত রহ. এর নিকট আরয করলেন যে "হযরত সফরে চলে যাচ্ছেন অথচ আব্দুল হাই রহ. এখানে আসছেন"!

এই প্রেক্ষিতে হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. বললেন : "আমি তাঁকে নিষেধ করে দিয়েছি।" এ কথা শুনে হযরত ডেপুটি ছাহেব নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে সম্ভবত চিঠি বা তার ইত্যাদির মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছেন।

হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. বলেন : এ দিকে আমি সফরের জন্য সম্পূর্ণ পাক্কা ইচ্ছা করে ফেলেছি। সমস্ত ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ। কিন্তু যখন সফরের সময় হল, তখন কলবের মধ্যে সফরের ব্যাপারে এমন মারাত্মক অনীহা সৃষ্টি হল যে, আজব সংশয়ের শিকার হয়ে গেলাম। মনকে দারুণ অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন কোনভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিল না। হাজার বার মনকে বুঝালাম যে, সমস্ত ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ। হযরতকে অবগতিও দিয়েছি। থানাভবনে উপস্থিতির সুযোগও দারুণ ব্যাপার। এত কিছুর পরও মন কিছুতেই প্রস্তুত হল না। এমনকি আমি অপারগ হয়ে সফরের ইচ্ছা মুলতবী করে দিলাম।

পরবর্তীতে জানতে পারি যে, হযরত থানভী রহ. সফরে রওয়ানা হয়েছিলেন। এরপর সম্ভবত কানপুরেই হযরতের সাথে সাক্ষাত হল। তখন আমি সমস্ত ঘটনা হযরতের ডেপুটি ছাহেব যিনি এটা মনে করেছিলেন যে, হযরত কোন চিঠির মাধ্যমে আমাকে আটকে দিয়েছেন। উনি যখন জানতে পারলেন যে, আমার নিকট হযরতের পক্ষ থেকে কোন অবগতি পৌঁছেনি, তখন তিনিও খুব হয়রান হলেন। এবং হযরতকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন হযরত হাকীমুল উম্মাত এ মর্মের একটি কথা বললেন যে, একজন ঈমানদার ব্যক্তির কলবের মধ্যে কি এ পরিমাণ শক্তিও নেই যে, সে নিজ কোন বন্ধুকে কোন পয়গাম পৌঁছাবে?

আল্লাহু আকবার! হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর 'তাসাররুফাত" ইত্যাদি মামূল ব্যবহারের অভ্যাস ছিল না। এ সব বিষয়কে বিশেষ কোন গুরুত্বও দিতেন না। কিন্তু হযরত ডাঃ ছাহেব রহ. এর সঙ্গে হযরতের রহ. এমনই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল যে, এ ব্যাপারে যত চিন্তাই করা হোক, এর দ্বারা শাইখ ও মুরীদ উভয়ের উচ্চ মাকাম এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অসাধারণ আন্দায সামনে চলে আসে।

উর্দূ কবি বলেছেন :

جو سانس آرہا ہے کسی کا پیغام ہے

যে শ্বাস আসছে সেটা কারো বার্তা বটে।

চতুর্থ অধ্যায়
দেওবন্দের কয়েকজন প্রখ্যাত আকাবিরের ইরশাদাত

১. মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ

হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. একবার মজলিসে উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : মনে করুন এক ব্যক্তি কোন বিরান ভূমিতে নিজ স্ত্রীর সাথে থাকেন। আশপাশে কোন আবাদীও নেই। শুধু স্বামী-স্ত্রী সেখানে থাকেন। এদিকে স্বামীর হঠাৎ করে আবাদ এলাকার মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার আগ্রহ সৃষ্টি হল। এখন স্ত্রী বলছেন যে, এটা তো বিরান ও জনমানবশূন্য এলাকা। তুমি নামায পড়ার জন্য আবাদীর মসজিদে চলে গেলে আমার ভয় লাগবে। ভয়ের চোটে আমি মরে যাব। এজন্য মসজিদে না গিয়ে তুমি ঘরেই নামায পড়ে নাও।

হযরতওয়ালা রহ. বলেন : ঐ স্বামী ছিল সাংঘাতিক জোশওয়ালা মানুষ। ফলশ্রুতিতে সে নিজের স্ত্রীকে ঐ বিরান ময়দানে একা রেখে নামায আদায়ের জন্য চলে গেল!

হযরত রহ. বলেন : এটা হল আবেগ পূর্ণ করা। এটা দ্বীন নয়। কেননা ঐ সময়ের তাকাযা এটাই ছিল যে, সে ঘরে নামায পড়বে এবং স্বীয় স্ত্রীর এ পেরেশানী দূর করবে।

এটা হল ঐ স্থানের বিধান বা সম্পূর্ণ বিরান। কোন আবাদী নাই। অবশ্য আবাদী থাকলে মসজিদে গিয়ে নামায পড়া উচিত।

অতএব বুঝা গেল স্বীয় আবেগ পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়। কারো জিহাদে যাওয়ার জোশ্, কারো তাবলীগে যাওয়ার স্পৃহা, কারো মৌলভী হওয়ার শখ,

কারো মুফতী বনার ইচ্ছা... আর এই আবেগ পুরা করতে গিয়ে ঐ সব হকের প্রতি খেয়াল নেই যা তার দায়িত্বে বর্তায়। এ ব্যাপারে কোন লক্ষ্য নেই যে, এ মুহূর্তে ঐ সব হকের তাকাযা কী?

এই যে বলা হয় কোন শাইখের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। এটা বাস্তবিক পক্ষে এ জন্যই। শাইখ বাতলে দেন যে, এ সময়ের তাকাযা বা চাহিদা কী? এ সময় তোমার কোন্ কাজ করা উচিত?

এখন এ কথাগুলো আমি এভাবে বলছি। সামনে হয় তো কেউ এভাবে নকল করে দিবে যে ঐ মাওলানা ছাহেব বলছিলেন যে মুফতী হওয়া খারাপ কাজ। বা তাবলীগ করা খারাপ কাজ। উনি তো তাবলীগ বিরোধী যে, তাবলীগে বা চিল্লায় বের হতে নিষেধ করেন। অথবা জিহাদে যাওয়া অনুচিত!!

আরে ভাই এ সব কাজ স্ব স্ব সময়ে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির কাজ। কিন্তু তোমাকে এটা দেখতে হবে যে, কোন্ সময় কী তাকাযা? সময় তোমার নিকট কী দাবী করছে? সেই তাকাযা আর দাবী অনুসারে আমল কর। নিজের মন ও মস্তিষ্ক থেকে একটি পথ নির্ধারণ করে নিলে আর এর উপরই চলা আরম্ভ করে দিলে। এটা দ্বীন নয়। দ্বীন হল তুমি দেখ সময় কিসের দাবী করছে? কোন্ কাজের নির্দেশ দিচ্ছে?

২. স্বীয় আবেগ পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়

আমাদের হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. আল্লাহ তাআলা তাঁর দারাজাতকে বুলন্দ করুন। আমীন। ঐ সমস্ত বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন যাঁদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত মূল্যবান কথা ঢেলে থাকেন।

তিনি বলতেন যে, ভাই! নিজের আবেগ পুরা করার নাম দ্বীন নয়। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের নাম হল দ্বীন। এর নাম দ্বীন নয় যে, অমুক কাজের শখ হয়ে গেল। কাজেই এখন তো ঐটাই করব। উদাহরণস্বরূপ ঃ ইলমে দ্বীন শেখা এবং আলেম হওয়ার শখ পয়দা হল। এ ব্যাপারে কোন লক্ষ্য নেই যে, তার জন্য আলেম হওয়া জায়েয আছে কি নেই? বাসায় মা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে, বাবা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী, তাঁদের দেখা এবং সেবা শুশ্রুষা করার মত বাসায় আর কেউ নেই। কিন্তু আপনার শখ হয়েছে আপনি আলেম হবেন। ফলে মা বাবাকে অসুস্থ অবস্থায়

রেখে মাদরাসায় পড়তে চলে গেছে। এটা দ্বীনের কাজ নয়। এটা তো ব্যক্তিগত আবেগ পুরা করা। দ্বীনের কাজ তো হল সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মায়ের খেদমত করা। বাবার খেদমত করা।

৩. নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ রাখার বিধান

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে মাক্কী রহ. একটি ঘটনা বয়ান করেছেন। এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত থানভী রহ. বলেন : আসল কথা হল আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল নামায পড়ার যে সুন্নাত তরীকা বাতলিয়েছেন সেটা ছিল এই যে, চোখ খুলে নামায পড়তে হবে। সেজদার স্থানে দৃষ্টি থাকবে। এটাই হল সুন্নাত পদ্ধতি। যদিও অন্য তরীকাও জায়েয আছে। গুনাহ নাই। কিন্তু সুন্নাতের নূর সেটার মধ্যে হাসিল হবে না।

যদিও ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, যদি নামাযের মধ্যে বাইরের চিন্তা বেশি আসে। তাহলে খুশু অর্জনের জন্য এবং খেয়ালসমূহকে প্রতিরোধ করার জন্য যদি কোন ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে নামায পড়ে, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। জায়েয আছে। কিন্তু তারপরও সুন্নাতের খেলাফ। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন কখনো চোখ বন্ধ করে নামায পড়েননি। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) কখনো কোন নামায চোখ বন্ধ করে আদায় করেননি। এ জন্যই বলা হয় যে, এ নামাযের মধ্যে সুন্নাতের নূর থাকবে না।

৪. জনৈক বুযুর্গের চোখ বন্ধ করে নামায পড়া

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. একটি ঘটনা বয়ান করেছেন। যেটাকে হযরত থানভী রহ. নিজ ওয়াযের মধ্যে নকল করেছেন। সেটা হল তাদের নিকটবর্তী যুগে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি যখন নামায পড়তেন। তখন চোখ বন্ধ করে নামায পড়তেন। অথচ ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন : নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ করা মাকরূহ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির এটা ছাড়া খুশু হাসিল না হয়, তাহলে তার জন্য চোখ বন্ধ করে নামায পড়া জায়েয। কোন গুনাহ হবে না।

তো ঐ বুযুর্গ খুব সুন্দরভাবে নামায পড়তেন। সমস্ত রোকনগুলোর মধ্যে সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু এর পাশাপাশি চোখ বন্ধ করে নামায পড়তেন। এদিকে মানুষের মধ্যে তাঁর নামায প্রসিদ্ধ ছিল। কেননা অত্যন্ত খুশু-খুযূ ও চরম পর্যায়ের কাকুতি মিনতির সাথে নামায পড়তেন। ঐ বুযুর্গ ছাহেবে কাশফ বা কাশফ শক্তির অধিকারী ছিলেন।

একবার তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট দরখাস্ত করলেন, ইয়া আল্লাহ! এই যে নামায আমি পড়ি আমি এটা দেখতে চাই যে, আপনার নিকট আমার নামায কবূল নাকি কবূল নয়? কবূল হলে কোন্ পর্যায়ের কবূল? এবং এর সূরত কি? সেটা আমাকে দেখিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দরখাস্ত কবূল করলেন। এবং একজন অত্যন্ত সুন্দরী রূপসী নারী সামনে আনা হল। যার মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য ছিল। ঐ বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া আল্লাহ! এত সুন্দরী একজন মহিলা কিন্তু তার চোখ কোথায়? উত্তরে বলা হল : তুমি যে নামায পড় সেটা তো চোখ বন্ধ করেই পড়! এ জন্য তোমার নামাযটাকে একজন অন্ধ মহিলার আকৃতিতে দেখানো হয়েছে।

৫. দুনিয়াওয়ালাদের কত দিন পর্যন্ত খেয়াল করবে?

আমাদের বুযুর্গ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস ছাহেব কান্ধলভী রহ. আল্লাহ তাআলা তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন। আমীন। এ যুগে আল্লাহ তাআলা একজন জান্নাতী বুযুর্গ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বাসার বৈঠক ঘরে সাধারণ চাদর বিছানো থাকত। ঘরের মহিলাদের অন্তরে এই খেয়াল আসল যে, এখন যুগ পাল্টে গেছে। চাদর বিছানোর যুগ এখন আর নাই। এ জন্য তারা মাওলানার নিকট দরখাস্ত করলেন যে আপনি এ বিছানা উঠিয়ে দিন আর সোফা লাগিয়ে দিন। হযরত মাওলানা বললেন : আমার সোফার কোন শখ নেই। আর এতে আমি আরামও পাব না। আমার তো বিছানায় বসেই আরাম লাগে। আমি তো ওখানে বসেই কাজ করব।

মহিলারা বললেন : আপনি এতে আরাম পান। কিন্তু দুনিয়াওয়ালাদেরও তো একটু খেয়াল করতে হয়।

এর উপর হযরতওয়ালা আজীব উত্তর দিয়েছেন : বললেন, "বিবি! দুনিয়াওয়ালাদের তো আমি খেয়াল করব কিন্তু তুমি আমাকে এটা বল যে, দুনিয়াওয়ালারা আমার কী খেয়াল করেছে? আমার কারণে তাদের কেউ কি নিজেদের জীবন যাপন পদ্ধতির মধ্যে কোন পরিবর্তন এনেছে? যখন তারা আমার খেয়াল করেনি, তো আমি কেন তাদের খেয়াল করব?"

৬. "বান্দা" নিজ মর্জিমত চলে না

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. বলতেন যে, ভাই! এক হয় "চাকর"। চাকরের নির্ধারিত ডিউটি থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ একজন চাকরের ডিউটি হল ৮ ঘণ্টা। ৮ ঘণ্টা পর তার ছুটি। আরেকটা হল "গোলাম"। যার কোন সময় বা ডিউটি ভাগ করা নেই। সে তো হুকুমের দাস। যদি মালিক তাকে বলে যে, তুমি এখানে বিচারক হয়ে বসে পড় আর মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর। তাহলে সে বিচারক হয়ে ফয়সালা করবে। মালিক যদি তাকে বলে যে, তুমি পায়খানা উঠাও তাহলে সে পায়খানা উঠাবে। তার জন্য না আছে সময়ের বাধ্যবাধকতা না আছে কাজের বাধ্যবাধকতা। বরং মালিক যা বলবে গোলামকে তাই করতে হবে। "গোলাম" এরও ঊর্ধ্বে একটি শ্রেণী আছে সেটা হল "বান্দা"। সে গোলাম থেকেও ঊর্ধ্বে। কেননা "গোলাম" তো আর যাই হোক নিজ মালিকের ইবাদত করে না। কিন্তু "বান্দা" স্বীয় মালিকের ইবাদত করে। আর "বান্দা" নিজ মর্জিমত চলে না। বরং মালিক যা বলে তাই করে। দ্বীনের রূহ এবং হাকীকত এটাই।

৭. ইংরেজের কথায় হাঁটুও খুলে দিয়েছে

আমাদের একজন বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভী রহ. তিনি একটি বক্তব্যে বলছিলেন যে, এখন আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে এই যে, যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন : টাখনু খোলা রাখো (পুরুষদের জন্য) এবং টাখনু ঢাকা জায়েয নেই। সেখানে আমরা টাখনু খুলতে প্রস্তুত নই। পক্ষান্তরে যখন ইংরেজরা বলেছে : হাঁটু খুলে দাও এবং জাইঙ্গা পরিধান কর!! ব্যস এখন আমরা হাঁটু উন্মুক্ত করতে ও জাইঙ্গা পরিধান করতে প্রস্তুত হয়ে গেছি! এটা কত বড় আত্মমর্যাদা পরিপন্থী কাজ! আরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মহব্বাতেরও কিছু তাকাযা বা দাবী আছে। কাজেই যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আমলটি পসন্দ করেননি। তখন একজন মুসলমান কিভাবে এর বিরোধিতাকে সহ্য করতে পারে?

৮. দাওয়াতের দুর্লভ ঘটনা

আমাদের একজন বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস ছাহেব কান্ধলভী রহ. আল্লাহ তাআলা তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন। আমীন।

তিনি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন। লাহোরে অবস্থান করতেন। একবার করাচী আসার পর দারুল উলূম কৌরঙ্গীতে আব্বাজানের সাথে সাক্ষাতের জন্যও এসেছিলেন। যেহেতু আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন এবং আমার আব্বাজানের মুখলিস বন্ধু ছিলেন এ জন্য তিনি সাক্ষাত করায় আব্বাজান রহ. খুব খুশী হলেন। সকাল দশটার দিকে দারুল উলূম পৌঁছেছিলেন। আব্বাজান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : কোথায় অবস্থান করছেন? বললেন যে আগ্রাতাজ কলোনীতে এক বন্ধুর ওখানে অবস্থান। ফিরে যাবেন কবে? বললেন : ইনশাআল্লাহ আগামী কাল লাহোরে ফিরে যাব।

যাইহোক কিছুক্ষণ কথাবার্তা এবং সাক্ষাতের পর যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আব্বাজান রহ. তাঁকে বললেন যে ভাই মৌলভী ইদরীস! তুমি এতদিন পর এখানে এসেছ। আমার মন চাচ্ছে তোমাকে দাওয়াত করি। কিন্তু আমি এটা চিন্তা করছি যে, তুমি আগ্রাতাজ কলোনীতে অবস্থান করছ। আর আমি এখানে কৌরঙ্গীতে থাকি। এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে, অমুক সময় আমার এখানে এসে খানা খাবে। তাহলে তো আমি তোমাকে বিপদে ফেলে দিব। যেহেতু আগামীকালই তোমাকে ফিরে যেতে হবে। নিশ্চয়ই অনেক কাজ থাকবে তোমার। এ জন্য মন এতেও সায় দেয় না যে, তোমাকে এখানে পুনরায় আসার কষ্ট দেই। আবার এটাও মেনে নিতে পারছি না যে, তুমি আসলে আর বিনা দাওয়াতে চলে গেলে। এ জন্য আমার পক্ষ থেকে দাওয়াতের পরিবর্তে এই একশত রূপী হাদিয়া হিসেবে রেখে দাও। মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস ছাহেব রহ. ঐ একশত টাকার নোট নিজের মাথার উপর রাখলেন এবং বললেন যে আপনি তো এর মাধ্যমে আমাকে অনেক বড় নেয়ামত দিলেন। আপনার দাওয়াতের সৌভাগ্যও লাভ হল। কোন কষ্টও উঠাতে হল না। অতঃপর অনুমতি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

৯. খানার প্রতিক্রিয়ার ঘটনা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব নানূতভী রহ. যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সাদর মুদাররিস বা প্রধান শিক্ষক এবং হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর উসতাদ ছিলেন। তাঁরই একটি ঘটনা। জনৈক ব্যক্তি একবার হযরতওয়ালাকে দাওয়াত দেয়। হযরত সেখানে গমন করেন। খানা শুরু করেন। এক লোকমা খাওয়ার পর বুঝতে পারেন যে, যিনি দাওয়াত

করেছেন তার আমদানী হালাল নয়। যদ্দরুন এ খানা হালাল নয়। ফলে তিনি খানা বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ফিরে চলে গেলেন। কিন্তু একটি লোকমা যা হলকের ভেতর চলে গিয়েছিল সেটার ব্যাপারে বলতেন যে : ঐ এক লাকমা যা আমি গিলে ফেলেছিলাম সেটার অন্ধকার দুই মাস পর্যন্ত অনুভূত হয়েছে। সেটা এভাবে যে দুই মাস পর্যন্ত আমার অন্তরে বারবার গুনাহের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে।

এখন বাহ্যিকভাবে তো এটার কোন যোগসূত্র বুঝে আসে না যে, এক লোকমা খাওয়া আর গুনাহের তাকাযা সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে কী সম্পর্ক?

আসল কথা হল আমাদের এই জন্যই বুঝে আসে না যেহেতু আমাদের সীনা গুনাহের অন্ধকারে ভরা। যেমন একটা সাদা কাপড়ে অসংখ্য কালো দাগ লেগে আছে। এরপর আরেকটি দাগ লাগল। খবরও নাই যে নতুন দাগ কোনটা? কিন্তু যদি সাদা কাপড় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়, সেটার উপর যদি একটি ছোট দাগও লাগে তাহলে দূর থেকে দেখা যাবে যে, দাগ লেগে গেছে।

ঠিক অনুরূপ আল্লাহওয়ালাদের অন্তর আয়নার মত সাফ ও পরিচ্ছন্ন হয়। সেটার উপর একটা দাগ লাগলেও ঐ দাগ বুঝা যায়। সেটার অন্ধকার নজরে আসে।

তাইতো আল্লাহর ঐ বান্দা বুঝে ফেলেছে যে, ঐ এক লোকমা খাওয়ার পূর্বে তো নেকীর আগ্রহ দিলের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল। গুনাহের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু এক লোকমা খাওয়ার পর অন্তরে গুনাহের তাকাযা পয়দা হচ্ছে।

এটার নাম "বরকতে বাতেনী"। যখন আল্লাহ তাআলা বরকতে বাতেনী দান করেন, তখন এর মাধ্যমে মানুষের বাতেনের মধ্যে উন্নতি হয়। আখলাক ও চিন্তাধারা শুদ্ধ হয়।

১০. হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ. এর বিনয়

হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন কান্ধলভী রহ. একবার কোন এক স্থান থেকে কান্ধলা ফিরছিলেন। গাড়ী থেকে কান্ধলা ষ্টেশনে নামার পর দেখলেন যে, একজন বয়স্ক মানুষ মাথার উপর মাল সামানার বোঝা বহন করে চলছেন। আর বোঝার কারণে তিনি চলতে পারছেন না। হযরতের মনে

হল যে, এই বেচারা খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। ফলে তিনি ঐ বৃদ্ধের নিকট গিয়ে বললেন যে, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আপনার বোঝাটি আমি বহন করতে চাই। ঐ বৃদ্ধ বললেন : আপনার অনেক অনেক শুকরিয়া, যদি আপনি এটা বহন করেন। ফলে মাওলানা ছাহেব তার সামানা মাথায় উঠিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এখন চলতে চলতে রাস্তায় কথাবার্তা আরম্ভ হল। হযরত মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন : কোথায় যাচ্ছেন? বৃদ্ধ উত্তর দিলেন : আমি কান্ধলা যাচ্ছি। মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন : কেন যাচ্ছেন? উনি বললেন : শুনেছি সেখানে একজন বড় মৌলভী ছাহেব আছেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন : ঐ বড় মৌলভী ছাহেব কে? তিনি বললেন : মাওলানা মুযাফফার হুসাইন কান্ধলভী। আমি শুনেছি তিনি অনেক বড় আলেম ও মাওলানা। মাওলানা বললেন : হ্যাঁ তিনি আরবী তো পড়তে পারেন। এভাবে কান্ধলা নিকটবর্তী হয়ে গেল। কান্ধলার সমস্ত মানুষ মাওলানাকে চিনত। যখন লোকেরা দেখল যে, মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব সামানা বহন করে চলেছেন, তখন লোকেরা তাঁর থেকে সামানা নেয়ার জন্য এবং তাঁর ইযযত-সম্মান করার জন্য তাঁর দিকে দৌড়ে আসলেন। এখন তো এ বড় মিয়ার প্রাণবায়ু বের হওয়ার অবস্থা! সাংঘাতিক পেরেশান হয়ে গেছেন যে, আমি এত বড় বোঝা হযরত মাওলানার উপর চাপিয়ে দিয়েছি। ফলে মাওলানা তাকে বললেন : ভাই! এতে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। আমি দেখলাম যে আপনি কষ্ট করছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে এ খেদমতের তাউফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার শোকর।

১১. বেশি খাওয়া কোন কৃতিত্ব নয়

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব নানূতভী রহ. এর দারুণ প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি ঘটনা আছে। তাঁর যুগে হিন্দুদের আর্য সমাজ ইসলামের বিরুদ্ধে খুব শোরগোল আরম্ভ করল। হযরত নানূতভী রহ. ঐ আর্যসমাজের সাথে বিতর্ক করতেন। যাতে করে মানুষের সামনে বাস্তব অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে একবার তিনি বিতর্কের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলন। সেখানে আর্যসমাজের একজন পন্ডিতের সাথে বিতর্ক ছিল। আর বিতর্কের পূর্বে খানার ব্যবস্থা ছিল। হযরত নানূতভী রহ. খুব অল্প খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। খানা খেতে বসার পর কয়েক লোকমা

খেয়ে হযরত উঠে গেছেন। পক্ষান্তরে আর্যসমাজের যে পন্ডিত ছিল সে ছিল সাংঘাতিক ভোজনরসিক। সে খুব খানা খেল। খানা শেষে মেযবান হযরত নানূতভী রহ.-কে বললেন : হযরত! আপনি তো অতি সামান্য খানা খেলেন। হযরত বললেন : আমার যতটুকু ইচ্ছা ছিল খেয়েছি। ঐ আর্যসমাজের পণ্ডিতও কাছেই বসা ছিল। সে হযরতের উদ্দেশ্যে বলল : মাওলানা! খানার মুকাবালায় তো আপনি এখনই হেরে গেলেন। আর এটা আপনার অশুভ লক্ষণ যে যখন আপনি খাওয়ার ক্ষেত্রে হেরে গেছেন, তো এখন দলীলের মুকাবালা হবে এটাতেও আপনি হেরে যাবেন।

হযরত নানূতভী রহ. উত্তর দিলেন যে ভাই! যদি খাওয়ার মধ্যে মুকাবালা ও মুনাযারা তথা প্রতিদ্বন্দিতা ও বিতর্ক করা উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে আমার সাথে করার কী প্রয়োজন ছিল? কোন মহিষ বা গরুর সাথেই করতেন। এই মুকাবালা হলে আপনি অবশ্যই মহিষের কাছে হেরে যাবেন। আমি তো দলীল-প্রমাণের বিতর্কে এসেছি। খানা খাওয়ার বিতর্কে আসিনি।

১২. মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব নানূতভী রহ. এর বিনয়

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব নানূতভী রহ. যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অনেক উঁচু পর্যায়ের আলেম ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে হযরত থানভী রহ. একটি ওয়াযের মধ্যে বলেছেন : তাঁর পদ্ধতি ছিল এই যে, যখন কেউ তাঁর সামনে তাঁর প্রশংসা করতেন, তখন সম্পূর্ণ নীরব থাকতেন। কিছু বলতেন না। বর্তমানে যে বানোয়াটি বিনয় অবলম্বন করে যে, আমাদের সামনে কেউ আমাদের প্রশংসা করলে উত্তরে আমরা বলি যে, এটা তো আপনার সুধারণা নতুবা আমি তো এর যোগ্য নই ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ মনে মনে খুব খুশী হই যে, এ মানুষটি আমার আরো প্রশংসা করুক! এর সাথে সাথে মনে মনে নিজেকে বড় মনে করি! যদিও মুখে মুখে বলি যে আমি কিছুই নই। এটা বাস্তবিকপক্ষে বানোয়াটি বিনয়। প্রকৃত বিনয় নয়।

কিন্তু হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব রহ. চুপ থাকতেন। এখন প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করত যে, হযরত মাওলানা নিজের প্রশংসায় আনন্দিত হন। প্রশংসা করাতে চান। এ জন্য প্রশংসা করা থেকে বাধাও দেননা। বিরতও রাখেন না। আর সেটার খণ্ডনও করেন না।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন : এখন প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি ভাববে তাঁর মধ্যে বিনয় নাই। অথচ এ সব জিনিসের নাম বিনয় নয় বরং বিনয় তো অন্তরের জিনিস। যার আলামত হল মানুষ কখনো কোন কাজকে নিজের থেকে ছোট মনে করবে না।

১৩. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর বিনয়

আমার আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুগীছ ছাহেব রহ. থেকে এ ঘটনা শুনেছেন যে, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব রহ. যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন করেছেন যা পুরা হিন্দুস্তান- আফগানিস্তান ও তুরস্ককে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাঁর প্রসিদ্ধি সারা হিন্দুস্তানে ছিল। যদ্দরুণ আজমীরের এক আলেম মাওলানা মুঈনুদ্দীন আজমিরী রহ. তাঁর মনে খেয়াল আসল যে দেওবন্দ গিয়ে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর সাথে সাক্ষাত করব। ফলে তিনি রেলগাড়ীর মাধ্যমে দেওবন্দ পৌঁছলেন। সেখানে একজন টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন যে আমাকে মাওলানা শাইখুল হিন্দের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দাও।

এখন সারা দুনিয়ায় তো তিনি শাইখুল হিন্দ নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু দেওবন্দে 'বড় মৌলভী ছাহেব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। টাঙ্গাওয়ালা জিজ্ঞেস করলেন : বড় মৌলভী ছাহেবের কাছে যেতে চান কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ বড় মৌলভী ছাহেবের কাছে যেতে চাই। ফলে টাঙ্গাওয়ালা হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর ঘরের দরওয়াযায় নামিয়ে দিয়ে যায়। গরমকাল ছিল। যখন তিনি দরওয়াযায় হাতের টোকা দিলেন তখন গেঞ্জী আর লুঙ্গী পরিধান করা এক ব্যক্তি বের হলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, আমি হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আজমীর থেকে এসেছি। আমার নামা মুঈনুদ্দীন। তিনি বললেন : আপনি ভেতরে আসুন। বসুন। বসার পর তিনি বললেন যে, আপনি হযরত মাওলানাকে সংবাদ দিন যে, মুঈনুদ্দীন আজমিরী আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছে। তিনি বললেন : আপনি গরমের মধ্যে এসেছেন একটু আরাম করুন। অতঃপর হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পর মাওলানা আজমিরী পুনরায় তাগাদা দিলেন যে, আরে আমি আপনাকে বারবার বলছি

আপনি ভেতরে গিয়ে সংবাদ দিন যে, আজমীর থেকে আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী এসেছে। তিনি বললেন : আচ্ছা এখনই সংবাদ পাঠাচ্ছি। এরপর ঘরের ভেতরে গেলেন এবং খানা নিয়ে আসলেন। মাওলানা আজমিরী বললেন : ভাই! আমি এখানে খানা খেতে আসিনি। আমি তো মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব এর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। তাঁর সাথে আমাকে সাক্ষাত করিয়ে দিন। তিনি বলেন : হযরত! আপনি খানা খেয়ে নিন। এখনই সাক্ষাত হয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে পানাহার করালেন। এমনকি মাওলানা মুঈনুদ্দীন ছাহেব অসন্তুষ্ট হতে লাগলেন যে, আমি তোমাকে বারবার বলছি অথচ তুমি গিয়ে সংবাদ দিচ্ছ না। অতঃপর বললেন যে, হযরত! আসল কথা হল এখানে 'শাইখুল হিন্দ' নামে তো কেউ থাকে না। অবশ্য বান্দা মাহমূদ এই অধমের নাম!

তখন মাওলানা মুঈনুদ্দীন রহ. বুঝতে পারলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ইনিই। যাঁর সাথে আমি এতক্ষণ অসন্তোষের ভঙ্গিতে কথা বলেছি।

এই ছিল আমাদের বড়দের অপূর্ব বিনয়। আল্লাহ তাআলা এর কিছু রং আমাদেরকেও দান করুন। আমীন।

১৪. দুই হরফ ইলম

হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ. বলতেন যে, যদি দুটি হরফ ইলমের অপবাদ মুহাম্মাদ কাসেমের নামে না হত, তাহলে দুনিয়া জানতেও পারত না যে, কাসেম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে আর কোথায় মরে গেছে। এভাবে নিজেকে মিটিয়ে দিয়ে যিন্দেগী যাপন করেছেন।

১৫. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর আরেকটি ঘটনা

হযরত শাইখুল রহ. এর এখানে পবিত্র রামাযান মাসে অভ্যাস ছিল এই যে, ইশার পর তারাবীহ আরম্ভ হয়ে ফজর পর্যন্ত সারা রাত চলত। প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে কুরআন শরীফ খতম হত। একজন হাফেয ছাহেব তারাবীহ পড়াতেন। হযরতওয়ালা পেছনে দাঁড়িয়ে শুনতেন। নিজে হাফেয ছিলেন না। তারাবীহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর হাফেয ছাহেব সেখানেই হযরতওয়ালার কাছাকাছি অল্প সময়ের জন্য শুতে যেতেন।

হাফেয ছাহেব রহ. বলেন : একদিন যখন আমার চোখ খুলল, তখন আমি দেখলাম যে, কেউ একজন আমার পা দাবিয়ে দিচ্ছে। আমি মনে করলাম যে, কোন ছাত্র বা তালিবে ইলম হবে। ফলে আমি আর দেখিনি যে, কে পা দাবাচ্ছে। অনেক্ষণ পর আমি যখন মুখ ঘুরিয়েছি, তখন দেখি যে, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ. আমার পা দাবিয়ে দিচ্ছেন। আমি লাফ দিয়ে উঠে গেলাম আর বললাম যে হযরত! এটা আপনি কী গযব করলেন? হযরত বললেন : কী আর গযব করলাম। তুমি রাত ভর তারাবীহতে দাঁড়িয়ে থাক। আমি ভাবলাম যে, পা দাবিয়ে দিলে তোমার একটু আরাম হবে। এজন্য দাবাতে এসেছি!!

১৬. হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ.-এর বিনয়

হযরত মাওলানা কাসেম ছাহেব নানূতভী রহ. যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর ব্যাপারে লেখা হয়েছে যে, সব সময় একটা লুঙ্গী পরিধান করে থাকতেন। আর মামুলী প্রকৃতির কুর্তা পরিধান করতেন। ইনি এত বড় আল্লামা। যখন তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন তখন বিরোধীপক্ষকে নাকানী-চুবানী খাইয়ে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু সরলতার এই অবস্থা ছিল যে, লুঙ্গী পরিধান করে মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছেন।

যেহেতু তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। এইজন্য ইংরেজ সরকার এর পক্ষ থেকে তাঁর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল। ফলে এক ব্যক্তি তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য আসল। কেউ বলে দিয়েছিল যে, তিনি ছাত্তাহ মসজিদে থাকেন। যখন ঐ ব্যক্তি মসজিদে পৌঁছল, তখন দেখল যে, এক ব্যক্তি গেঞ্জী ও লুঙ্গী পরিধান করে মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছেন। এখন যেহেতু ওয়ারেন্টের মধ্যে এটা লেখা ছিল যে, "মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতভীকে গ্রেফতার করা হোক"। এ জন্য যে ব্যক্তি গ্রেফতারের জন্য এসেছিল সে মনে করেছিল যে, ইনি জুব্বা আবা কাবা পরিহিত বড় আল্লামা হবেন; যিনি এত বড় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এ ব্যক্তির কল্পনাতেও এ খেয়াল আসেনি যে, এই ব্যক্তি যিনি মসজিদে ঝাড়ু দিচ্ছেন ইনিই মাওলানা কাসেম ছাহেব নানূতভী। বরং সে মনে করেছে যে, ইনি মসজিদের খাদেম হবেন। তাই তো সে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে যে, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম কোথায়? হযরত মাওলানা জানতে পেরেছিলেন

যে, আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী হয়েছে। এজন্য আত্মগোপন করাও জরুরী। আবার মিথ্যা কথাও বলা যাবে না। এ জন্য তিনি যেখানে দাঁড়ানো ছিলেন, সেখান থেকে এক কদম পেছনে হটে গেলেন। অতঃপর উত্তর দিলেন যে, একটু পূর্বে তো এখানে ছিলেন। ফলে ঐ ব্যক্তি এটাই মনে করল যে, একটু পূর্বে মসজিদে ছিলেন। কিন্তু এখন উপস্থিত নেই। যদ্দরুণ সে খোঁজাখুজি করে ফিরে চলে গেল।

১৭. হযরত মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. এর বিনয়

হযরত মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. যিনি আমার আব্বাজানের উস্তাদ ও দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম ছিলেন। তাঁর ঘটনা আমি আমার আব্বাজানের নিকট থেকে শুনেছি যে, তাঁর বাড়ীর আশে পাশে কিছু বিধবা মহিলার ঘর ছিল। তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস এই ছিল যে, যখন তিনি নিজ বাসা থেকে দারুল উলূম দেওবন্দ যাওয়ার জন্য বের হতেন, তখন প্রথমে এই সব বিধবার ঘরগুলোতে যেতেন এবং তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতেন যে বিবি! বাজার থেকে কোন সদাই আনার থাকলে বলে দাও। আমি এনে দিব। এখন ঐ বিধবা মহিলা তাঁকে বলছেন। হ্যাঁ ভাই বাজার থেকে এ পরিমাণ ধনিয়া পাতা, পেঁয়াজ, এতটুকু আলু ইত্যাদি এনে দিবেন। এভাবে আরেকজন বিধবার নিকট অতঃপর তৃতীয়জনের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। এরপর বাজার গিয়ে যার যা প্রয়োজন তা ক্রয় করে তাঁদের নিকট পৌঁছে দিতেন।

অনেক সময় এমনও হত যে, সদাই আনার পর কোন বিধবা মহিলা বলতেন যে, মৌলভী ছাহেব! আপনি তো ভুল সদাই এনেছেন। আমি তো অমুক জিনিসের কথা বলেছিলাম। আপনি অমুক জিনিস এ পরিমাণ এনেছেন অথচ আমি এতটুকু চেয়েছিলাম। তখন তিনি বলতেন : বিবি! কোন ব্যাপার নয়। আমি পুনরায় বাজার থেকে এনে দিচ্ছি। এরপর আবার বাজার গিয়ে সদাই এনে তাঁদেরকে দিতেন। অতঃপর ফাতাওয়া লেখার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

আমার আব্বাজান রহ. বলতেন : এই ব্যক্তি যিনি বিধবা মহিলাদের সদাই আনার জন্য বাজারে ঘুরাফিরা করছেন। ইনি "মুফতীয়ে আযমে হিন্দ" বা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম মুফতী। কেউ দেখে এটা বলতে পারবে না যে,

ইনি ইলম ও জ্ঞানের পাহাড়। তাঁর এই বিনয়ের ফলাফল হয়েছে এই যে, আজ তাঁর ফাতাওয়া বারো খণ্ডে ছেপে এসেছে এবং এখনো পর্যন্ত সেটার উপর কাজ অব্যাহত আছে। সারা দুনিয়ার মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। কথা সেটাই :

پھوٹ نکلی ہے تیرے پیراہن سے بو تیری

ছড়িয়ে পড়েছে তোমার কাপড় থেকে তোমারই সুবাস।

এমন সুঘ্রাণ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। তাঁর ইন্তিকালও এ অবস্থায় হয়েছে যে, তাঁর হাতে একটি ফাতাওয়া ছিল। ফাতাওয়া লিখতে লিখতে তাঁর রূহ কবয হয়ে গেছে।

১৮. এক ডাকাত পীর বনে গেছে

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. একবার স্বীয় মুরীদরদেকে বলছিলেন : তোমরা কেন আমার পেছনে লেগেছ? আমার অবস্থা তো ঐ পীরের মত যে বাস্তবে একজন ডাকাত ছিল। ঐ ডাকাত যখন দেখল যে, মানুষ খুব ভক্তি শ্রদ্ধাসহ পীর ছাহেবদের নিকটে যায়। তাঁদের কাছে হাদিয়া তোহফা নিয়ে যায়। তাঁদের হাতে চুমু দেয়। এটা তো ভাল পেশা। আমি খামোকা রাত জেগে ডাকাতি করি। পাকড়াও হওয়ার আর জেলে যাওয়ার ভয় তো আছেই। অনেক কষ্ট হয়। এর থেকে তো এটাই ভাল যে, আমি পীর বনে বসে যাব। লোকেরা আমার কাছে আসবে। আমার হাতে চুমু দিবে। আমার নিকট হাদিয়া তোহফা আনবে। এ সব কিছু চিন্তা করে সে ডাকাতী পেশা বাদ দিয়ে দিল। আর একটি খানকাহ বানিয়ে বসে গেল। লম্বা তাসবীহ হাতে নিল। লম্বা কুর্তা পরিধান করল। আর পীর সুলভ আকার আকৃতি ধারণ করল। যিকির ও তাসবীহও আরম্ভ করে দিল।

যখন লোকেরা দেখল যে, কোন আল্লাহওয়ালা বসে আছে। আর অনেক বড় পীর মনে হচ্ছে! তখন লোকেরা তার মুরীদ হওয়া আরম্ভ করল। এমনকি মুরীদদের সংখ্যাও অনেক হয়ে গেল। কেউ হাদিয়া আনছে। কেউ তোহফা দিচ্ছে। প্রচুর নযরানা আসছে। কেউ হাতে চুমু দিচ্ছে। কেউ পায়ে চুমু দিচ্ছে। প্রত্যেক মুরীদকে বিশেষ যিকির বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তুমি অমুক যিকির কর। তুমি অমুক যিকির কর। আর যিকিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করেন। যেহেতু ঐ সব মুরীদ

ইখলাসের সাথে যিকির করেছিলেন। পরিণতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের মর্যাদা অনেক উঁচু করে দিয়েছেন এবং কাশফ ও কারামাতের উচ্চ মাকাম হাসিল হয়ে গেছে।

১৯. মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর একটি ঘটনা

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহ.)কে কোন্ মুসলমান চেনে না? আল্লাহ তাআলা দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জয্বা আগুনের মত তাঁর বুকে ভরে দিয়েছিলেন। যেখানেই বসতেন ব্যস দ্বীনের কথা আরম্ভ করে দিতেন। এবং দ্বীনের পয়গাম পৌছাতেন।

তাঁর ঘটনা কেউ একজন শুনিয়েছেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে আসতেন। বহু দিন পর্যন্ত এসেছেন। কিন্তু ঐ লোকটার দাড়ি ছিল না। তো হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. চিন্তা করলেন যে, এখন তো তার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক হয়ে গেছে। ফলে একদিন হযরত তাকে বললেন যে "ভাই ছাহেব! আমার দিল চায় যে, তুমিও দাড়ির এই সুন্নাতের উপর আমল করে ফেল"।

ঐ ব্যক্তি হযরতের এ কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত হলেন। আর পরদিন থেকে আসা বন্ধ করে দিলেন।

কয়েক দিন গত হওয়ার পর হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. লোকদেরকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন লোকেরা বলল যে, উনি তো আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. এর সাংঘাতিক অনুশোচনা হল। এবং লোকদেরকে বললেন যে, "আমার দ্বারা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। আমি কাঁচা তাওয়ায় রুটি ঢেলে দিয়েছি। যার পরিণাম এই হয়েছে যে, ঐ লোকটি আসাই ছেড়ে দিয়েছে। যদি সে আসতে থাকত তাহলে কমপক্ষে দ্বীনের কথা কানে পড়তে থাকত। এতে তার উপকার হত"।

এখন একজন বাহ্যিক অবস্থা প্রত্যক্ষকারী মানুষ তো এটাই বলবে যে, যদি কোন মানুষ ভুল কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাকে মুখের মাধ্যমে বলে দাও। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "যদি হাতের দ্বারা বাধা দিতে না পার, তাহলে কমপক্ষে মুখের দ্বারা বাধা দিবে।" কিন্তু আপনারা দেখলেন যে, মুখের দ্বারা বলাটা উল্টো

ক্ষতিকর হয়ে গেল। কেননা তার মন মানসিকতা এখনো ঐ কথা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়নি।

এগুলো হেকমতের কথা যে, কোন্ সময় কোন্ কথা বলবে? কোন্ আন্দাযে বলবে? কতটুকু কথা বলবে?

দ্বীনের কথা কোন পাথর নয় যে, এটাকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করা হবে। অথবা এটা এমন কোন দায়িত্ব নয় যাকে মাথা থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। বরং এটা দেখো যে, এ কথাটি বললে ফলাফল কী হবে? এর ফলাফল খারাপ হবে না তো? যদি কথা বলার দ্বারা খারাপ এবং মন্দ পরিণতির আশংকা থাকে, তাহলে ঐ সময় দ্বীনের কথা বলা থেকে বিরত থাকা চাই। ঐ সময় কথা বলা অনুচিত। এ ব্যাপারটাও সামর্থ্য না থাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২০. বিদ্রুপের একটি আশ্চর্য ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব রহ. এর কোন একটা কিতাবের জবাবে একটি প্রবন্ধ লিখে। আর ঐ প্রবন্ধে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর উপর কুফরের ফতওয়া লাগিয়ে দেয়। নাউযুবিল্লাহ।

হযরতওয়ালার রহ. একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি এর জবাবে ফার্সীতে দুটি কবিতা বললেন। ঐ কবিতাগুলো সাহিত্যের বিচারে বর্তমান যুগের বিদ্রুপাত্মক রসিকতার দিক দিয়ে অনেক উচ্চপর্যায়ের কবিতা ছিল। কবিতাগুলো ছিল এই :

مرا کافر گر گفتی غمے نیست +
چراغ کذب را نبود فروغے
مسلمانت بخوانم در جوابش +
دروغے را جزا باشد دروغے

অর্থাৎ আমাকে যদি তুমি কাফের বল, তাহলে এতে আমার কোন দুঃখ নেই। কেননা মিথ্যার বাতি কখনো জ্বলে না। তুমি আমাকে কাফের বলেছ। এর উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলছি। কেননা মিথ্যার উত্তর মিথ্যাই হতে পারে অর্থাৎ তুমি আমাকে কাফের বলে মিথ্যা বলেছ।

এর উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলে মিথ্যা বলছি। তার মানে হল তুমি নিজেই মুসলমান নও।

যদি এই উত্তর কোন সাহিত্যিক ও রুচিশীল কবিকে শোনানো হয়, তাহলে সে এর উপর খুব ধন্যবাদ দিবে এবং এটাকে পছন্দ করবে। যেহেতু কাঁটা বিদ্ধকারী উত্তর।

কেননা দ্বিতীয় কবিতার প্রথম পঙতিতে এটা বলে দিয়েছেন যে আমি তোমাকে মুসলমান বলছি। কিন্তু দ্বিতীয় পঙতি এ কথাটাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছে। অর্থাৎ মিথ্যার বদলা তো মিথ্যাই হয়। তুমি আমাকে কাফের বলে মিথ্যা বলেছ। আমি তোমাকে মুসলমান বলে মিথ্যা বলছি।

যাইহোক এ কবিতাগুলো লিখে হযরতের ঐ ভক্ত হযরতের খেদমতে আনলেন। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. যখন এই কবিতাগুলো শুনলেন, তখন বললেন যে, তুমি তো দারুণ ভয়াবহ কবিতা আর বিদ্ধকারী উত্তর লিখেছ। কিন্তু মিঞা! তুমি তো তাকে কাফের বলে ফেললে। এটা আমাদের পদ্ধতি নয় যে, অন্যকে কাফের বলব।

ফলে তিনি এই কবিতাগুলো ঐ সমালোচনাকারীর কাছে আর পাঠাননি।

অতঃপর হযরতওয়ালা শাইখুল হিন্দ রহ. নিজে ঐ কবিতাগুলোর সংশোধন করলেন। আর একটা কবিতা সংযোজন করে দিলেন। ফলশ্রুতিতে বললেন যে,

مرا کافر گر گفتی غمے نیست
چراغ کذب را نبود فروغے
مسلمانت بخوانم در جوابش
وہم شکر بجائے تلخ دوغے
اگر تو مؤمنی فبہا و إلا
دروغے را جزا باشد دروغے

অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে কাফের বল তাহলে এতে আমার কোন দুঃখ নেই। কেননা মিথ্যার বাতি জ্বলে না। এর উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলছি। আর তিক্ত ঔষধের পরিবর্তে আমি তোমাকে চিনি খাওয়াচ্ছি। যদি তুমি মুমিন হও তাহলে খুব ভাল কথা। আর যদি তা না হও তাহলে মনে রেখ মিথ্যার শাস্তি মিথ্যাই হয়ে থাকে।

এখন দেখুন : ঐ বিরোধিতাকারী যে হযরতের বিরুদ্ধে কুফরের ফতওয়া লাগাচ্ছে, জাহান্নামী হওয়ার ফতওয়া লাগাচ্ছে! এর বিপক্ষেও এমন বিদ্রুপাত্মক কথা লেখা হযরত পসন্দ করেননি যেটা সীমারেখার বাইরে ছিল। কেননা এই বিদ্রুপ তো দুনিয়াতে থেকে যাবে কিন্তু যে কথা মুখ দিয়ে বের হচ্ছে সেটা আল্লাহ তাআলার নিকট রেকর্ড হচ্ছে। কেয়ামতের দিন এ ব্যাপারে উত্তর দিতে হবে যে, অমুকের ব্যাপারে এ শব্দ কিভাবে ব্যবহার করে দিলে?

এ জন্য বিদ্রুপাত্মক সমালোচনার এ পদ্ধতি যা সীমার বাইরে চলে যায় কোনভাবেই পসন্দনীয় নয়। সুতরাং কারো সাথে কোন কথা বলার থাকলে সাফ এবং সোজা কথা বলা উচিত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলা উচিত নয়।

২১. রিযক বণ্টনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা

আমার বড় ভাই জনাব যাকী কাইফী ছাহেব রহ. আল্লাহ তাআলা তাঁর মাগফিরাত করুন। আমীন। হযরত থানভী রহ. এর সাহচর্যধন্য মানুষ ছিলেন। একদিন তিনি বলেন : ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমন এমন দৃশ্য দেখান যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার রাবূবিয়্যত ও রাযযাকিয়্যাতের সামনে সেজদাবনত হওয়া ছাড়া থাকতে পারে না।

লাহোরে "ইদারায়ে ইসলামিয়াত" নামে তাঁর দ্বীনী কিতাবের দোকান আছে। সেখানে তিনি বসতেন।

বড় ভাইজান রহ. বলেন : একদিন সকালে আমি বাসা থেকে দোকান যাওয়ার ইচ্ছা করেছি, তখন দেখি যে, প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। তখন আমার দিলে খেয়াল আসল যে, এমন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। যিন্দেগীর সমস্ত ব্যবস্থাপনা এখন স্থবির হয়ে আছে। এ অবস্থায় আমি দোকানে গিয়ে কী করব? কিতাব ক্রয় করার জন্য কে দোকানে আসবে? কেননা এ জাতীয় মুহূর্তে প্রথম কথা হল মানুষ ঘর থেকে বের হয় না। দ্বিতীয়ত যদি বের হয়ও একান্ত প্রয়োজনে বের হয়। কিতাব এবং বিশেষ করে দ্বীনী কিতাব তো এমন জিনিস যার দ্বারা না তো ক্ষুধা মিটে আর না অন্য কোন প্রয়োজন পুরা হয়। মানুষের যখন সমস্ত প্রয়োজন পুরা হয়ে যায়, তখন এরপরে কিতাবের কথা মনে হয়। কাজেই এই সময় কোন্ গ্রাহক কিতাব কিনতে আসবে? আর আমিইবা দোকানে গিয়ে কী করব? কিন্তু এর সাথে সাথে অন্তরে এ খেয়ালও আসল যে, আমি তো আমার রোজগারের জন্য একটা পন্থা অবলম্বন

করেছি। আর আল্লাহ তাআলা এ পন্থাকে আমার জন্য রিযক অর্জনের একটি মাধ্যম বানিয়েছেন। এ জন্য আমার কাজ হল আমি গিয়ে দোকান খুলে বসে পড়ব। চাই কোন গ্রাহক আসুক বা না আসুক।

ফলশ্রুতিতে আমি ছাতা হাতে নিলাম। এবং দোকানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। গিয়ে দোকান খুললাম এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত আরম্ভ করে দিলাম। এটা চিন্তা করে যে গ্রাহক তো আর কেউ আসবে না।

কিছুক্ষণ পর দেখি যে, লোকজন মাথায় ছাতি দিয়ে আসছে এবং কিতাব ক্রয় করছে। এবং এমন কিতাব ক্রয় করছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেগুলোর সাময়িক প্রয়োজনও বুঝে আসছে না। ফলে অন্যান্য দিনে যে পরিমাণ বেচাকেনা হয়, প্রায় কাছাকাছি ঐ পরিমাণ বিক্রিই ঐ বৃষ্টির মধ্যেও হয়েছে। আমি চিন্তা করছিলাম যে, ইয়া আল্লাহ! যদি কোন মানুষ বিবেক দ্বারা চিন্তা করে, তাহলে এ ব্যাপারটা বুঝে আসবে না যে, এই ভয়াবহ তুফানময় তীব্র বর্ষণের সময় কে দ্বীনী কিতাব ক্রয় করতে আসবে?

কিন্তু আল্লাহ তাআলাই তাদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন। যাতে তারা দোকানে গিয়ে কিতাব ক্রয় করে। আর আমার অন্তরে এ কথা ঢেলেছেন যে, তুমি গিয়ে দোকান খোল। আমার পয়সার প্রয়োজন ছিল। আর তাদের কিতাবের প্রয়োজন ছিল। উভয়কে আল্লাহ পাক দোকানে জমা করে দিয়েছেন। তারা কিতাব পেয়ে গেছে। আমি পয়সা পেয়ে গেছি।

এই ব্যবস্থাপনা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বানাতে পারেন।

যদি কেউ চায় যে, আমি পরিকল্পনার দ্বারা এবং কনফারেন্স করে এ ব্যবস্থাপনা তৈরী করে নিব!! পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে বানাব। তবুও সারা জীবনেও কখনো বানাতে পারবে না।

সমাপ্ত